বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা

সম্পাদনা
রতনতনু ঘোষ

অবসর

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
প্রতীক ডট ডিজাইন

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8793-49-7

Bishawbidyaloye Uchchoshikhya (A collection of Essays) Edited by Ratantanu Ghosh.
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Edition : February 2011. Price : Taka 250.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net

www.pathagar.com

উৎসর্গ

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

অধ্যাপক পবিত্র সরকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা বৈশ্বিক জ্ঞানসম্পদের বাহন

বিশ্বজনীন জ্ঞান আদান-প্রদানের, যাবতীয় উদ্ভাবন ও গবেষণা বিকাশের এবং জাতীয় মানবসম্পদ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাপীঠ হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যা অন্বেষণে নিযুক্ত শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রসারিত করেন স্বদেশের মেধাশক্তি, উন্নয়নের জ্ঞানসূত্র, মানবসমাজ পরিচালনার প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব বিকাশের সংগ্রাম, সৃজন তৎপরতার বহুব্যাপ্ত শৃঙ্খলা। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় মেধাবিকাশের মস্তিষ্কস্বরূপ।

'বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক গ্রন্থে সর্বমোট ছাব্বিশটি নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলিত। শিক্ষাদার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখতে চেয়েছেন মানবমেধা বিকাশের মুক্তক্ষেত্র হিসেবে যাতে শিক্ষার্থীর সর্বাত্মক স্বাধীনসত্তার বিকাশ ঘটবে। তাঁর মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পপতিগণ কৃষিমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী না হয়ে বরং অর্থোপার্জনে ও শিল্পের উন্নয়নে বেশি তৎপর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে 'ইউনিভার্সিটির' উদ্ভব ইউরোপে হলেও এর প্রথম প্রতিরূপ দেখা দিয়েছিল ভারতবর্ষের নালন্দা ও বিক্রমশীলার মাধ্যমে। পণ্ডিত শীলভদ্র রাজকীয় ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছিলেন জ্ঞানমাহাত্ম্য প্রসারের মহান লক্ষ্য নিয়ে। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার কথা প্রস্তাব করেছেন গুরুত্বসহ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। হুমায়ুন কবির বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির গোড়ার কথা তুলে ধরেছেন। জাতীয় জীবনের জন্য মানবসম্পদ সৃষ্টি আর জ্ঞানবিকাশের লক্ষ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়কে 'কেরানী তৈরির কারখানা' বলে অভিহিত করলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানমূলক ভূমিকার জোরালো সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ লিখেছেন এডোয়ার্ড শিল্‌স-এর শিক্ষাভাবনা বিষয়ে। শিক্ষাগবেষক এডোয়ার্ড শিল্‌স ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ইতিহাস, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তির বিকাশ নিয়ে সামগ্রিকভাবে যা লিখেছেন তার সারমর্ম ও যুক্তিজাল তুলে ধরেছেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ড ও গন্তব্য নিয়ে লিখেছেন শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজসম্পৃক্ত ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে শাসকসম্প্রদায় সকল কালেই নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত করায় সেখানে জ্ঞানবিকাশের পথ ও স্বায়ত্তশাসনের প্রক্রিয়া বিনষ্ট হয়েছে। উচ্চস্তরে ইতিহাস শিক্ষাপ্রদানের রীতি, কৌশল ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লিখেছেন বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত। চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ভাষা এবং মানুষ গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।

'বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা : আমাদের দায় ও কর্তব্য' নিয়ে লিখেছেন ইতিহাসবিদ সালাহউদ্দীন আহমদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনা ও সংকটের প্রেক্ষাপটে সর্বাত্মক দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ণয় করেছেন। উচ্চশিক্ষার প্রচলিত সমস্যা-সংকট নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকৌণিক বিশ্লেষণ করেছেন শামসুল

www.pathagar.com

হক। ভারতে সামগ্রিক উচ্চশিক্ষার পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন অনিল ভট্টাচার্য। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম তথ্যঋদ্ধ ও অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ নিয়ে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নপূরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গবেষণার গুরুত্ব, উচ্চশিক্ষার মাধ্যম, উচ্চশিক্ষার অর্থায়ন ও ভৌগোলিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার বৈষম্য নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তিনি। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং এ ব্যাপারে তার পরামর্শ- প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাকপর্ব এবং রাজনীতিকরণের পরিসরে তার ব্যাহত ও বিপর্যস্ত পরিণতি নিয়ে লিখেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয় খুন হয়ে যাচ্ছে' শীর্ষক প্রবন্ধ। তথ্য-প্রযুক্তির নতুন পরিসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্তকরণে 'ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ে'র উদ্যোগ, প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লিখেছেন মোহাম্মদ কায়কোবাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের অপরিহার্যতা নিয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শহিদুল ইসলাম লিখেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসন' শীর্ষক প্রবন্ধ। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন বিশ্বজিৎ ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুমাত্রিক ও দূরদর্শী উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা বিষয়ে অভিজ্ঞতাঋদ্ধ ও তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন অধ্যাপক অনুপম সেন। উচ্চশিক্ষা ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আবদুল খালেক প্রকাশ করেছেন স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ও সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষিত। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন লিখেছেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ। জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে 'স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়' সম্পর্কে লিখেছেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস ও শিক্ষা-ব্যবস্থার বিকাশ নিয়ে তাথ্যিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন রংগলাল সেন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যা কিভাবে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনা বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা কী তা নিয়ে লিখেছেন রতনতনু ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন মিল্টন বিশ্বাস। মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী বৈধ-অবৈধ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্বেষা ও অন্বয় নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকগণ স্ব স্ব লেখা গ্রন্থভুক্ত করার অনুমতি দেয়ায় আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-ঠিকানা সংযুক্ত হয়েছে গ্রন্থটিতে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম ঠিকানা জেনে সেগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে অনায়াসে। রচনার উৎস ও লেখক-পরিচিতি দেয়া হয়েছে গ্রন্থশেষে যা গবেষকদের কাজে লাগবে।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী পুস্তক-প্রকাশক ও অবসর প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী জনাব আলমগীর রহমান সাহেবের সযত্ন-প্রচেষ্টা স্মরণ করছি কৃতজ্ঞতাসহ। ছোট বোন মুক্তাশ্রী ঘোষ বইটির গ্রুপ দেখে সহায়তা করেছে। তাঁর প্রতি আমার আশীর্বাদ রইল বইটি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যানুরাগী ও গবেষকদের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমার সম্পাদনাকর্মের সার্থকতা বোধ করবো।

রতনতনু ঘোষ
ratantanukc@yahoo.com

www.pathagar.com

সূচি

বিশ্ববিদ্যালয় ১৩
বার্ট্রান্ড রাসেল

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ১৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের উচ্চশিক্ষা ও মাতৃভাষা ৩০
সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ৪০
হুমায়ুন কবির

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদর্শন : এডওয়ার্ড শিল্‌স-এর ভাবনা ৫১
মোজাফ্‌ফর আহমদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ড ও গন্তব্য ৬১
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

উচ্চস্তরের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদান ৮০
বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

উচ্চশিক্ষা, ভাষা ও বিশ্ববিদ্যালয় ৮৪
অম্লান দত্ত

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা : আমাদের দায় ও কর্তব্য ৯০
সালাহউদ্দিন আহমদ

উচ্চশিক্ষার-সমস্যা ৯৭
শামসুল হক

ভারতের উচ্চশিক্ষা কোন্ পথে ১১৩
অনিল ভট্টাচার্য

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ ১২৬
নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৩৪
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বিশ্ববিদ্যালয় খুন হয়ে যাচ্ছে! ১৩৮
মহীউদ্দীন খান আলমগীর

ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় : যা হবে উন্নয়নের সহযোগী ১৪৪
মোহাম্মদ কায়কোবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসন ১৪৭
শহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা পরিস্থিতি ১৫৬
বিশ্বজিৎ ঘোষ

বহুমাত্রিক ও দূরদর্শী উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা ১৫৮
অনুপম সেন

উচ্চশিক্ষা ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ১৬২
আবদুল খালেক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার ১৬৫
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৯
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান : আমাদের করণীয় ১৭৮
আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বিকাশ ১৮৩
রংগলাল সেন

বৈধ-অবৈধ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : অন্বেষা-অন্বয় ১৮৮
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যা লয়প্রাপ্ত ১৯২
রতনতনু ঘোষ

বিশ্ববিদ্যালয় হোক গবেষণা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্র ১৯৫
মিল্টন বিশ্বাস

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা ১৯৮

লেখক-পরিচিতি ও রচনার তথ্যসূত্র ২০৮

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ট্রান্ড রাসেল

শিশুর প্রতিভা যদি বিদ্যালয়ের পড়ার দরুন ব্যাহত হয় এবং অন্য ব্যবস্থা করিলে বিকাশ লাভ করে, তবে তাহার জন্য পৃথক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত। (মোৎজার্টকে যদি জোর করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়গুলি পড়িতে বাধ্য করা হইত তবে ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় হইত; তাহার সঙ্গীত-প্রতিভা হয়তো সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারিত না।) কিন্তু আদর্শ সমাজেও এমন অনেক লোক থাকে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিবে না। এই বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই যে, পুঁথিগত শিক্ষাকাল একুশ অথবা বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বর্ধিত করিলে কেবল অল্পসংখ্যক লোকই ইহাতে উপকৃত হইবে। যে সব অলস ধনীর দুলাল এখন পুরাতন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাহারা কতকগুলি কায়দা-কানুন এবং বেহিসেবিরূপে খরচ করার অভ্যাস ছাড়া আর বিশেষ কিছুই শিক্ষালাভ করে না। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কীরূপ ছাত্র নির্বাচন করা উচিত তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। বর্তমানে দেখা যায়, যাহার টাকা আছে সেই সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য পাঠায়। পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় অবশ্য কতক ভাল ছাত্রও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র নির্বাচন আর্থিক যোগ্যতা দ্বারা না হইয়া ছাত্রের মেধা ও বুদ্ধির যোগ্যতা দ্বারাই হওয়া উচিত। আঠারো বৎসরের বালক বা বালিকা যদি বিদ্যালয়ের মোটামুটি ভাল শিক্ষা পাইয়া থাকে তবে সমাজে অনেক কিছু উপকারী কাজ করিতে পারে। তাহাকে আরও তিন-চারি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে বৃথা নিযুক্ত না রাখিলে এই সময় সে সমাজসেবার কাজে লাগাইতে পারে। কীরূপ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত তাহা নির্ধারণ করিবার পূর্বে আমাদের সমাজ-জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য কী তাহা জানা আবশ্যক।

ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে, যদিও তৃতীয় পর্যায় এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়কে সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। প্রথম অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ধর্মযাজকদের শিক্ষার কলেজ ছিল; মধ্যযুগে কেবল ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রেনেসাঁসের যুগে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে নূতন ভাবপ্রবণের যুগে প্রত্যেক অবস্থাপন্ন পুরুষের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এই ভাব ক্রমে প্রসার লাভ করে; পুরুষদের

www.pathagar.com

অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শিক্ষা কম হওয়াই উচিত তখন এই ধারণা প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিশ শতাব্দী ধরিয়া বিশ্বদ্যিালয়গুলিতে 'ভদ্রলোকের শিক্ষা' চলিতে থাকে; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও তাহাই চলিতেছে। এই আদর্শ এক যুগে প্রয়োজনে মনে হইয়াছিল কিন্তু এখন ইহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। কী কী কারণে এরূপ ঘটিয়াছে তাহার আলোচনা হইয়াছে। এই 'ভদ্রলোকের শিক্ষা' আভিজাত্যের উপর নির্ভর করিত কিন্তু গণতন্ত্র অথবা শিল্পপ্রধান ধনতন্ত্রবাদের যুগে ইহা টিকিয়া থাকিতে পারে না। আভিজাত্য যদি থাকেই তবে বরং শিক্ষিত লোকের দ্বারা গঠিত ইহাই থাকুক; তবে আভিজাত্য না থাকাই সর্বপেক্ষা ভাল। এই সম্বন্ধে এখন আর আলোচনা করিয়া লাভ নাই। ইংল্যান্ডে সংস্কার আইন [Reform Bill] ও শস্য আইন [Corn Law] পাশ করার ফলে এবং আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধ [War of Independence] দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইয়াছে। সত্য বটে এখনও ইংল্যান্ডে আভিজাত্যের কাঠামো রহিয়াছে কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মূল ভাব হইল ধনতন্ত্রবাদসঞ্জাত, যাহার সঙ্গে আভিজাত্যের কোনও মিল নাই। ধনী ব্যবসায়ীরা তাহাদের পুত্রদিগকে 'ভদ্রলোক' করিবার বাসনায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান; ধনীর দুলালরা তথায় ব্যবসায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব অর্জন করে; অর্থের অভাবে তাহাদের অবস্থা যখন খারাপের দিকে যায়, তখন আবার তাহারা অর্থোপার্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে থাকে। কাজেই দেখা যায়, সমাজজীবনের পক্ষে 'ভদ্রলোকের শিক্ষার' বিশেষ কোনও গুরুত্ব নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করিবার সময় এইরূপ অকেজো শিক্ষা উপেক্ষা করা চলে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমে মধ্যযুগে যেমন ছিল তেমনই বিভিন্ন বৃত্তির ট্রেনিং স্কুলে পরিণত হইতেছে। ব্যারিস্টার, ধর্মযাজক এবং উপরের স্তরের সিভিল সার্ভিস কর্মচারিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মিগণের অনেকেই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। জগৎ যত জটিল এবং শিল্প যতই বিজ্ঞানের প্রভাবাধীন হইতেছে ততই বিভিন্ন বিষয়ের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন হইতেছে। জটিল বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন লোক এখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই বাহির হইতেছে। প্রাচীনপন্থীরা দুঃখ করেন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের মন্দির বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বড় টেকনিক্যাল স্কুলে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহা প্রতিরোধ করার উপায় নাই, কারণ ধনতন্ত্রবাদীরা ইহাই চায়। তাহাদের নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞান বা কৃষ্টির কোনও মোহ নাই। শিল্পের জন্যই শিল্প–সাধনার মতো 'অকেজো' শিক্ষা ও আভিজাত্যের আদর্শ, ধনতন্ত্রের কাম্য নয়। যথায় এখনও ইহার রেশ রহিয়াছে তথায় বুঝিতে হইবে। রেনেসাঁস যুগের ঐতিহ্য এখনও শেষ হইয়া যায় নাই। এই আদর্শের বিলোপ আমার নিকট শোচনীয় মনে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান আভিজাত্যের অলঙ্কারস্বরূপ ছিল কিন্তু আভিজাত্যের অন্যান্য দোষ এত বেশি ছিল যে তাহার তুলনায় গুণ হইয়াছিল অত্যন্ত হাল্‌কা। আমরা পছন্দ করি আর নাই করি শিল্পতন্ত্রের হাতে আভিজাত্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কাজেই আভিজাত্যের কোনও প্রশংসনীয় গুণ যদি রক্ষা করিতে চাহি তাহা হইলে শক্তিশালী কোনও নূতন ভাবধারার সঙ্গে তাহার সংযোগ সাধন করিতে হইবে। আভিজাত্যের ক্রমবিলীয়মান ঐতিহ্য আঁকড়াইয়া ধরিতে থাকিলে নূতন যুগের ধনতন্ত্রবাদের আক্রমণের হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করা যাইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ শিক্ষার ধারা যদি জিয়াইয়া রাখিতে হয় তবে অল্প কয়েকজন ভদ্রলোকের অবসর বিনোদনের আনন্দদায়ক উপাদান হিসাবে না রাখিয়া ইহাকে সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষের সমাজজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। উদ্দেশ্য–নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা আমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। শিক্ষার্থীর জীবনে ইহা হ্রাস না পাইয়া দিন দিন বেশি হউক ইহাই আমি দেখিতে চাই। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় এইরূপ শিক্ষা যে ক্রমশ বিলোপের দিকে যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ অজ্ঞ ক্রোড়পতিদের নিকট হইতে শিক্ষার উন্নতির জন্য মোটা টাকা সাহায্য গ্রহণের অভিলাষ। এই ধনতান্ত্রিক শিল্পপতিগণ কৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল নন; অর্থকরী এবং শিল্পের উন্নতিবিধায়ক শিক্ষার প্রতিই যে তাঁহাদের ঝোঁক থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। এইরূপ অবস্থায় প্রতিকার সম্ভবপর। তবে এই জন্য শিক্ষিত গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, তখন শিল্পপতিগণ যে বিদ্যার কদর বুঝিতে পারে নাই, জনগণই তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে আগ্রহশীল হইবে। ইহা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু ইহা সাধন করিতে হইলে আগে সর্বসাধারণের শিক্ষার মান উন্নত হওয়া আবশ্যক। পূর্বে শিক্ষিত পণ্ডিতব্যক্তিগণ (জীবিকার জন্য) ধনবান পৃষ্ঠপোষকের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেন। আধুনিক যুগের বিদ্বজ্জন যদি সর্বদা অর্থশালী লোকদের কৃপাপ্রার্থী না হন তবে ভাল হয়। শিক্ষা এবং শিক্ষিত লোক এক বিষয় নয়, তবু শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে একত্রে তালগোল পাকাইয়া ফেলা অসম্ভব নয়। একটি কাল্পনিক উদাহরণ মনে করা যাক– একজন শিক্ষিত ব্যক্তি জৈব রসায়নবিদ্যা শিক্ষাদানের পরিবর্তে মদ তৈয়ার করা শিখাইয়া অর্থোপার্জন করিতে পারেন। তিনি অর্থলাভ করিবেন কিন্তু শিক্ষার অবনতি ঘটিবে। শিক্ষিত ব্যক্তির যদি জ্ঞানের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ থাকিত তবে মদ তৈয়ারি শিক্ষার জন্য যদি কেহ অর্থদান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করিতেন তিনি তাহাতে যোগদান করিতেন না। তিনি যদি গণতন্ত্রের পক্ষে থাকিতেন তবে গণতন্ত্রই তাঁহার বিদ্যার যথাযোগ্য সমাদর করিত। এইসব কারণে আমার মনে হয় শিক্ষাবিদগণ যদি ধনী লোকের নিকট অর্থের প্রত্যাশা না করিয়া জনসাধারণের অর্থের উপরই নির্ভরশীল হন তবেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ধনশালী ব্যক্তিদের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণের কুরীতি ইংল্যান্ড অপেক্ষা আমেরিকাতেই বেশি; তবে ইংল্যান্ডেও ইহা আছে এবং ক্রমশ বেশি হইতে পারে।

এইসব রাজনীতির প্রভাব ও কার্যপরম্পরার কথা বাদ দিয়া আমি ধরিয়া লইব যে, বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রহিয়াছে; প্রথম, কতকগুলি বৃত্তি বা পেশার জন্য পুরুষ ও নারীদিগকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করা; দ্বিতীয়, আশু কোনও কিছু লাভের সম্ভাবনা সম্মুখে না রাখিয়াও উচ্চস্তরের জ্ঞান অর্জনের ও গবেষণার সুযোগ দান। কাজেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ছাত্রদিগকে দেখিতে চাহি যাহারা এইরূপ বৃত্তি বা পেশার জন্য উচ্চশিক্ষা চাহে এবং যাহাদের এমন বিশেষ যোগ্যতা আছে যাহা দ্বারা তাহারা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা করিয়া সমাজকে মূল্যবান কিছু দান করিতে পারে। বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষার জন্য কিরূপ ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা উচিত তাহা এই নীতির দ্বারা নির্ণয় করা গেল না।

বর্তমানে ধনীলোকের সন্তান না হইলে আইন বা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কেননা এই শিক্ষা ব্যয়বহুল। তাহা ছাড়া শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরই অর্থোপার্জন শুরু হয় না। কাজেই দেখা যায় এই ব্যক্তিগুলির জন্য নির্বাচন হয় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি দ্বারা, ছাত্রদের কাজের যোগ্যতা ও গুণপনার দ্বারা নয়। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসাবিদ্যার কথা ধরা যাক। যদি প্রকৃত যোগ্য লোকদিগকেই চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইয়া সমাজসেবার কাজে নিয়োগ করিতে হয় তবে যাহাদের এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহ, আন্তরিকতা ও প্রবণতা আছে এমন ব্যক্তিদিগকে নির্বাচন করা

www.pathagar.com

উচিত। বর্তমানে যাহারা খরচবহন করিতে সমর্থ কেবল এমন প্রার্থীদের মধ্য হইতেই লোক বাছাই করিতে হয় কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, যাহারা চিকিৎসাবিদ্যায় সর্বাপেক্ষা পারদর্শিতা দেখাইতে পারিত এমন লোক অর্থাভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগই পাইল না। ইহার ফলে প্রতিভার অপচয় ঘটে। অন্য রকম একটি উদাহরণ লওয়া যাক। ইংল্যান্ড অত্যন্ত জনবহুল দেশ; ইহার বেশিরভাগ খাদ্যই বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিলে বিশেষত যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিলে বোঝা যায়। এইদেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। এখানকার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম; তথাপি এইগুলি যথাসম্ভব উন্নত প্রণালীতে সুযোগ্যভাবে চাষ করার ব্যবস্থা হয় নাই। বংশানুক্রমিকভাবেই কৃষকগণ এই পেশা গ্রহণ করে; সাধারণত তাহারা কৃষকদেরই পুত্র। আর কতক কৃষিক্ষেত্র কিনিয়াছে; ইহার জন্য তাহারা টাকা খরচ করিয়াছে তাই বলিয়া কৃষিকার্যের যোগ্য নিপুণতা অর্জন করিয়াছে এমন কথা নাই। ডেনমার্কের কৃষকদের চাষের প্রণালী ইংল্যান্ডের চাষিদের তুলনায় বেশি ফলপ্রদ। কিন্তু ইংল্যান্ডের কৃষকদের তাহা শিখাইবার কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় না। একজন মোটরচালককে যেমন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র লইতে হয় তেমনই যে কৃষকই কিছু বেশি পরিমাণ জমি চাষ করিবে তাহাকেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা উচিত। সরকারি কাজকর্মে বংশানুক্রমিক নিয়োগপ্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু জীবনের কোনও ক্ষেত্রে এখনও ইহা চলিতেছে। যেথায় ইহা আছে তথায় অযোগ্যতা প্রবেশ করিয়াছে। দুইটি সংশোধন নিয়ম দ্বারা এই অযোগ্যতা দূর করা উচিত; প্রথমত, উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত কাহাকেও কোনও প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়; দ্বিতীয়ত, যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক অর্থশালী হউক বা না হউক অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহনে তাহাদের সামর্থ্য থাকুক আর নাই থাকুক তাহা বিবেচনা না করিয়া তাহাদের শক্তি ও প্রতিভা বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এই দুইটি নিয়ম পালন করিলে লোকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

যাহাদের বিশেষ কোনও শক্তি বা গুণ আছে তাহা পরিপূর্ণমাত্রায় বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত। যাহাদের যোগ্যতা আছে কিন্তু শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের যোগ্য অর্থ নাই, রাষ্ট্রকর্তৃক তাহাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা উচিত। যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারিলে কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা সমীচীন নয় এবং ভর্তি হওয়ার পরও কেহ যদি প্রমাণ দিতে না পারে যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে তবে তাহাকেও থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। পূর্বে ধারণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ধনীর দুলালদের আরাম-নিকেতন, তাহারা তথায় তিন-চারি বৎসর আলস্যে ও বিলাসে কাটাইতে পারে, এই ধারণা এখন লোপ পাইতেছে।

যখন বলি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত যুবক-যুবতীদিগকে আলস্যে সময় কাটাইতে দেওয়া উচিত নয়। তখন ইহাও আমি বলিতে চাই যে, কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম মানিয়া চলাই কাজের প্রকৃত প্রমাণ নয়। ইংল্যান্ডে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অসংখ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাদের ছাত্রদিগকে হাজিরা দেওয়ানের ঝোঁক দেখা যায়। মন্তেসরি বিদ্যালয়ে শিশুদের ব্যক্তিগত কাজের স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, কুড়ি বৎসর বয়সের যুবকদের ক্ষেত্রে-বিশেষত যখন তাহাদের বুদ্ধি ও উদ্যম সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় বেশি বলিয়া ধরিয়া লই, তাহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করানোর যুক্তি আরও প্রবল। আমি যখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছিলাম তখন আমার এবং আমার অধিকাংশ বন্ধুর

www.pathagar.com

ধারণা হইয়াছিল যেই বক্তৃতা দ্বারা কেবল সময়ের অপচয় করা হইত। আমাদের অভিমত অতিরঞ্জিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু খুব বেশি নয়। বক্তৃতার ব্যবস্থা করার আসল কারণ এই যে, দৃশ্যত ইহাকে কাজ বলিয়া মনে হয়, কাজেই ব্যবসায়ীগণ ইহার জন্য ব্যয় করিতে রাজি হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যদি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন ব্যবসায়ীরা তাঁহাদিগকে অলস মনে করিবে এবং শিক্ষকের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের প্রতিপত্তির বলেই কিছু পরিমাণে উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন কিন্তু নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না; আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থাও এইরূপ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রকৃত প্রণালী এইরূপ হওয়া উচিত; শিক্ষা বৎসরের প্রারম্ভে শিক্ষক কতকগুলি বই–এর তালিকা দিবেন যেগুলি ছাত্রদিগকে যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে হইবে, আর কতকগুলি বইয়ের নাম দিবেন যেগুলি সকলে না পড়িলেও কতক ছাত্র পড়িতে পারে। তিনি এমন কতকগুলি প্রশ্ন জানাইয়া দিবেন যাহা ভালভাবে উত্তর করিতে হইলে বুদ্ধি খাটাইয়া উল্লিখিত বইগুলি হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে। ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় অধ্যয়নের ফলে প্রশ্নের উত্তর তৈয়ার করিলে শিক্ষক একে একে প্রত্যেকের উত্তর দেখিবেন। যে সকল ছাত্র তাঁহার সঙ্গে পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহে সপ্তাহে একদিন কিংবা একপক্ষকালে একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাহাদিগকে আলোচনার সুযোগ দিবেন। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায় এই ধরনের ব্যবস্থাই আছে। শিক্ষকের নির্দিষ্ট প্রশ্নের পরিবর্তে যদি কোনও ছাত্র নিজেই প্রশ্ন বাছিয়া লয় তাহাতে আপত্তি করিবার কোনও কারণ নাই। এই কাজে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে তবে দেখিতে হইবে তাহার স্বয়ং নির্বাচিত প্রশ্ন শিক্ষক–নির্ধারিত প্রশ্নের সমান কঠিন হওয়া চাই। ছাত্রের লিখিত উত্তরপত্র পরীক্ষা করিলেই তাহার অধ্যবসায় কতখানি তাহা বোঝা যাইবে।

একটি বিষয়ের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষককে গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়ে অন্যান্য সকল দেশে কী কী গবেষণা হইতেছে এবং কোথাও কোন নূতন তথ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর নূতন আলোকপাত হইতেছে কিনা তাহা অধ্যয়ন করিবার যথেষ্ট অবসর তাঁহার থাকা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কৌশল একান্ত প্রয়োজনীয় নয়; যিনি যে বিষয় পড়ান সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা এবং তৎসংক্রান্ত আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। যিনি অত্যধিক কাজের চাপে পরিশ্রান্ত এইরূপ লোকের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় তাহার নিকট নীরস হইয়া দাঁড়ায় এবং যৌবনে তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন তাহাই হয় তাঁহার শিক্ষাদান কার্যে একমাত্র মূলধন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে প্রতি সাত বৎসরে এক বৎসরকাল সময় বিদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোনও দেশে জ্ঞানার্জনের জন্য কাটানো উচিত। আমেরিকায় এইরূপ ব্যবস্থা আছে কিন্তু ইউরোপীয় দেশসমূহের বিদ্যার অহমিকা এতই বেশি যে, এইরূপ প্রয়োজনীয় তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। এই বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যাঁহাদের নিকট গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলাম তাঁহারা ইউরোপের অন্যান্য দেশে পূর্ববর্তী কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর গণিতবিদ্যায় যে অগ্রগতি হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর রাখিতেন না–আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রাবস্থায় আমি ভিয়ারস্ট্রাসের নাম কখনও শুনি নাই। পরে ইউরোপ ভ্রমণের সময় আমি আধুনিক গণিতের সংস্পর্শে আসি। এইরূপ ঘটনা কেবল একক বা একান্ত বিরল ছিল না, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

অধ্যাপকদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য আছে: একদল শিক্ষাদানের উপর জোর দেন, অন্যদল গবেষণা কার্যকেই প্রধান মনে করেন। ইহার প্রধান কারণ শিক্ষাদান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন ছাত্রের প্রবেশ যাহাদের মানসিক ও বুদ্ধিগত শক্তি এবং অধ্যবসায়ের পরিমাণ উচ্চতর শিক্ষার উপযুক্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুলের মতো শিক্ষাদানের রীতি এখনও কিছুটা রহিয়াছে। ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিয়া, স্কুলের ছাত্রদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদগকেও পাঠ অনুশীলনে বাধ্য করিয়া সুফল লাভের চেষ্টা করা হয়। ছাত্রদিগকে কাজের জন্য মৌখিক উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া কোনও লাভ নাই; আলস্যবশত অথবা সামর্থের অভাবে যে কোনও কারণেই হোক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারিলে তাহাকে সেখান হইতে বিদায় দিতে হইবে, কারণ এইরূপ ছাত্র অন্যত্র কোনও কাজে নিযুক্ত থাকিলে বরং সময়ের ও অর্থের বৃথা অপচয় হইবে না। শিক্ষকের বহু ঘণ্টা ধরিয়া অধ্যাপনা করিবার প্রয়োজন নাই; জ্ঞানার্জন সাধনায় তাঁহাকে অবসর সময়ে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

মানব-জাতির জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কী কাজ তাহা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে গবেষণা শিক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। নূতন জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই ক্রমোন্নতির ধারা চলিয়াছে; ইহার অভাবে বিশ্বের (উন্নতির গতি) প্রগতি থামিয়া যাইবে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যে জ্ঞান মানুষের অধিগত হইয়াছে তাহার প্রসার ও ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আরও কিছুকাল উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকিবে কিন্তু ইহা খুব বেশিদিন চলিবে না। নিছক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে জ্ঞান তাহাও চিরদিন মানুষের মন অধিকার করিয়া রাখিতে পারে না। বিশ্ব-রহস্যকে ভালভাবে বুঝিবার জন্য যে নিঃস্বার্থ উদ্যম ও গবেষণায় মানুষ প্রবৃত্ত হয় তাহা হইতেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান উদ্ভূত হয়। প্রথমে মানুষ বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক {theoretical} জ্ঞান অর্জন করে, পরে তাহাই প্রয়োজনে খাটানো সম্ভবপর হয়। উচ্চস্তরের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োজনে লাগানো সম্ভবপর না হইলেও ইহার নিজস্ব মূল্য আছে; কেননা বিশ্বের রহস্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ায় মানুষ যে জ্ঞানের অধিকারী হয় তাহার মূল্যও কম নয়। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সংস্থা যদি মানুষের দেহের প্রয়োজন মিটাইতে এবং যুদ্ধ ও নিষ্ঠুরতা দূর করিতে পারে তবে জ্ঞান ও সৌন্দর্যের সাধনা আমাদের মনে সৃষ্টির প্রেরণা যোগাইতে থাকিবে। কবি, চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক অথবা গণিতবিদ নিজেদের সৃষ্টিকে কেবল মানুষের প্রয়োজনে লাগাইতে ব্যস্ত থাকুন ইহা আমার কাম্য নয়। ভাবজগতে বিচরণ করিতে স্রষ্টার মানস-গগনে যে নূতন জ্ঞানের প্রথম আলোর আভাস ক্ষীণ আভায় ফুটিয়া ওঠে তাহাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে এবং নবসৃষ্টিতে রূপায়িত করিতে তাহার যে আনন্দ তাহার সহিত তুলনায় জগতের সকল আনন্দ ম্লান হইয়া যায়। জগতে শিল্প ও বিজ্ঞানের যত কিছু উন্নতি, তাহার মূলে আছে দুর্লভকে লাভ করার অদম্য বাসনা। যাহা প্রথমে মনে হয় অবাস্তব কল্পনা তাহাই বৈজ্ঞানিক সাধনায় বাস্তবে পরিণত হয়; যেইরূপ কল্পনা শিল্পীর ভাবনেত্রে প্রথমে অস্পষ্ট কমনীয় আভায় ফুটিয়া ওঠে তাহাই পরে রেখায়, রঙে, সাহিত্যে, শিল্পে মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উপভোগ্য হইয়া ওঠে। দুর্লভকে লাভ করার সাধনায় মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বিপদের মুখে আগাইয়া যায়, সকল রকম কৃচ্ছ্রসাধন স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়। যে-সকল ব্যক্তির এইরূপ গভীর অনুরাগ ও মানসিক সামর্থ্য থাকে তাঁহাদিগকে প্রয়োজনার্থক কাজের শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহাদের প্রতিভা স্ফুরণে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেননা যাহা কিছু মানুষকে মহান করিয়াছে তাহা সবই এই জাতীয় লোকের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষে নিজের ন্যূনতা-প্রকাশ হয়ত শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলঙ্কারগুলো বস্তুত শোভন নয়, এবং তা নিষ্ফল। কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপক্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলে সাধারণের মন অনুকূল হতে পারে, এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাইনে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্রুটি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্রুটি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকরুণ তাঁরা সেটাকে বিনয় বলে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্লানি বলেই গণ্য করেন।

যে কর্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারও অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি, কর্মটি আমার যে উপযুক্ত সে বিচার কর্তৃপক্ষের দ্বারা পূর্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নতুনত্ব আছে- তার থেকে অনুমান করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনও-একটি নতুন সঙ্কল্পের সূচনা হয়েছে। হয়ত মহৎ তার গুরুত্ব। এই জন্য সুস্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহু কাল থেকে কোনও-একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দিন কাটিয়েছি। আমি সাহিত্যিক; অতএব, সাহিত্যিকরূপেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নিরুদ্‌বেগের বিষয় নয়, বহুদিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপর নির্ভর করে, যুক্তিপ্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা, কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল; সর্বত্র এ সমান ভার সয় না। তাই বলি কবির কীর্তি কীর্তিস্তম্ভ নয়, সে কীর্তিতরণী। আবর্তসঙ্কুল বহুদীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অন্তত নোঙর করে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায়, তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনও একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকূল প্রতিকূল বাতাসের আঘাত খেতে খেতে তাকে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হবে। মহাকালের বিচারদরবারে চূড়ান্ত শুনানির লগ্ন ঘন্টায় ঘণ্টায় ঘটে না,বৈতরণীর পরপারে তাঁর বিচারসভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরব গম্ভীর পদে সহসা সাহিত্যকে বসানো হল। সুতরাং এই রীতিবিপর্যয় অত্যন্ত বেশ করে চোখে পড়বার বিষয়

www.pathagar.com

হয়েছে। এরকম বহুতীক্ষ্নদৃষ্টিসঙ্কুল কুশাঙ্কুরিত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি যদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি অসম্মতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পথের বাধা কঠোর হত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসগতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে। বাহির থেকে আমি এসেছি আগন্তুক, এইজন্য প্রশ্রয় প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে, সেই আশ্বাসের আভাস পূর্বেই দিয়েছি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেছি কোন একটি ঋতুপরিবর্তনের মুখে। পুরাতনের সঙ্গে আমার অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু নতুন বিধানের নবোদ্যম হয়ত আমাকে তার আনুচর্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রথম-পদার্পণ-কালে এই কথাটির আলোচনা করে অন্যের কাছে না হোক, অন্তত নিজের কাছে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব, আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হল তার ভূমিকা এখানে স্থির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এ দেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষে তার বিস্তারিত বিচার অসঙ্গত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়ত কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বরূপ কি রকম প্রতিভাত হচ্ছে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করার যোগ্য।

বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় ভাষায় যাকে ইউনিভার্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব ইউরোপে। অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিতসমাজের ব্যবহার সেটা সমূলে ও শাখা-প্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দেশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ, এ দেশের সঙ্গে সঙ্গত নয়, এ দেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।

অথচ এই ইউনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনও হয় নি, কিন্তু ধরে নেয়া যেতে পারে যে, ইউরোপীয় ইউনিভার্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তীকালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্রপরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূতরূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের

www.pathagar.com

মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনও-এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলোকে উদ্ধার করতে; সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকে ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্মীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তারা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বারবার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর কিন্তু ইতিহাসবিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেচপ্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হত তা হলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে কী-একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেছে; এই আর্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কিরকম সে নিরন্তর সক্রিয়।

জ্ঞানের একটা দিক আছে, তা বৈষয়িক। সে রয়েছে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার করে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের অভিমুখে কোনও মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই-যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেন সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল; তার কারণ, ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্‌বোধন, চারিত্র সৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদ্‌গতির দিকে, কেবল তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করার ইচ্ছা স্বতঃই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনও কোনও সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

www.pathagar.com

এই ইচ্ছাটি যে কিরম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখনীচিত্র দেখতে পাই এর অলংকরণরেখায়িত শুক্তিরক্ত স্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্যশিখর, ধূমসুগন্ধি মন্দির, ছায়ানিবিড় আম্রবন, নীলপদ্মে-প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড় বড় বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল; তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি নয় তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সঙ্ঘের বিস্তারসাধন করেছেন; চারিদিকে উন্নত চৈত্য উঠেছে, সেই চৈত্যগুলোর মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভাগৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারিদিকে বেদী ও মন্দির; স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্মণে কিরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন, আধুনিককালে যে রকমের ইট ও গাঁথুনি প্রচলিত এখানকার গৃহনির্মাণের উপকরণ ও যোজনাপদ্ধতি তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইৎসিঙ বলেন, এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েছে; বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যয় প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলোর মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁদের যশ বহুদূরব্যাপী; তাঁদের চরিত্র পবিত্র, অনিন্দনীয়। তাঁরা সদ্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের পরে সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল করে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে-কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহুশ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছেন। আচার্যেরা জানতেন, দূর দূর দেশকে জ্ঞানবিতরণের মহৎ ভার তাঁদের 'পরে; সমুদ্র পর্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকার করে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার 'পরে সর্বজননীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, ঘোষণা করেছে; ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনও বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকারচেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ পাইনে- এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তা বলিনে; কেননা সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্যগৌরব প্রকাশ করবার উপলক্ষ রচনা করে আপন নৃপতিকে বেষ্টন করে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপুণ্যে শোভাপ্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক, অতীত ভারতবর্ষের সেই চেষ্টাকে আমরা আজ দেখতে পাইনে। হয়ত রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না বলেই সেখানে ক্রমাগতই ধ্বংসধূমকেতুর সম্মার্জনী কাজ করেছে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতিরক্ষাচেষ্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি, দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের যে উদার শ্রদ্ধা প্রভূত ত্যাগ স্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ উৎস।

www.pathagar.com

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই-সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কিরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তি বহ্নিশিখা কিরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্স্ট্ বুক্ নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ দূর-দূরান্ত থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্ররাও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান, সুযোগ্য; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েছে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত-আট জন বর্জিত হত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতেও মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরূক। লোকের মনে উদ্‌বেগ ছিল, পাছে অযথা প্রশ্রয়ের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায় সমবেত হত; তারা এক জাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকাব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতখানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরও নানা স্থানে বড় বড় সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল; কিন্তু জ্ঞানের তপস্যা-উপলক্ষে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায় নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, চিত্তসম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশবিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ করে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরও একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য, নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনও-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এইসঙ্গে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সঙ্ঘ ছিল নানা স্থানে। এই-সকল সঙ্ঘে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশিলা তাদেরই বিশুদ্ধরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল। উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের 'পরিষদ' এর জৈবালি প্রাবহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড় বড় জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্য সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ-কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

ইউরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেছে। সেখানে খ্রিস্টধর্মের আরম্ভভাবে পুরাতন ধর্মের সঙ্গে নতুন ধর্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নবদীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হল তখন স্বভাবতই পূজার ধারার

www.pathagar.com

পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হল। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্র রূপ ও বিকৃত রূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন করে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তি সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবল পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় ইউরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সঙ্ঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্বাচনের দরকার হল। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয়, কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্মসঙ্ঘ, তারই সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্কশাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন, ডায়েলেক্‌টিক সকল বিজ্ঞানের মূল বিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলো বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই সকল আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদিত অর্থে পৌঁছতে গেলে শাব্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। ইউরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কি রকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন ও চিকিৎসা তখনকার ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে ইউরোপে মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ইউনিভার্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছিল বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এইসঙ্গে আর-একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে ভাষা নিয়ে। একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত ইউরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণ ভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে ইউরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষা স্বাতন্ত্র্যের সময় থেকে সমস্ত ইউরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য ইউরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। ইউরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে,স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল ইউরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে ইউনিভার্সিটি যেমন উদারভাবে সকল দেশের তেমনি

www.pathagar.com

একান্তভাবে আপন দেশের। এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ, মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তা হলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এশিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বতচীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্রজাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

ইউনিভার্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে,বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি যে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি, গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করেছে। তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায় ; তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্‌বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই। সেখানে জ্ঞানের অংশই ভেদের প্রাচীন প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে ইউনিভার্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি। এ দেশের দরিদ্রপাড়ায় তারই একটা ছোট শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা বলে কোনও-একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল ইউনিভার্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদ্‌ঘটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমত ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিক কালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নতুন নতুন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে আবর্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলো যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রবহমান চিত্তের লীলাচাঞ্চল্য। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিত্তমন্থনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলেছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য যেমন জলে-স্থলে উভয়তই সক্রিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটিগুলোতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা

www.pathagar.com

প্রবৃত্ত। গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্‌স্‌ফোর্ডে দর্শন রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চা স্বীকার করা হয়েছে। চারিদিকে কী ঘটছে, সমাজ কোন্ দিকে চলেছে, সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে ইউনিভার্সিটির এই উদ্যোগ। ম্যাঞ্চেষ্টর ইউনিভার্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করছে। বর্তমান কালের চিন্তাদ্বন্দ্ব ও কর্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ থেকে পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সম্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া ইউরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতেই পাইনে। যে সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। ইউরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য বলে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নতুন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্‌স্‌ট্‌বুক–সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজনদরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ বলে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। এরকম বিদ্যার দানেও গৌরব নেই, গ্রহণেও না। এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনও কখনও এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি নিজগুণেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান করে কৃতী ছাত্রেরা তার সভ্যতার প্রমাণ দেয়।

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এইরকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে; শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকে সৃষ্টিকার্য চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়ত বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ করা ফল, ফলন করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে, কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণমাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়; বাজার–দরের হিসাব করে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায় সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্য দুর্মূল্য শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেছে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়–প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক ইউরোপ আজ যে বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত

www.pathagar.com

করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত তখন জাপান প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার বেগে আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ইউরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানব সমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো করে নিজেকে বঞ্চনা করার কথা আর মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মনিবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এইজন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেছে।

জাপান বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের করে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপ্রসারের পথে অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়কজন লোক ইংরেজি ভাষাকে কোনমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র!

এ কথা মানতে হবে, জাপান স্বাধীন দেশ; সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেছে সে মূল্য পুরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করে নি। আর, হতভাগা আমরা পুলিস ও ফৌজ-বিভাগের ভুরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকণা খুঁটি তারই দামে বিদ্যার ঠাট কোনমতে বজায় রাখছি ফাঁকা মাল-মসলায়। আমাদের কাঁথার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছেঁড়া কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গৌরব নেই; কেবল কিছু পরিমাণে লজ্জা-নিবারণ ঘটে, লোক দেখানো মান রক্ষা হয়, জীর্ণতা সত্ত্বেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ করে যখন কোনই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেছে বলেই হাল আরও শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায়-কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছি তাকে স্বদেশের চিত্তবেদীতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবি তার কাছে সার্থক হবে : শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। দান করাই চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অনেকদিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সব প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠে নি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা করে, সাহস করে, শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে

www.pathagar.com

আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, তা যদি একান্তই অসম্ভব হবে গণ্য করি তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণা বিভাগ স্থাপন করেছিলেন–বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন–পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উঁচু করে তোলা ছিল তার মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশপথ দিয়েই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি, যে স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেন যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে, অধ্যাপক। এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নারীনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেছি তার অখণ্ড রূপ, তার প্রতি তার ভঙ্গি, তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজি ভাষার জটিল গহনে আলো–আঁধারে কোনমতে হাৎড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে মাস–তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি হেন্‌রি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। শেক্‌সপিয়রের কোরায়েলেনস, টমাস ব্রাউনের বেরিয়ল, আর্‌ন্ এবং মিল্‌টনের প্যারাডাইস রিগেন্‌ড্ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলো নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থ গ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোট–বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর, সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন সাহিত্য শিক্ষার আর–একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্টশিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রসস্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন; তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফবিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা

www.pathagar.com

শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।

বয়স যদি পর্যবসিত প্রায় না হত আর যদি আমার কর্তব্য হত ক্লাসে সাহিত্যশিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম শোকাবহ হত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সঙ্কট কাটিয়ে এসেছি।

আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনও রীতিমত কর্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্মবিরুদ্ধ তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা-অধ্যাপকের সুলভ সংস্কারণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরদ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূমলিন নিশীথপ্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

www.pathagar.com

আমাদের উচ্চশিক্ষা ও মাতৃভাষা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সে আজ একশ বছরেরও আগের কথা। রাজা রামমোহন রায় এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রবর্তন করবার জন্য লর্ড আমহার্স্টকে অনুরোধ করেছিলেন। কয়েক বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু প্রথম পঞ্চাশ বছর পাঠ্যতালিকায় ইংরেজি শিক্ষার উপরেই প্রধানত জোর দেওয়া হল। কলেজ ও ইংরেজি স্কুলগুলোতে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বাহনরূপে বহাল রইল ইংরেজি। দেশে জ্ঞান-বিস্তারে তাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে বিবেচিত হল।

আমাদের বিদেশী শাসকরা রাজ্য চালনায় দেশের বুদ্ধিমানদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁদের অফিসগুলো যাতে অল্প ব্যয়ে চালানো যায় তাও ছিল তাঁদের কাম্য। এ অবস্থায় শহরবাসী অভিভাবকেরা দেখলেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের সহজে চাকরি পেয়ে আরামে জীবনযাপন করবার প্রশস্ত পথ গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এটি যে জ্ঞানবিস্তারের প্রশস্ত পথ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেশে শিক্ষিতের হার বিগত এক শতাব্দী যাবত কি হারে বেড়েছে তার হিসাব নিলে।

এর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে শ্রীরামপুরে মিশনারি সাহেবরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য এর চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থা কল্পনা করেছিলেন। তাঁরা বাংলা হরফ তৈরি করে নিজেদের ছাপাখানায় অনেক বই ছেপে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ সহজ করেছিলেন। প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বাংলায় বিজ্ঞান ও গণিতের বই প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামপুর মিশন।

শীঘ্রই এদেশের শিক্ষাবিদেরা জ্ঞানপ্রচারের কাজে প্রবৃত্ত হলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা পেলাম সংস্কৃত শিক্ষার বই; অক্ষয়কুমার দত্ত সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করে সমৃদ্ধ করলেন মাতৃভাষাকে এবং কয়েক বছর পরেই দেখা গেল, প্রায় সকল বিষয়ের উপরেই বাংলা ভাষায় বই পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা লেখা ডাক্তারি বই ছাত্রেরা ব্যবহার করতেন তত দিন যতদিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল।

বিদেশী ভাষায় সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় কিছুদিন ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে জনসাধারণের সমর্থন এবং তাদের হৃদয়ে স্থান পেতে হলে হৃদয়নিঃসৃত রক্ত দিয়েই তা হবে; শিখতে হবে মাতৃভাষায় অন্তরের অন্তস্থলে যার উৎস, যা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের পরিপোষক। মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদানের নীতি যদি তখন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করতেন, তবে এই প্রাচীন দেশে নবযুগ অভ্যুদয়ের স্বপ্ন অনেক আগেই সফল হত।

www.pathagar.com

মাতৃভাষায় এই শুভ সূচনা দেখা দিলেও শিক্ষা পরিচালনায় দায়িত্ব যাঁদের উপর ছিল তাঁরা এর সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসেননি। শিক্ষাদানের প্রধান দায়িত্ব রইল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন এবং পরীক্ষা গ্রহণই হল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কর্তব্য। এবং উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে অটল রইল ইংরেজি আসন। ১৯০৫ সনে জাতীয় আন্দোলনের তীব্র সংঘাতে আর্থিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য জনগণের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল। নষ্ট বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার করতে হবে, শুরু করতে হবে নতুন নতুন শিক্ষা। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের অনুকূল ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ মানুষের তখন যে চাহিদা হল তা মেটাবার সাধ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ্যাতীত। কিন্তু দেশের লোক ক্রমাগত দাবি করতে লাগল তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুবর্তী নতুন শিক্ষার জন্য। এ দাবি পূরণ করতে না পারায় জনসভায় বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরির কারখানা বলে নিন্দা করা হতে লাগল। নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সরকারি আওতার বাইরে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ। স্থির হল, কলা ও বিজ্ঞান উভয় বাংলা ভাষায় পড়ানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার জন্য দেশের লোকের এই প্রথম প্রচেষ্টা। জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দাতাদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া গেল ; কিন্তু কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি কলেজ করা ছাড়া জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ আর বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

ক্রমে ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের ধারা, শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেল। পুরানো শিক্ষাপদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা অব্যাহত থাকল। সরকারি আওতার বাইরে শিক্ষাসংস্কারের কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। বহুনিন্দিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে নতুন কিছু পাওয়া গেল না। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়ে আসবার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূত্রপাত হল। তিনি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে অবিলম্বে সন্তোষজনক পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা দ্বারা তিনি জনসাধারণের শিক্ষা সংস্কারের দাবি অনেকটা পূরণ করতে পেরেছিলেন। সিলেবাস ও পঠনের ক্রম নতুন করে লেখা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই হাতে কলমে বিজ্ঞানশিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হল।

১৯০৮ সনের আগে অল্প কয়েকটি কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো হত। নতুন সংস্কারের ফলে শহরে ও মফঃস্বলে বহু কলেজে বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার খোলা হল। এইভাবে তাঁরা বিজ্ঞানের হাতে কলমে শিক্ষা দেবার জন্য তহবিলও সংগ্রহ করলেন। অস্নাতকদের (under graduate) পড়াশুনার দায় কলেজগুলো নিলেন; আর বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের উচ্চতর কলা, বিজ্ঞান ও আইন পড়াবার দায় নিজেই গ্রহণ করলেন। পরীক্ষকের সংস্থা হতে এমনি করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রদান ও গবেষণার একটি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। এই নতুন আন্দোলনে স্যার আশুতোষ হলেন প্রধান ব্যবস্থাপক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিছু দিন বেশ চলল। গভর্নমেন্ট তাঁর কার্যক্রম অনুমোদন করলেন এবং তাঁর বিচারশক্তি ও দূরদৃষ্টির প্রতি দেশের জনগণের আস্থা হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের সংস্কার করা হল। নানা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য দান পাওয়া গেল, অঙ্ক, অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শন। এই কয় বৎসরে যা সৃষ্টি হল তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জনসাধারণের সম্ভ্রম হল। দুইজন বাঙালি আইনজীবী–স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছ হতে মস্ত দান এল–জমি, বাড়ি ও নগদ টাকা। স্যার আশুতোষ তখন অনেকখানি এগিয়ে গেলেন;

www.pathagar.com

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু ঘোষ ও পালিতের দানের সঙ্গে এক বিচিত্র শর্ত ছিল। অধ্যাপকদের হতে হবে ভারতীয় বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞান কলেজের সব বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের আসনে বসবার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি তখনই পাওয়া গেল না। পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক পদের জন্য সি. ভি. রমন নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভারত সরকারের অর্থব্যবস্থা (Finance) বিভাগের কর্মচারি ছিলেন। তিনি মনস্থির করার জন্য সময় চাইলেন, অধ্যাপনার ঝঞ্ঝাট তিনি চাচ্ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল অবসর মত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। ১৯১৫ সনে স্যার পি. সি. রায়ের অবসর নেবার কথা। তারপর তিনি রসায়নের পালিত অধ্যাপক হয়ে রসায়ন পরীক্ষাগারগুলোর দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন।

অধ্যাপক ডি. এম. বসু ও আগরকার যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার ঘোষ অধ্যাপক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের গবেষণার জন্য জার্মানিতে প্রেরিত হবার অনুরোধ জানালেন। এ অবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিপ্রায় বিলম্বিত হল।

এদিকে প্রথম পৃথিবী যুদ্ধ ১৯১৪ সনে শুরু হয়েছিল। তারই ফলে অধ্যাপক বসু ও আগরকার জার্মানিতে অন্তরীণ হলেন। দেশের স্কুলের পরিচালনা কে করবেন, গভর্নমেন্ট না বিশ্ববিদ্যালয়–তাই নিয়ে বিতণ্ডা শুরু হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যাপারে হস্তক্ষেপে স্যার আশুতোষ এক নির্ভীক প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯১৫ সনে তিনি ভাইস–চ্যান্সেলার রইলেন না বটে কিন্তু পালিত ও ঘোষের দানের অছিসভার সভাপতি রইলেন।

জাতীয়তার এই আন্দোলন বহু আদর্শবাদীকে দুঃসাহসী করেছিল। কয়েকজন তরুণ স্নাতক তখন বিজ্ঞানের চর্চায়ই আত্মনিয়োগ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। ১৯১৫ সনের এম এস–সি পরীক্ষার পরই তাঁরা উপদেশের জন্য স্যার আশুতোষের কাছে গেলেন। ভিন্ন প্রদেশের এক সরকারি কলেজের লেকচারারের পদের জন্য তাঁদের মধ্যে একজনের নাম প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি অত্যধিক গুণসম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, এবং সে জন্যই তিনি নিযুক্ত হলেন না। তিনি ভাবছিলেন, তাঁর বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধির কি উপায় হবে।

তাঁদের মধ্যে একজন সাহস করে প্রস্তাব করলেন যে, বিজ্ঞান বিবিধ শাখায় পড়বার জন্য যে সিলেবাস রচিত হয়েছে তার অনেকগুলো গভর্নমেন্ট কলেজেও পড়ানো হয় না। সেই বিষয়গুলো যদি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ানোর ভার নেন তবে বেশ হয়। এই প্রস্তাব শক্তিমান আশুতোষ কিভাবে নেবেন তা এই তরুণদের কল্পনায় ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, কয়েকজন বিশেষ বৃত্তি পেলেন এবং তাঁদের বলা হল যে সম্প্রতি বিজ্ঞানের যে কয়টি বিভাগ অধিকতর উন্নত হয়েছে সেগুলো যেন আয়ত্ত করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের কথা বিবেচনা করে একজনকে ভার দেওয়া হল তিনি যেন বিশেষ অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেন, এদেশেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে কি–না। তাঁকেই বলা হল যে বিশ্ববিদ্যালয় যদি পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে ক্লাশ খোলার ইচ্ছা করেন তবে ল্যাবরেটরির সরঞ্জামের জন্য প্রথম বৎসরেই কত টাকা লাগবে তার রিপোর্ট যেন দেওয়া হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় পড়াবেন। স্যার আশুতোষ সমর্থন করেছিলেন অনেকের কাছ থেকে। তবে কারও কারও মনে তখনও সংশয় ছিল। এত বড় কাজে সব দিক না ভেবে হাত দেওয়া হয়ত হঠকারিতা হবে। তরুণ বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, আগে সি. ভি. রমন যোগ দিন; যে অধ্যাপকরা বিদেশে অন্তরীণ আছেন তাঁরা ফিরে আসুন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের সংশয় দূর হল; তাঁরা এসে দাঁড়ালেন। স্যার আশুতোষের পাশে। স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট পেশ হবার আগেই রসায়ন,

www.pathagar.com

পদার্থবিদ্যা ও গণিতের স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হল। কমিশনের সভ্যরা বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম দেখে খুশিই হয়েছেন বলে মনে হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ স্নাতকোত্তর পক্ষে এটা ছিল দুঃসাহসের কাজ। তাঁরা নতুন পরিকল্পনা সফল করবার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করেছিলেন। এঁরাই স্থির করেছিলেন পদার্থবিদ্যার পাঠ্যসূচি। কয়েক মাস পরে সি. ভি. রমন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে দেখলেন পড়ানোর কাজ নিয়ম অনুসারে বেশ চলেছে। তিনি ক্লাশে অল্প কয়েকটি বক্তৃতা দিতেন; তাঁর অধিকাংশ সময়ই কাটত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্সে। এখানে তাঁর গবেষণা চলত, পালিতের দান ব্যয় হত এখানেই। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকজন লেকচারার অ্যাসোসিয়েশনের পরীক্ষাগারে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন।

আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ বিবরণের খানিকটা মাত্র বললাম। কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, তা সে বালিগঞ্জেই হোক বা দ্বারভাঙা ভবনেই হোক, উচ্চশিক্ষার আরম্ভ এভাবেই হয়েছিল। স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হলে নতুন কাজের আসল দায়িত্ব এই সব তরুণ অধ্যাপকেরাই নিয়েছিলেন। নায়ক দেখলেন, শুভদিন সমাগত। এই নতুন জ্ঞানান্বেষীদের উপর তাঁর আস্থা ছিল যে, এই গুরু দায়িত্বের ব্যাপারে আবশ্যকীয় নব নব পন্থা আবিষ্কারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেও এঁরা কুণ্ঠিত হবেন না। স্যার আশুতোষের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণ শিক্ষাব্রতীরা দুঃসাহসিক কার্যক্রমকে সফলতার পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের এই উদ্যমে সরকারি সাহায্য পাওয়া গেল না। ছাত্রদের বেতনের উপরেই বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্ভর করতে হল। অবশ্য তখন সদাশয় ব্যক্তিদের দান কাজের সহায়ক হয়েছে। উপযুক্ত সরকারি সাহায্য ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষাপ্রসারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল তা জাতির আত্মনির্ভরতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে ক্রমশ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। শিক্ষা লাভ করবার পর ছাত্ররা নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিল। অনেকে নতুন শিল্পের প্রবর্তন করল। মৌলিক গবেষণাও পিছিয়ে রইলো না। Conductivity of Electrolytes সম্বন্ধে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হল ১৯১৯ সনে। Temperature Ionisation of Stars সম্বন্ধে মেঘনাদ সাহার বিখ্যাত তত্ত্ব ১৯২২ সালের মধ্যেই প্রচারিত হল। তারপর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বহু তত্ত্ব ও তথ্য একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার থেকে বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

সফল হল স্যার আশুতোষের আশা; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিজ্ঞান জগতে শীঘ্রই শ্রদ্ধার আসন লাভ করল। এই শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন আছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবত নবাগত বিদ্যার্থীরা অনেক ভালো কাজ করছেন। কিন্তু এ কাজ সহজ ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় শিক্ষার স্থান ছিল অনেক কিছুর পরে। দরকার হলেই ছাত্রদের ডাক আসত, আর তাঁরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। শিক্ষকদের আর বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক বলে গণ্য করা হত না; ছাত্ররা জাতীয় আন্দোলনের নেতাদেরই অনুসরণ করা সঙ্গত মনে করলেন। নেতারা তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, একবার স্বাধীনতা এলেই সব অসুবিধা দূর হবে এবং আর কোনও সমস্যাই থাকবে না।

স্বাধীনতার পর দেশে নতুন যুগ এসেছে। কিন্তু বাংলা আনন্দের পরিবর্তে পেয়েছে দুঃখ ও তিক্ততা। সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় যে দেশ ছিল এক, তা এখন বিভক্ত হয়ে গেছে। তার ফলে বহু লোক ভিটামাটি ছেড়ে চলে এসেছে। এদের পুনর্বাসনের বিপুল কাজ দেশের

www.pathagar.com

শাসনকর্তাদের কর্মক্ষমতা ও সঙ্গতির উপর গুরুতর চাপ দিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মস্ত দাবি।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নেই। মাধ্যমিক শিক্ষারও আমূল সংস্কারের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে কার্যকর করতে হলে চাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়কেই সেরূপ শিক্ষক স্কুলগুলোকে যোগাতে হবে। তাছাড়া বহু স্নাতক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য উৎসুক। এই উচ্চশিক্ষার সঙ্গে নানা জটিল প্রশ্ন জড়িত আছে। স্থানাভাবের জন্য অনেক ছাত্রকে ফিরিয়ে দিতে হয়। প্রতি বৎসর আমরা পরীক্ষার হলে হাঙ্গামার কথা শুনতে পাই।

সহানুভূতিহীন কোনও পরীক্ষক হয়ত খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন; অথবা, হয়ত সিলেবাসের বহির্ভূত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। কেন এমন হয় সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সযত্নে অনুসন্ধান করা দরকার। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রীতি থাকা একান্ত আবশ্যক।

ত্রিশটিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এখন দেশে উচ্চশিক্ষা দান করছে। শীঘ্রই আরও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। উচ্চশিক্ষা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, তখন অনেকে ভাবছেন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এক হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী। এক মান ও এক নীতি রক্ষা করতে হলে এক ভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা আবশ্যক। এক মতের সমর্থকরা কার্যত ইংরেজিকেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ভাষা হিসাবে রাখতে চান।

আমি চিরদিনই গতানুগতিক পথে চলার মনোভাবকে অবিবেচনার কাজ বলে প্রতিবাদ করে থাকি। বিদেশী ভাষাই আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হলে মুখস্থ করবার প্ররোচনা দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাঁদের মৌলিক চিন্তার প্রসার ঘটতে বাধার সৃষ্টি হয়।

এখন সময় এসেছে। আর বিলম্ব না করে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ের শিক্ষা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে। পঞ্চাশ বছরেরও আগে আমাদের চিন্তানায়কদের নিকট একটি সম্ভবপর প্রস্তাব বলে মনে হয়েছিল। এখন মাতৃভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার প্রশ্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্যগণ ও আইনসভার সভ্যগণকে বিশেষরূপে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি প্রায় সারা জীবন শিক্ষা নিয়ে কাটিয়েছি। যখন আমরা ছাত্র ছিলাম তখন মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল যে,–যে বিজ্ঞানের চর্চা করে প্রতীচ্য এত উন্নতি করেছে, আমাদের দেশে সেটা শীঘ্র চালু হবে, এবং আমরা জীবন উৎসর্গ করব সে সব জিনিস দেশের মধ্যে আনতে।

প্রায় ষাট বছর আগে যখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন দেশের মনীষীরা এবং যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন সেই সব নায়করা মনে করেছিলেন যে জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অন্তত বাংলাদেশের মধ্যে স্বদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করবেন। বহু বৎসর চলে গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তার অনেক সংকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

অন্য দেশে গেলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। সব দেশেই চেষ্টা চলছে মাতৃভাষার মাধ্যমে, যে ভাষা সবাই বোঝে তার উপর বুনিয়াদ করে, শিক্ষার ব্যবস্থা করবার। সব জায়গায় এই রীতি চালু রয়েছে। মধ্যযুগে অবশ্য অন্য ভাষা অবলম্বন করে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ছিল; জ্ঞানী–গুণী লোকরাই তার সুযোগ পেতেন। এর অসুবিধা ছিল এই যে, সাধারণ লোকে বুঝতে পারত না। তার জন্য অন্য লোকের দরকার হত। তারা যেমন বুঝত সেই রকম সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দিত।

www.pathagar.com

এইভাবে কিন্তু দেশের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার বড় আস্তে আস্তে হত। আজকের যুগে একদিকে যেমন লোকে চেষ্টা করছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে দেশকে বড় করতে, মানুষকে নানা রকম সুখসুবিধা দিতে,-তেমনি আবার এটাও বুঝেছে যে কেবল একটা শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান যদি আবদ্ধ থাকে তাহলে উন্নতি তত দ্রুত হয় না। কাজেই আজ যখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তখন আমাদের ভালো করে ভেবে দেখতে হবে কি করে দেশের ভিতর তাড়াতাড়ি শিক্ষার বিস্তার হবে। যদি চেষ্টা করা যায় তবে এ দেশের মধ্যে থেকে অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা দূর করা যেতে পারে-এটা যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন, তাঁরাই জানেন।

আমার ভ্রমণে অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। সে অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে আপনাদের বলব।

প্রায় এক-শ' বছর হল পাশ্চাত্য জাতের হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করল, যে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে সে জ্ঞান ও সে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। এখনও একশ-শ' বছর হয়নি। এরই মধ্যে জাপানের কীর্তি-কলাপের কথা সকলেই জানেন। বিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হল তখন জাপানের দুরবস্থার শেষ ছিল না, আজ কিন্তু জাপানে গেলে মনে হবে না যে এ রকম কোনও অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে-এত অল্প সময়ে দেশের সেই দুরবস্থা থেকে বর্তমান এই অতি সম্পদের মধ্যে কি করে জাপান আবার উঠে দাঁড়াল। শিক্ষা ও উন্নতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি তাই চেষ্টা করেছিলাম জানতে যে, সেখানে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কি রকম ভাবে হয়েছে। জাপানে কম করে নয় বৎসর শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ছেলে ও মেয়েকে স্কুলে পাঠানো হয়। প্রায় সকলেরই স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। এর জন্য কারুর পয়সা লাগে না। নিচের দিকে খরচ যোগায় দেশের মিউনিসিপ্যালিটি কিংবা আমাদের দেশের মতই জেলা অথবা রাজ্যসরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তারাই খরচার বেশির ভাগ দিয়ে থাকে। শিল্পকলা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, সেগুলোর ভার নিয়েছেন সরকার। তাছাড়া উপরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশিরভাগ সরকারি পয়সায় চলছে।

আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে হয়ত কোনও একটা বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করে জাপানে বিজ্ঞান কিংবা শিল্পকলা শেখানো হয়। কিন্তু সেখান গিয়ে দেখলাম যে আমার ধারণা ভুল। আমি অনেক বই জোগাড় করেছিলাম। তার অধিকাংশই জাপানীতে লেখা। তাই পাঠোদ্ধার হয়নি। অবশ্য দু-চারখানা ইংরেজি বইও তার সঙ্গে পেয়েছি।

একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন জাপানিরা। সেখানে শিক্ষিত লোকেরা-যাঁরা দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা শিক্ষক, তাঁরা সকলে একত্র হয়েছিলেন আলোচনা করতে যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের কি করা উচিত এবং মানুষের ভবিষ্যতই বা কি হবে। সম্মেলনে আমি এবং আর দু-একজন বিদেশী ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগই জাপানের লোক এবং আলোচনা যা হয়েছিল তা সমস্তই জাপানিতে। তাঁদের দু-একজন ইংরেজি ভাষাতে কিছু কথা বললেও পরে আলোচনা যা হল সবই জাপানি ভাষায়। এটা বললে ভুল হবে যে, তাঁরা ইংরেজি জানেন না। কেননা, আমরা যখন ইংরেজি বলি তখন তাঁরা প্রায় সকলেই বোঝেন। তবে তাঁদের মনে এমন বিশ্বাস ছিল না যে, ইংরেজি বললে নিজের মনের ভাব স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবেন। সেইজন্য যে সব বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই জাপানি ভাষাতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করছিলেন। দেখা গেল

www.pathagar.com

শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা বর্তমান বিজ্ঞানের উচ্চস্তরের কথা সবই জাপানি ভাষায় বলা সম্ভব এবং জাপানি কথায় তা বলবার জন্য লোকে ব্যগ্র।

আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলোর তুলনায় জাপানি ভাষার কতকগুলো অসুবিধা আছে। যাঁরা একটু খবর রাখেন তাঁরাই তা জানেন। একটা অসুবিধা হল এই যে, আমাদের যেমন অল্পসংখ্যক অক্ষর দ্বারাই সব বাক্য লেখাও যায়, বইতেও ছাপানো যায়, জাপানি ভাষাতে সে ব্যবস্থা নেই। আছে নিজেদের অক্ষর এবং চৈনিক অক্ষর প্রায় হাজার তিনেক। যাঁরা উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক তাঁদের এ সবকটাকেই শিখতে হয়। এর জন্য আমাদের দেশের যেখানে মাতৃভাষা বছরখানেক বা বছর দুয়েকের মধ্যে চলনসই আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়, ছেলেমেয়েদের সেখানে জাপানি ভাষা শিখতে গড়ে লাগে প্রায় ছয় বছর। এত অসুবিধা সত্ত্বেও এমন অবস্থা জাপানি ভাষার যে প্রত্যেক জাপানি বিজ্ঞানী, জাপানি দার্শনিক নিজেদের মনের প্রত্যেকটি কথা জাপানিতে প্রকাশ করতে পারেন। এতে সুবিধা হয়েছে এই যে, দেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যখন চালু হয়েছিল তখন তার জন্য শিক্ষক পাবার কোনও অসুবিধা হয়নি,–এমন শিক্ষক যিনি জাপানি ভাষায় বিজ্ঞান কিংবা দর্শন কিংবা অন্যান্য কলাবিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছেন ও পড়াতে পারেন।

এইজন্য জাপানে তাড়াতাড়ি শিক্ষাবিস্তার হয়েছে। ফলে জাপান অতি সহজেই সমস্ত জ্ঞান আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছে। যদি আমরা জাপানি ও জার্মান জাত দু'টিকে দেখি–পৃথিবীতে যে দু'টি জাত তাড়াতাড়ি জ্ঞানের স্বল্পাবস্থা থেকে আজ একেবারে শীর্ষস্থানে চলে গিয়েছে–তাদের মধ্যে শিক্ষিত অথবা অক্ষর পরিচয় আছে এরকম লোকের সংখ্যা শতকরা নব্বইয়ের উপরে।

এটা ঠিক যে দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বুঝায়, শুধু শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে, এবং দেশকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সমূহ শক্তিই তাদের হাতে থাকবে। আমাদের দেশে অনেক ভাষা আছে। কিন্তু প্রতিটি ভাষায়–বিশেষ করে সেগুলো সংবিধানে গণ্য হয়েছে মুখ্য ভাষা বলে–শিক্ষিতের সংখ্যা সর্বমোট জাপানিদের কিছু কম বা বেশি।

আমার মনে হয় যে প্রথমেই আমরা সারা দেশের কথা না ভেবে যদি আমাদের নিজেদের ঘর তৈরি করে, অর্থাৎ আমরা যে প্রদেশে থাকি সেই প্রদেশের লোকের শিক্ষা এমন ভাবেই বন্দোবস্ত করি যাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর কাছে পৌঁছায়, তাহলে আমাদের সামনে নতুন যে সমস্ত অসুবিধা দেখা যাচ্ছে সেটা সহজেই চলে যায়।

আজকের দিনে পৃথিবীতে একথা চলেছে যে, মানবজাতি একত্র হয়ে একটা মহামানব সমাজ গড়ে তুলবে। কিন্তু এটা কেউ ভাবেন না যে, তার জন্য নিজ নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একটা বিশেষ কোনও ভাষায় চালাতে হবে। কারণ মনে যদি থাকে ভালোবাসা, তাহলে ভাষার অসুবিধা থাকলেও মানসিক যে মিল সেটা রাখতে অসুবিধা হয় না।

অনেক সময় এই কথাটাই বলা হয় যে, ইংরেজি ভাষা না হলে আমাদের দেশে একতা থাকবে না। বলা হয়, আমরা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল দিয়ে একত্র বাঁধা ছিলাম তখনই আমাদের মনে ছিল যে, আমরা একই জাতি। অতএব বর্তমানে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সেই যোগসূত্র বজায় রাখা হোক। কিন্তু এ কথা বললে ভুল হবে যে, ওই শৃঙ্খল পরবার আগে আমাদের জাতীয়তাবোধ ছিল না।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানে আছেন দেশের ঐক্য তাঁরা নিজেদের মনের মধ্যে ততটা হয়ত অনুভব করেন না। আমাদের নেতারা সব সময় অবহিত নন যে সত্যিই পরস্পরের মধ্যে ঐক্যসূত্র কত নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যখন বিদেশ গিয়ে একত্র হন তখন তাঁদের চোখে ঠেকে তাঁদের মনের গঠন এবং আচার-ব্যবহার কত এক অথচ বিদেশী থেকে কত তফাত। সেইজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, প্রাদেশিক ভাষায় নিজ নিজ প্রদেশে যদি শিক্ষা শতকরা পুরোপুরি চালানো যায় তাহলে দেশের ঐক্য ভেঙে যাবে না।

দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের মধ্যে যেমন অনেক গৌরবময় কথা আছে, তেমনি অনেক কলঙ্কের কথাও আছে। এই কলঙ্কের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যাঁদের সূত্রে এই কলঙ্ক ছড়িয়েছে তাঁরা সকলেই ইংরেজি শিক্ষিত। আমি এইটুকু বলতে চাইছি যে, দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমাদের যেমন গর্ব করবার অনেক কথা আছে তেমনি আমাদের দুঃখ করবার, লজ্জিত হবার কথাও আছে। কিন্তু সেই সকলের মূল যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনার মূলে অনেক সময় দেখা যাবে ইংরেজি শিক্ষিত গর্বিত ও স্বার্থপর লোকের কীর্তিকলাপ।

অতএব আমার মনে হয়, ইংরেজি যে দেশের ঐক্যের কারণ তা নয়। একতার কারণ আমাদের নিজেদের মনের মিল। আমরা যদি দরদী হই তাহলে বিদেশী ভাষাভাষীদেরও আমরা আপন করে নিতে পারি, অপরপক্ষে আমাদের মনের মধ্যে যদি ভ্রাতৃবোধ না থাকে তাহলে পাকিস্তান হতে বেশি দেরি হয় না। আবার এই দুই দেশ যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁরা দু-জন একই প্রদেশবাসী, এবং দু-জনেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরেজি ভাষার দ্বারা বহুদিন চেষ্টা করলেও আমাদের দেশে জনজাগরণ হয়নি। তারপর আমাদের জাতীয়তার পিতা যখন দেশের কাছে এসে দাঁড়ালেন-যদিও তিনি ইংরেজি অনেকের থেকে ভালো বলতে ও লিখতে পারতেন-তিনি চেয়েছিলেন এমন ভাষায় কথা বলতে যা সকলেই বুঝতে পারে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন দায়িত্ব আমরা লাভ করেছি। এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিতের আয়ত্তের মধ্যে না থাকে, সেগুলো যেন সকল দেশের কাছে পৌঁছে যায়।

যাঁরা বলেন, ইংরেজি যদি কম শেখানো হয় তাহলে আমাদের দেশের জানালা বন্ধ করে দেওয়া হবে-যার মধ্যে দিয়ে আসে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতার বাতাস, তাঁরা ভুল ধারণা করেছেন যে, চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাঁচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে যেটা কেবল উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবেন সেই রকম নিচের অজ্ঞ লোকেদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্টদায়ক। তাছাড়া সকলের দায়িত্ব অল্পসংখ্যক লোকের একটি শ্রেণীর উপর চিরকালের জন্য চাপানো উচিত নয়। দেশের লোকের উচিত নিজেদের বোঝা নিজেদের বওয়া। আমরা পনেরো বছরেও এ কাজে বিশেষ এগোতে পারিনি।

তাই আমার মনে হয় আজকে যে আপনারা বলছেন, ইংরেজি যে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে সেখান থেকে তাকে হঠানো হোক-এই কথাটা ভালো করে বিচার করে দেখুন। ভেবে দেখুন বিভিন্ন প্রদেশে কি ভাবে এটা কার্যে পরিণত করা যায়। আমি এই হঠানোর জন্য যা বলেছি সেটা শুধু আমাদের আত্মরক্ষার তাগিদেই। কেননা, আমি মনে করি যে ইংরেজির উপর এত বেশি জোর দিলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায় সৃষ্টি হবে। যাঁরা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁদের সারাজীবন চেষ্টা করা দরকার মনের সমস্ত কথা কি করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়।

www.pathagar.com

আমাদের দাবি হল শিক্ষিতদের উপর। তাঁরা চেষ্টা করুন দেশে নতুন যুগ যাতে আসে। শিক্ষার নতুন বাহন তাঁরা স্থির করুন। প্রদেশে প্রদেশে এমন ধরনের ব্যবস্থা চালু করুন যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের দেশ থেকে অশিক্ষা অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। এই সূত্রে ভাবোন্মাদীদের একটু সাবধান করে দিচ্ছি যে, শুধু একটা নাম খারিজ করে, একটা নাম কেটে দিয়ে আর একটা নাম চালালেই আমাদের নতুন যুগের আহ্বান সার্থক হয়ে উঠবে না।

আমাদের প্রয়োজন দেশের লোকেদের শিক্ষিত করা, যে সমস্ত বস্তু-জ্ঞান তাদের কাজে লাগে, তাদের নীরোগ রাখে, বিত্তশালী করে, তাদের মুখের খাবার যোগায়-সেই জ্ঞান দেশের সর্বত্র স্বল্প আয়াসেই যেন পাওয়া যায়, এটাই আমি চাই।

এর জন্য বহুদিন চেষ্টা করতে হবে। শুধু একত্র হয়ে আলোচনা করলেই কাজ শেষ হবে না। আমার আশা আছে আপনাদের এই সম্মেলন থেকে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীরা দেশে গিয়ে এই কথাটা মনে রাখবেন। এই সম্মেলন সার্থক হবে যদি আমরা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে দুটি কথা উপলব্ধি করতে পারি। সে দুটি কথা এই : এক, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হবে; দুই, আমাদের আঞ্চলিক প্রেম ভাষার উপর নির্ভর করে না, সেটা আমাদের মনের কথা। এই দুটি কথা যদি আপনারা নিয়ে যান তাহলেই মনে করব আপনাদের আয়োজন সফল হল। পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা আরও দুটি বিষয়ে সচেতন হব বলে আশা করি। প্রথমত, আমাদের একতা অনেকটা নিচুতে, কেবল ওপরে ওপরে,-এক ভাষা বলছি বলেই একতার বন্ধন আসেনি। দ্বিতীয়ত, এমন কোনও সমস্যা নেই যা সমবেত ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা সমাধান করা যায় না।

আমি পূর্বে বলেছি যে, জাতির ঐক্যবর্ধন হবে কোনও এক বিশেষ ভাষার পন্থায় নয়। মানুষের মনের মিলের উপর যে জাতির একতা প্রতিষ্ঠিত একথা বিশদভাবে বলবার প্রয়োজন আছে। আমরা যদি কিছু গড়ে তুলতে চাই তাহলে কর্মীদের পরস্পরের মানসিক মিল থাকা একান্ত দরকার। তা না হলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আমরা যে চেষ্টা করব, সেটা যে ইমারতের অংশবিশেষ, তা বোধ হয় সব সময় এক ভাবে জুড়বে না।

একটি বিদেশী ভাষা, একটি বিদেশী শাসন, আমরা অনেকদিন সহ্য করেছি। যদি এর দ্বারাই ঐক্যসাধন হত, সে ঐক্যসাধন এতদিনে হওয়া উচিত ছিল। তা হয়নি বলেই সংবিধানের স্বীকৃতি ও নির্দেশের বিরুদ্ধে আজ নানা রকম কথা উঠেছে।

আমাদের দেশের ঐতিহ্য বহু শত বৎসরের সাধনার ফল এবং তা যত পুরনোই হোক না কেন, সে সবই আমরা জীবনের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চাই। ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। আমি অন্তত নিজের মন থেকে অনুভব করেছি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি ঐক্য নাও থেকে থাকে, মনের ঐক্য যে ছিল সেটা নিজের স্বার্থবোধ কিছুটা দমিয়ে রেখে দেশের মধ্যে কেউ ভ্রমণ করলেই বুঝতে পারবেন। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা, আমাদের তীর্থযাত্রীরা, আমাদের সাধারণ হিন্দু ছেলেমেয়েরা, এমন কি গ্রামের ভিন্ন ধর্মের লোকেরা যারা এক সঙ্গে থাকেন তাঁরা সকলেই অনুভব করেছেন যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধন আছে সেটা সহজে ছিন্ন হবার নয়। তবে স্বার্থের সংঘাত কখনও ঐক্যবোধকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঐক্যানুভূতিকে জাগিয়ে রাখা সাধনা বিশেষ। মুখের কথায় ঐক্য হবে না।

এই সাধনার পথ কি? আমার মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের নিজেদের ভাষার মধ্যে দিয়ে বুঝতে হবে আমাদের ঐতিহ্য কি এবং কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের মিলন ছিল। পৃথিবীর এই বৈচিত্র্য যে, প্রতি মুহূর্তে মানুষের কাছে দাবি আসে সে একটা নতুন কিছু করুক। তাই আমাদের দেশের ঐক্য আগে যে ভাবে অনুভূত হত তার

www.pathagar.com

তুলনায় আজকের দিনে যা আমরা গড়ে তুলব সেটা আরও বিশেষ বৈচিত্র্যসম্পন্ন হবে; আরও গভীর, এবং তার মধ্যে শক্তি হবে আরও বেশি। এটা আমি বিশ্বাস করি।

আমাদের কাছে ডাক এসেছে–এবার নিজেকে চিনতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সমস্তলোককে আঁকড়ে নিয়ে জানতে শিখুক যে, স্বাধীনতার স্বাদ কি, কি আমরা হারিয়েছিলাম এবং আজকের দিনে কি আমরা পেয়েছি।

আমাদের সেই সব রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, যে রাস্তা অনুসরণ করে অন্যান্য জাতিরা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। এই রাস্তায় আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এইজন্য দেশের লোকের সকলের মনের মধ্যে বর্তমান যুগের যে প্রধান কথা তা পৌঁছে দিতে হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনোভাব এখন আর রাখলে চলবে না। মানুষ যে শক্তি অর্জন করেছে প্রকৃতির উপর, তার যে প্রভাব হয়েছে নানা দেশে, সেটা অনুভব করতে হবে শুধু আজকে আমরা যাঁদের শিক্ষাভিমানী বলি তাঁদের নয়, দেশের প্রত্যেককে।

এ না হলে অন্যান্য দেশ যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল রাখতে পারব না। আর সত্যি ভারতবর্ষ বলতে যদি আমাদের মনের মধ্যে একটা বিশেষধ্বনি ওঠে, যদি আমাদের প্রাণ কাঁদে স্বদেশবাসীর জন্য, তাহলে একটি বিদেশি ভাষার দরকার হবে না পরস্পরের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করবার জন্য। যে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশী শক্তিকে দেশ থেকে বের করবার জন্য সংগ্রাম করেছিল তারা যখন নিজেরা ক্ষমতা হাতে পেল তখন তাদের মধ্যে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার একটা প্রবণতা দেখা দিতে লাগল।

বিচ্ছিন্ন মনোভাবকে দূর করে সংহতি সৃষ্টির কাজ, মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজেই হতে পারে। কেবল রাজকীয় মঞ্চ থেকে একতার কথা বললে চলবে না। আমাদের বলতে হবে প্রত্যেক ঘরের কোণ থেকে এই একতার বাণী। কেবল বললে চলবে না যে, আমরা শিক্ষার বিধান করেছি। সত্যি করে সকলকে মনে করতে হবে যে এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এই জন্যই মাতৃভাষার দরকার, সাধনার দরকার এবং মনকে শুদ্ধ করবার দরকার। তাই পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি না করে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের আলোচনা করা উচিত।

আপনারা যাঁরা এটা অনুধাবন করেন তাঁরা ধৈর্য ধরে আপনার সীমার মধ্যে কাজ চালিয়ে যান। আমরা ছেলেবেলায় বলতাম, এগিয়ে চল, কেননা উপরের ভাগ্যবান আছেন এবং আমাদের ভয় করবার কিছু নেই। আপনাদের মনের মধ্যে যদি একতার ছবি ফুটে ওঠে থাকে তাহলে আপনাদের ভয় করবার কিছু নেই। আপনারা সকলে মিলে যে আন্দোলন শুরু করেছেন তা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, আমাদের লোকেরা জানুক আমাদের উপর কতটা দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যেন অল্প দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি,–যার ফলে প্রত্যেক শিশু, প্রত্যেক যুবক–যুবতী মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আমরা যেন বুঝতে পারি যে, এই বর্তমান যুগে যেখানে আমরা জন্মেছি সেখানে অল্পশিক্ষায় ভীষণ বিপদ আছে।

আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। কারণ, কথা বলে যে সব সময় আমরা মনকে স্পর্শ করতে পারি তা ঠিক নয়। একজন লেখক বলেছিলেন যে, ভাষার কাজই হচ্ছে লোকের মনের ভাব গোপন রাখা। আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে যে পরস্পরের বিষয়ে যদি মনোযোগ সহকারে ভাবি তাহলে নিজের মন থেকে যে উত্তর নির্ভুল ইঙ্গিত দেয় তা আপনি খুঁজে পাব। আমি তাই আশা করি আপনাদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করবে।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

হুমায়ুন কবির

ভারতে এ-যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার ধারার সমালোচনা হয়েছে অনেক। সব সমালোচনারই যে খুব জোরালো যুক্তি আছে তা নয়, তবে কতকগুলোতে কিছু যুক্তি আছে বৈকি। এই কথাটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বড় বেশি পুঁথিগত ও অব্যবহারিক। এতে মানুষ জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষা পায় না। এর দোষ এই যে, এ শিক্ষা পেয়ে মানুষ শারীরিক শ্রমের কাজ এবং গ্রাম্য জীবনের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার মোহ বহু উদ্যোগী-উৎসাহী গ্রাম্য তরুণকে শহরের দিকে টেনেছে। তাতে যদি শহরের কিছু লাভ হত তাহলে না হয় বোঝা যেত, কিন্তু তা বিশেষ হয় নি। শহরে এসে শেষ অবধি এদের অনেকেই নানা ব্যর্থতার আঘাতে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত হয়; তাতে জীবনের অনুরাগ আর শক্তি যায় অপরিচিত হয়ে। কিন্তু এরা যদি গাঁয়ে থাকত তো নানা গঠনমূলক কাজে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাতে পারত।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে আর-একটা সমালোচনা আছে। এই সমালোচকরা বলেন " এই নবযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়া হয়েছিল ইংরেজদের রাজকার্য চালাবার লোক তৈরি করবার জন্যে। ইংরেজরা যখন তাঁদের রাজত্ব কায়েম করলেন ভারতে তখন নিজেরা যত ভালো-ভালো বড়-বড় পদ নিলেন। কিন্তু তাতে তো আর সারা রাজ্যের কাজ চলে না, আরও লোক চাই,-মোটামুটি কিছু লেখাপড়া-জানা লোক। এমনি-সব লোক-তৈরির জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রবর্তন হল। সেইজন্যেই এই শ্রেণীর সমালোচকরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেরানি-তৈরির কারখানা ছাড়া কিছু নয়।

এই যে মোটামুটি দু-রকম সমালোচনা-এর ভেতর কিছু-কিছু সত্য যে নেই তা নয়, তবে এতে দোষকে বড় বাড়িয়ে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা কিছুটা ভাবধর্মী হবেই। মানুষ যে সৃষ্টির অপরাপর প্রাণী থেকে বড় তা কিসে?-চিৎ-শক্তিতে। এই শক্তির প্রকাশ ভাবে, চিন্তায়, স্মৃতিতে ও জ্ঞানে। এই শক্তির কল্যাণে মানুষ কতকগুলো বিশেষ ব্যাপার থেকে নির্বিশেষ সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুমান করতে পারে। তাই তার চিন্তা-চেষ্টায় কিছুটা ভাব বা তত্ত্বের প্রভাব না থেকে পারে না। এই ধারার মনোভাব থেকে বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, শুধু ভাব-তত্ত্ব-ধর্মী শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয়; এই দুইয়ের সমন্বয়ে-সামঞ্জস্যে যে-শিক্ষা তা-ই হল ঠিক শিক্ষা। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে পরিমাণে এই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে সেই পরিমাণে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য থেকে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ধারার সমালোচনাও একদেশদর্শী, অতিদোষদর্শী। হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পোড়েই আরামের চাকরি পেলে খুশি হয়, কিন্তু তাই বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু কেরানি-তৈরির যন্ত্র-এমন কথা বলা ঠিক হয় না। ব্রিটিশ ভারতের নয়াধারার শিক্ষাটা এল কোন্ কোন্ সূত্রে তা না জানলে এর স্বরূপ ও হেতু নিরূপণ করা সহজ হবে না। শুধু যে ইংরেজি শাসক-প্রশাসকরাই পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা তো নয়, করেছিলেন ক্রিশ্চান্ মিশনারীরা, অল্পসংখ্যক ভবিষ্যতধর্মী ভারতীয় মহাপুরুষ। তাঁরাই উদ্‌বোধন-প্রবর্তনের ফলেই ভারতীয় জীবন নতুন আশায়-এষায়-ভাষায়, উৎসাহে-উদ্যোগে-উদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে উঠল উনিশ শতকে। তাছাড়া, এই কথাটা ভুললে চলবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারার উদ্দেশ্য যদি শুধু কেরানি- তৈরি হবে তবে তাতে গণিত, লজিক, রাজনীতি, কাব্য-সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির মতো বিষয়-পাঠনের নির্দেশ থাকবার দরকার কী? তাহলে তো কেবল সংক্ষেপ-লেখন, হিসাব-শিক্ষা ইত্যাদি অফিসের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোই পাঠ্য হত।

ঐ-দুটো ধারার সমালোচনা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে একটি ধারা অপরটির অনেক যুক্তি খণ্ডন করে দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা যদি তত্ত্ব-ভাব-ধর্মী হয় তো তা যে কেরানি তৈরির জন্যে নয়-সেই কথাই প্রমাণিত হয়। আর যদি কেরানি-তৈরির যন্ত্র হয় তবে তাকে অকেজো বলে নিন্দা করা যাবে কেমন করে? এরপরেও হয়ত কেউ কেউ তর্ক করবেন যে, দেশে যত সংখ্যক কেরানি দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি বেরোয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু এ যুক্তিতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা অকেজো।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষত্রুটি কি নেই?-আছে, গলদ হচ্ছে- শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সংখ্যার অভাব, উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, আর সবার ওপর অর্থের অপ্রাচুর্য। শিক্ষকের অভাব শুধু যে সংখ্যায় তা-ই নয়, অভাব যোগ্যতায়ও। শিক্ষিত শ্রেণীর যোগ্যতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা শিক্ষাবৃত্তি নেন না; এর মুখ্য হেতু হচ্ছে শিক্ষাবৃত্তিতে যথেষ্ট, সংগত পারিশ্রমিকের অপ্রাপ্যতা। কাজে-কাজেই সমস্ত সমস্যাটা এসে ঠেকেছে অর্থের ব্যাপারে। অর্থের অপ্রাচুর্যের জন্যে শুধু যে যোগ্য-দক্ষ শিক্ষকের অভাব হয় তা-ই নয়, বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি প্রভৃতির দৈন্যদুর্দশা ঘোচে না। সাধারণত এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ এমনই অপ্রশস্ত-অপরিসর যে, সেখানে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের কঠিন কাজ করার উৎসাহ যায় উবে। এই অর্থসংকোচের ফলেই ছাত্র-সংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক রাখা সম্ভব হয় না। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের ধারণারও ভ্রান্তি আছে : এ-ও এক বিপত্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতে আসে ছাত্ররা পরে ভালো চাকরি পাবার আশায়। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রথম যুগে এ-শিক্ষা নিত খুব কম লোকই। তাই তারা পেত ভালো-ভালো কাজ। এ থেকে ঐরকম ধারাণাটা এসেছে। কিন্তু এখন যে বহু ছাত্র পাশ করে বেরোচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা পেয়ে। এখন আর অত ব্যক্তিকে চাকরি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা হচ্ছে তীব্র সমালোচনা আর নিন্দার বিষয়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাকে দায়ী করলে ঠিক হবে না, করতে হবে অর্থনীতিক অবস্থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার যে কোনও দোষত্রুটি, বাধাবিপত্তি নেই সেকথা বলা হচ্ছে না। তবে এ-ও মানবার কথা যে, ভারতের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে নবজাগরণ আনায় অনেকখানি আনুকূল্য করেছে এই শিক্ষাধারা। রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি আনার ব্যাপারেও এর দান

www.pathagar.com

অন্যতম প্রধান। তবে ভারতের পরাধীন অবস্থার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমনটি ছিল এখন তো আর তাদের ঠিক তেমনিটিই রাখা যায় না; রাজনীতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের দাবিতে তাদেরও যথেষ্ট সংস্কার হওয়া দরকার। ভারত গণতন্ত্রী ছাঁচের সরকার প্রবর্তন করেছে। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণের উন্নতি-সমৃদ্ধির জন্যে সুযোগ, সাম্যের বিধি-বিধান ও ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা যাতে এই লক্ষ্যে পৌঁছবার মতন মন তৈরি করতে পারে, যাতে তা যুগোপযোগী হয়ে ঐ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিতে পারে মানুষকে তারই ব্যবস্থা করতে হবে এখন।

২

অতীত যুগ থেকে আধুনিক যুগকে পৃথক বলে ধরা হয় দুটো যুগের লক্ষ্য-পার্থক্যের জন্যে। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ হল অনুভূতি ও চিন্তার আবশ্যিকতা এবং মানব সমাজের বৃহত্তর সংহতি। এখন আর প্রায় কোনও মানুষেরই চিন্তা-ভাবনা না করলে চলে না। এখন কোনোদেশের মানব-সমাজ পৃথিবীর অপরাপর অংশের মানব-সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট বা নিঃসম্পর্ক হয়ে থাকতে পারে না। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করে দেশে-দেশে যাওয়া তত সম্ভব বা সহজ ছিল না মানুষের পক্ষে। তাই গিরিদরিমরু-পারের দেশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত; একদেশের মানুষ সম্বন্ধে অপরদেশের মানুষের কোনও জ্ঞান-পরিচয় প্রায় ছিল না বললেই হয়। যাত্রাপথে দুর্জয় প্রাকৃতিক বাধাগুলোর জন্যে যাত্রায় সময়ও লাগত খুব বেশি। যাত্রাকালের দীর্ঘতার দরুন বিভিন্ন সমাজের মানুষের ভেতর শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য হত। স্থান আর কালের দূরত্ব এখন অপসারিত হয়েছে, আরও হতে চলেছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-গবেষণা এবং নির্মাণ-বিজ্ঞানের উন্নতির কল্যাণে এখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে মাত্র ২৪ ঘণ্টা লাগে।

মানব-সমাজে এই আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার সূচনা হয়েছিল কখন?-প্রায় তিন-চারশো বছর আগে। টয়েনবি নামে এ-যুগের এক ইতিহাসতাত্ত্বিক এক জায়গায় বলেছেন, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রেট ব্রিটেন থেকে রোম যেতে কোনও রোমান সম্রাটের যে-সময় লাগত উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একজন ব্রিটিশ কূটনীতিকের রোম থেকে লন্ডন যেতেও ঠিক একই সময় লাগত। উনিশ শতকের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক সাধনায় ও নির্মাণ বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটল। ফলে ঐ-যাত্রাটা সমাধা করার সময় কমে হল ২৪ ঘণ্টা। দিন-দিন এ বিষয়ে এত উন্নতি হয়ে চলেছে যে, জেট বা এই ধরনের দ্রুতগামী বিমানে লন্ডন থেকে রোম কি রোম থেকে লন্ডন যাত্রা করতে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ২৪ মিনিট লাগবে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে স্থানকালের ব্যবধান যেমন কমেছে তেমনি হয়েছে প্রকৃতির নানা শক্তি ও উপাদানকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা। অবশ্য, বিজ্ঞানের বলে মানুষের ধ্বংস শক্তিও কম বাড়েনি। অতীতে কোনও জাহাজ সমুদ্রপথে যদি কুয়াশার বেড়াজালে পড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হত হবে তার আর রক্ষার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন আর সে ভয় নেই। এখন যদি কোনও নাবিক দূর সমুদ্রে পথ হারান তো বিমান ও বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে তিনি হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। তার ফলে উদ্ধারকারীরা সেখানে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন। বিনাশের ক্ষেত্রেও তেমনি মানুষের শক্তি কিছু কম বাড়েনি। অতীতে মানুষের অস্ত্রশস্ত্রে আর কত মানুষ মরত?-এখন একটি আণবিক কি হাইড্রোজেন বোমায় লক্ষ-লক্ষ মানুষ নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

এই যে যানবাহনের গতিসম্বলতা–এর ফলে সামাজিক, অর্থনীতিক এবং রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও কম পরিবর্তন ঘটল না। এই জন্যে এখন দেশে–দেশে, রাষ্ট্রে–রাষ্ট্রে, সমগ্র মানব–সমাজেই আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এত দরকার হয়ে পড়েছে। অতীত যুগে মানব সমাজের মিলনের সংহতি ব্যাহত হত প্রাকৃতিক বাধায়। তখন এক–একটা মানব–সমাজ আপন ঐতিহ্য–প্রথা পদ্ধতি আর আচার–সংস্কারের গণ্ডিতে আটকে থাকত, থাকতে বাধ্য হত, থাকলেও তত হানি হত না। কিন্তু এখন আর তা হলে চলে না। দূর–দূরান্তের মানবসমাজ এখন কাছে এসে গেছে; তাই মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব এখন আর রাখা চলে না, রাখা ঠিক নয়। তাতে বিরোধ–বিবাদ পাকিয়ে উঠে সর্বনাশা ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হবে। সারা পৃথিবীর মানব–সমাজ এখন যেন এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এখন সমগ্র মানব–পরিবারের হয় একসঙ্গে উত্থান, নয় একসঙ্গে পতন। এই হবে এ যুগের নীতি ও আদর্শ; কিন্তু এখনও হয়নি তা। মানুষের মন এখনও আছে পিছিয়ে, সুর মেলাতে পারেনি এই পরিবেশের সুরের সঙ্গে। মানুষের সত্তা এখন দু–টো ভাগ হয়ে গেছে যেন : একদিকে তার সহজাত আবেগ–সত্তা, অপরদিকে বুদ্ধিসত্তা। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ বুঝছে যে, আধুনিক পৃথিবীর মনুষ্য–সমাজ নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত, কিন্তু তার চিরাচরিত নানা সংকীর্ণ ভাবাবেগ আর সংস্কার সে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারছে না; সাম্প্রদায়িক, জাতীয় প্রভৃতি বিবিধ অচলায়তনিক রীতিনীতি পূর্ণরূপে ফুটে উঠতে দিচ্ছে না তার বুদ্ধিস্বীকৃতিকে। এটাই হল এ যুগের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

মানব–সমাজের ইতিহাস থেকে জানা গেছে যে, মানুষের কোনও সাংস্কৃতিক অবদান–সম্পদ যদি কোনও একটা সম্প্রদায়ের ভেতর আবদ্ধ হয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত তা লুপ্ত হতে বসে; সারা মানব–সমাজে মানুষের যা–কিছু শ্রেয়ো–প্রেয়ো, যা–কিছু সর্বকল্যাণকর–তাকে সর্বজনলভ্য করে তোলাতেই গণতন্ত্রের সার্থকতা। ভারতের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রকে যদি সার্থক হতে হয় তা দেশবিদেশের মানুষের সংস্কৃতি–সাধনার সঙ্গে ভারতবাসীদের পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। এখন সারা পৃথিবীর মানব–সমাজের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা। এখন আপন সভ্যতা–সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় পেতে হলে দরকার আর আর সভ্যতা সংস্কৃতির পরিচয়। সেকালে রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কটা তত ঘনিষ্ঠ ছিল না; একালে কিন্তু তা নয়। এখন এই দুই–এর সম্বন্ধ প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠায় মানুষের ব্যক্তি–জীবনেও রাষ্ট্রকে কিছুটা হস্তক্ষেপ করতে হয়। এই সব কারণেই এখন যে–কোনও নাগরিকের রাজনীতি–অর্থনীতির ব্যাপারে অল্পবিস্তর জ্ঞান না থাকলে নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য কী?– মানুষের অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তীর্ণ করা। বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সীমিত। তাই সেই সীমিত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকলে মানুষের প্রগতির পথ হবে সংকীর্ণ। মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্য কাল আর সমাজের মানুষের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার শক্তিতে। মানুষ যে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে এগিয়ে গেছে তা এই শক্তির গুণে। এটি না থাকলে শারীরিক শক্তিতে হীন মানুষ বহুকাল আগে জবরদস্ত জানোয়ারদের কাছে হার মেনে চলে যেত সৃষ্টিরঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে। শিক্ষাই সেই অভিজ্ঞতাকে বাড়াবার সুযোগ দেয়। তাই শিক্ষা যত বাড়বে মানুষের অভিজ্ঞতার সীমানা ততই প্রশস্ততর হতে থাকবে।

উপস্থিত পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; খুব অল্পসংখ্যক ভাগ্যমন্তই তা পায়। এখনও বহু দেশে তো প্রাথমিক শিক্ষাই বহুজনকে দেয়া সম্ভব হয়নি। এ যুগে শুধু টিকে–থাকার জন্যেই প্রাথমিক শিক্ষার দরকার। এই শিক্ষার স্তরেই অধিকাংশ

www.pathagar.com

লোকের শিক্ষা শেষ হয়। প্রায় শতকরা আশিজন লোক এর পর আর শিক্ষা নিতে উদ্যোগী হয় না। সাধারণত এরা আপন স্থানের দশ-বিশ মাইলের পরিধির বাইরে বড় একটা চলাফেরা করে না।

খুব কমসংখ্যার লোকই প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে উচ্চশিক্ষা নেবার জন্যে উদ্যোগী হয়। এই লোকসমষ্টিকেও আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় : একটা বড়, একটা ছোট। বড় ভাগটা মাধ্যমিক শিক্ষার পর আর এগোয় না, ঐখানেই শিক্ষার ইতি করে। প্রাথমিক শিক্ষিত লোকদের অভিজ্ঞতা ও বোধশক্তির চেয়ে যে মাধ্যমিক শিক্ষিত লোকদের শিক্ষা ও বোধশক্তি বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাতে বড়জোর ব্যক্তি ও সমাজের অল্পপরিসর ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো মিটতে পারে; দেশ ও সমাজের বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শ, অবস্থা ও ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এর জন্যে দরকার উচ্চতর শিক্ষার। অল্পসংখ্যক লোকই এই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। কিন্তু তা হলেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ও সমস্যা সঙ্কট সমাধানের প্রয়োজনে এঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে হয় অসংখ্য সাধারণ মানুষকে।

গণতন্ত্রকে যদি সফল ও সার্থক হতে হয় তবে অন্তত সাধারণ শিক্ষা সব নাগরিককেই দেয়া চাই। এটা রাষ্ট্রের ন্যূনতম কর্তব্য। দেশে আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষা যেমন তার একান্ত কর্তব্য এ-ও তেমনি। এই সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা-ব্যাপারটা এত বিশাল ও ব্যাপক যে, যেমন-তেমন বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে সে-কাজ সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণভাবে হওয়া সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের জ্ঞানবোধও আরও বেশি থাকা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষকদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমানের শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক। সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যদি সরকারকে করতে হয় তবে তারও জন্যে তেমন যোগ্য বহু মানুষ চাই, কেননা, সেই ব্যবস্থার জন্যে অফিস খুলতে হবে স্থানে-স্থানে। এই লোকগুলোকে নিশ্চয়ই যথার্থ শিক্ষিত ও জ্ঞানবোধসম্পন্ন হতে হবে; প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সে-জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশে সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়-মানের শিক্ষাও প্রসারিত হওয়া দরকার।

একালের পৃথিবীতে একদিকে সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা অপরদিকে উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজে এর দাম অনেক। দেশের লোকদের জীবন-মান উন্নীত করতে হলে দরকার বৈষয়িক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। শিক্ষা ব্যতিরেকে তা হওয়ার পথ নেই। শিক্ষা দ্বারাই দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয়। শিক্ষার সাহায্যেই মানুষের বাস্তুবিজ্ঞান ও নির্মাণ-বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধির উপায় হয়ে থাকে। দেশে দারিদ্র্য থাকে তার মানুষের জ্ঞান-অশিক্ষার জন্যে, আর সমৃদ্ধি আসে তাদের শিক্ষা-জ্ঞান থেকে। বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন কী না সম্ভব হচ্ছে? বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে দেশে কোনও অভাব-অনটন থাকবার কথা নয়। বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে উচ্চশিক্ষার দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় সেইজন্যেই এত প্রয়োজনীয়।

তাছাড়া, আন্তর্জাতিক জ্ঞান-পরিচয় এবং পারস্পরিক বোঝাবুঝি, সহিষ্ণুতার চর্চা ও শিক্ষার জন্যে চাই বিশ্ববিদ্যালয়। এ যুগে সারা পৃথিবীর মানব-সমাজকে ছেড়ে কোনও দেশ থাকতে পারে না, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়, রাখলে ভালো বই মন্দ হয় না। এখন এই সম্পর্ক যাতে প্রীতি, মৈত্রী ও সহযোগের হয় তারই ব্যবস্থা ও চেষ্টা করতে হবে। নইলে, বিরোধ-বিসংবাদের পথে গেলে এখন মানবজাতি ও সভ্যতার সমূহ বিনাশের আশঙ্কা, কেননা, বিজ্ঞানের বলে এখন অস্ত্রশস্ত্রও ভীষণ মারাত্মক ও সাংঘাতিক হতে পেরেছে

www.pathagar.com

ও পারছে। এই প্রণষ্টির পথে মানুষকে না যেতে দিতে হলে মানুষের মধ্যে জাগাতে হবে শুভবুদ্ধিকে। উচ্চশিক্ষাই দিতে পারে সেই শুভচেতনা। অন্ততপক্ষে যাঁরা দেশের নীতি ও আদর্শ নিরূপণ করেন তাঁদের সেই উচ্চশিক্ষা থাকা অপরিহার্য।

যে-কোনও সমাজেই নেতা-নায়কদের স্থান বেশ গুরুত্বযুক্ত। নেতা নইলে বিরাট সাধারণ জন-সমাজ চলতেই পারে না। পথের নির্দেশ, লক্ষ্য-নির্ধারণ, আর কর্মসূচির প্রস্তুতি প্রভৃতি কাজ তো নেতারাই করেন। অ-গণতন্ত্রী সমাজে নেতৃত্বের অধিকার-ব্যাপারটা জন্মগত বা কৌলিক; নেতার ছেলেই নেতা হবেন, রাজার ছেলে রাজা, হোতার ছেলে হোতা, মোড়লের ছেলে মোড়ল-তা তাঁদের প্রয়োজনীয় গুণ-শক্তি থাকুক আর না থাকুক। গণতন্ত্রী সমাজে তা হয় না। সেখানে নেতৃত্ব নায়কতার অধিকার গুণগত। এই সমাজে অধিকার সুযোগের সাম্যনীতি স্বীকৃত বলে এখানে যে-কোনও মানুষেরই অধিকার থাকে নেতা হবার। কিন্তু শিক্ষা-জ্ঞান না থাকলে সে সুযোগ ঠিকমতো গৃহীত হতে পারে না। সুতরাং এর জন্যেও শিক্ষার অতীব প্রয়োজন। তাছাড়া, সাধারণ মানুষ যাতে নায়ক-নেতাদের নেতৃত্ব-পরিচালন ঠিক বুঝে-সুঝে নিতে পারে, তাঁদের চিনে নিয়ে নির্বাচন করতে পারে তার জন্যেও উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা কম নয়। সেকালে নেতারা ভুল করলে জাতির দুঃখদুর্ভোগ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখানে তাঁদের ভুল হলে জাতির সর্বনাশের আশঙ্কা। তাই তো এখন সবদিক থেকেই প্রয়োজন উচ্চশিক্ষার।

গণতন্ত্রী সমাজে নেতানায়কদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি বলে সেখানে শিক্ষাধারা যে জাতীয় ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়া দরকার, তা বলাই বাহুল্য। তা হলে সমাজের সব জায়গা থেকেই নেতা নির্বাচিত হবার সুযোগ হবে। কিন্তু, একথাও মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার সুযোগ-সাম্য থাকলেও নানাভাবে মানুষে-মানুষে তফাত থাকবে। সব লোকেরই শিক্ষা-জ্ঞান সমান হয়ে যাবে না। তা না যাক। তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। গণতন্ত্রী সমাজে এ বৈচিত্র্য বেখাপ্পা হবে না। এতে শুধু এইটুকু দেখার থাকে যে, যোগ্য লোকের ওপরই যেন গুরু কাজের ভার থাকে। সব লোক রাষ্ট্রীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করলে অনেক সন্ন্যাসীতে রাষ্ট্রীয় কাজের গাজন নষ্ট হতে বসবে। আর একটা কথা-শিক্ষার সুযোগ-সাম্য থাকলেও কেউ-কেউ আপন-আপন শক্তি-প্রতিভা-বলে অনেককে ছাড়িয়ে যাবেন। তাঁদের সেই অসাধারণ শক্তির স্বীকৃতি না হওয়া সত্যিই তেমনই দোষের, যেমন দোষের সুবিধায় প্রতিষ্ঠিত কিন্তু অযোগ্য লোকদের স্বীকৃতি হওয়া।

৩

প্রত্যেক দেশের জীবনযাত্রার রীতিতে দুটো শক্তি কাজ করে- একটা স্থিতির, একটা গতির। জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকটা স্থিতির আর নবাগত চিন্তাধারা ও কাজকর্মের দিকটা গতি বা পরিবর্তনের। এই দুই-এর ভেতর একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করাই হচ্ছে উচ্চশিক্ষার অন্যতম কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার মধ্যে দিয়ে করবে এই কাজ। অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো করেও তাই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও তা করতে হবে। কোনও সমাজই একেবারে অচলায়তন হয়ে থাকতে পারে না। বাইরে থেকে ক্রমাগত নানা নবনব ভাবের স্রোত এসে পড়ে। তার চাপে সমাজের পুরনো আদলে বদল হয়েই চলে। পরিবর্তন-সচেতনতা জাতির জীবনের লক্ষণ। কিন্তু লক্ষ রাখতে হবে, এই পরিবর্তনশীলতা যেন সমাজের অভ্যন্তরীণ ঐক্যসংহতি আর স্থিতিশক্তিকে একেবারে উপড়ে না ফেলে। ফেললে সমাজদেহে বিরাট ভাঙন ও বিনষ্টি দেখা দেবে।

www.pathagar.com

কোন-কোনও দেশে বড়-বড় বিপ্লব ঘটে জাতির আদর্শ নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিপ্লব থেকে যে পরিবর্তন হয় তার বেগটা থাকে প্রবল, কিন্তু তা পুরোপুরি দেশ ছাড়া হয় না, দেশের ঐতিহ্যে তার বীজ থাকে। ফ্রান্স ও রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়েছিল তার মূল ছিল ঐ দেশ দুটির জাতীয় চরিত্রে, ওদের ইতিহাসে। এই যে দুটি বিপ্লব- এ দুটিও রূপে স্বভাবে এক ছিল না। বিপ্লবের পরিবর্তন প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে আসে বলে তাকে আকস্মিক মনে হয়, কিন্তু, আসলে তা আকস্মিক নয়। তার ক্রিয়া সমাজ-দেহের ভেতরে অনেককাল ধরে কাজ করে আসে, তার প্রকাশটাই জোরের সঙ্গে। মোটকথা, জাতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিবর্তনের যোগ না থাকলে তাতে বিনাশের বিপত্তি দেখা দেয়। এর উদাহরণ আছে মানব-ইতিহাসে। যেখানে একটি প্রাচীন সমাজে অগ্রসর সভ্যসমাজের ধারা-ধরন এসে পড়ে সেখানে দেখা দেয় অমনি বিপত্তি। অস্ট্রিক্ কি রেড্ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারা এসে পড়ার ফলে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি গেছে বিনষ্ট হয়ে; শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে তারা।

সমাজের ঐ স্থিতি আর গতি-শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হলেই ব্যক্তি ও সমাজের সুস্থ-স্বস্থ অভ্যুদয় হতে পারে। সৃষ্টির বস্তুলোকে যেমন মানব-সমাজেও তেমনি কাজ করে চলে স্থিতিশীলতার রীতি। অবস্থার চাপে না পড়লে সাধারণত মানুষ পরিবর্তন ভালোবাসে না, শিক্ষাও রক্ষণশীল হয়ে দাঁড়ায়। অথচ শিক্ষাই সমাজে পরিবর্তন আনার একটা উপায়। অবশ্য, শিক্ষা রীতি-প্রথার মতো রক্ষণশীল কখনই হয় না। এর মধ্যে একটা এই গুণ থাকেই থাকে যে, এর কল্যাণে প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী-নানা প্রকারের আচার-সংস্কার মানুষের জানা হয়ে যায়; তার ফলে মন কিছু না কিছু উদার ও সহিষ্ণু হয়ই হয়। এই যে নানা আচার-সংস্কারের জ্ঞান পরিচয়-এটা সাক্ষাত অভিজ্ঞতা থেকে অতখানি পাওয়া যায় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের চিরাচরিত, গতানুগতিক সামাজিক রীতি-প্রথা ও আচার-সংস্কার পরিবর্তন স্বীকার করবার মতো মন তৈরি করতে পারে শিক্ষা; অথচ এই শিক্ষা আকস্মিক কোনও নাড়া দিয়ে যে এই মনোভাব আনে তা নয়। আদিমধর্মী সমাজগুলোতে সামাজিক আচার-বিচারেরই প্রভাব বেশি। শিক্ষার অভাবে সেখানে আত্মরক্ষা ও বহিঃস্থ জীবনচর্যা গ্রহণের শক্তি কম থাকে। তাই সভ্য-সমৃদ্ধ সমাজের সংস্পর্শে এলে ওরা নিজেদের সত্তা-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না। অভ্যাসগত এই সভ্য সমাজের গ্রহণযোগ্য জিনিসগুলো যে নেবে তেমন মনোভাবও থাকে না তাদের। শিক্ষা যত উন্নত হবে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ততই হবে বিস্তীর্ণ। সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতির কোনগুলো ভালো, কোনগুলো মন্দ, কোনগুলো স্থায়ী মূল্যের, কোনগুলো অস্থায়ী ও তাই বর্জনীয়-সে জ্ঞান দিতে পারে উচ্চশিক্ষাই। পুরনো-নতুন, পরিচিত-অপরিচিত, বিষয়ের দোষগুণ বিচার করার শক্তি আসে এই উচ্চশিক্ষা থেকে। সবকিছুর সামঞ্জস্য সমন্বয় করে চলবার মতো মতিগতি ও ক্রিয়াশক্তি আসতে পারে এই উচ্চশিক্ষার পথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হল এইরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও এই লক্ষ্যের কথা মনে রাখতে হবে।

৪

এখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশেষ কর্তব্য কী হবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাচ্ছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নানা সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধক হতে হবে। একথা প্রথমটায় বেখাপ্পা শোনাতে পারে, কেননা, ভারতের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই তো এই সমন্বয় সাধন। তবে, আবার ওকথা নতুন করে বলার দরকার কী?- দরকার এই যে, সমন্বয়সাধন এখন সচেতন চিন্তা-কর্মের ক্ষেত্রে হওয়া চাই, শুধু ভাবাবেগের তাগিদে হলে হবে না। এখন

www.pathagar.com

ভারতের বিভিন্ন সমাজ সম্প্রদায়ের নীতি-মতের যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা বা সমন্বয় দেখা যায় তা প্রধানত গতানুগতিক, অভ্যাসচালিত। ভারতের এই সমন্বয়-রীতিকে এখন যদি সজ্ঞান প্রচেষ্টা দিয়ে প্রণোদিত করতে পারা যায় তবে কাজ আরও ভালো হবে। এইটে না হওয়ার জন্যেই ভারতের ইতিহাসে কতকগুলো অনর্থক বিপর্যয় ঘটেছে।

ভারতে সংহতি-সমন্বয় যে সজীব-সক্রিয় নয় তার একটা প্রমাণ এখানকার তিনটি ধারার শিক্ষা-পদ্ধতি। প্রতীচ্য দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-নিকেতনের রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানের স্বাতন্ত্র্য-পার্থক্য থাকলেও-একটা সাধারণ ঐক্যধারা ওগুলোর সর্বত্র অন্তঃশীল হয়ে থাকে। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বস্তুবিজ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ক্রিয়াশীল। এর এই বিজ্ঞান-মনস্কতার মূলে আছে গ্রিক ও হিব্রু সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ঐতিহ্য। ওদেশগুলোতে যে শিক্ষার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে বিভিন্নতা নেই তা নয়, তবে সে ভেদ ভারতীয় শিক্ষাধারার পার্থক্যের মতো নয়।

আধুনিক ভারতে তিনটি শিক্ষাধারা পাশাপাশি চলে : একটি প্রাচীন, একটি মধ্যযুগীয়, আর একটি আধুনিক। প্রাচীন-ভারতীয় বিদ্যাচর্চা প্রথমটায় প্রধানত ছিল দার্শনিক-ভাবাপন্ন; পরে হয়ে দাঁড়াল ভাব-ভাবনা ধর্মী, এবং অতিরিক্ত ঐতিহ্য-নির্ভর। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অল্পসংখ্যক ছিলেন শিক্ষা-জ্ঞানের অধিকারী। তার ফলে শিক্ষা হয়ে বসল স্বাতন্ত্র্যবর্জিত। সাধারণ লোকে যে শিক্ষা কিছুই পেতেন না তা নয়; পুরাণ, কাহিনী, গুরুপুরোহিত-সাধুসন্তদের কথকতা ও উপদেশ-পরামর্শের মধ্যে দিয়ে যেটুকু জুটত। কিন্তু সে অতি সামান্য। এতে সমাজ দুটো বিপরীত ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার একদিকে ছিলেন সুশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা, অন্যদিকে অগণিত অশিক্ষিত নরনারী। এহেন সমাজ যে গতানুগতিক বাঁধাপথে চলবে সে আর বিচিত্র কী।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসকরা ভারতে আরব-পারস্যের শিক্ষাধারা কিছুটা প্রবর্তন করেছিলেন। মুসলিম ধর্ম প্রথম দিকে ছিল বৈপ্লবিক ও গণতন্ত্রী। এর ফলে এর দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল গণতান্ত্রিকতা, কিন্তু সে ছিল শুধু ঐ-চিন্তায়, বাস্তবে এ শিক্ষাও ছিল অল্পসংখ্যক লোকের ভেতর আবদ্ধ। জন্ম ও জাতির বাধা অবশ্য এখানে ছিল না, কিন্তু শিক্ষার কালপর্ব ছিল এত দীর্ঘ, আর পাঠ্যবিষয় এত কঠিন যে, বিশেষ অনুরাগী লোক ছাড়া আর কেউ তাতে লেগে থাকতে পারত না। প্রাচীন যুগের শিক্ষাধারার মতো এ ধারাটিও হয়ে গেল গোঁড়া ও মামুলী। আরও দুঃখের বিষয় হল এই যে, ভারতীয় ধারার সঙ্গে এর কোনও যোগ রইল না; বরং প্রায় তার বিপরীত রীতিতে চলতে লাগল এই মধ্যযুগীয় ধারাটি। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাধারা দুটি যদি মাঝে-মাঝে মিলতে পারত তবে এদের গোঁড়ামি অনেকখানি যেত কমে। কিন্তু তা তো হয় নি। ধারা দুটি সমান্তরাল দুটি রেখার মতো পাশাপাশি থেকেছে, কিন্তু মিলতে পারে নি কখনই।

তারপর এলো ইংরেজ-আমল; সঙ্গে সঙ্গে এলো ইংরেজিশিক্ষা-ধারা। কিন্তু এর পরও বিভিন্ন শিক্ষাধারায় এল না মিলন। এতে কেবল আর-একটা ধারা বাড়ল এই মাত্র। কি শিক্ষার নীতি-নিয়ম, কি তার বাস্তব প্রয়োগ-সব ক্ষেত্রেই এই ইউরোপীয় শিক্ষাধারা সকলের জন্যেই শিক্ষার সুযোগ-পথ খুলে দিল। এই ব্যবস্থায় জাতিধর্মের ভেদ স্বীকৃত হল না। বরং কোন-কোনও উপেক্ষিত শ্রেণীই প্রথমে এই নীতির সুযোগ নিল। এই শিক্ষাধারায় ছিল বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচারশীলতার স্থান। তার ফলে ভারতের শিক্ষাধারায় এক নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হল; জীবনে এলো নতুন চেতনার জোয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের ভেতর উদ্‌দীপ্ত হল সত্যাসত্য-নির্ধারণের ইচ্ছা-চেষ্টা। কিন্তু

www.pathagar.com

এতেও থেকে গেল একটা দোষ। এতে আবার প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে একটা জাতীয় শিক্ষাধারা গড়ে তোলার কোনও চেষ্টাই হল না।

কিন্তু একই দেশে বাস করে বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ের মানুষ কি একেবারে ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকতে পারে?–না। কাছাকাছি পাশাপাশি থাকার ফলে তাদের মধ্যে সংস্পর্শ সংযোগ না ঘটেই পারে না। টিকে–থাকার, বেঁচে থাকার দাবিতে হিন্দু–মুসলমানে বোঝাপড়া করতেই হয়েছে। মধ্যযুগের গোড়ার দিকেই অনেকক্ষেত্রে মিলিত হতে হয়েছিল তাঁদের। শহরে–নগরে, রাজদরবারে মেলা–মেশার ফলে এবং বৈষয়িক উন্নতির আশায় আচার–ব্যবহারে এল কিছু কিছু সাম্য। পল্লীতে গ্রামে চৈতন্য, নানক, রামানন্দ প্রভৃতির মতো মহাপুরুষদের, তথা ধর্মপ্রচারক, কবি ও সংগীতশিল্পীদের প্রচেষ্টায় হিন্দুদের শুধু আপনাদের নিয়ে থাকার ভাব অনেকখানি গেল কেটে; ফলে হিন্দু মুসলমানের ব্যবধান নিশ্চয় কমল। মুসলিম সম্প্রদায়ের কবীর, চিস্‌তি এবং নিজামুদ্দিনও হিন্দু–মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষাধারার কিছু কিছু চুয়ে পড়ে মিশেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে, কিন্তু মিশ্রণের ফলে এদের বৈশিষ্ট্য গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। ইংরেজরা এদেশে আসার পর এই রকম যোগাযোগ নতুন করে ঘটেছে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে প্রাচীন রীতিপ্রথা কিছু কিছু বদলাতে শুরু হয়েছিল সত্যি, কিন্তু এখানেও সমন্বয়টা হয়েছিল জীবনযাত্রায়, বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে নয়।

ভাবাবেগ, অনুভূতি ও জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এইরকম সন্নিহিতির দাম যথেষ্ট। একে সংহতি–সমন্বয়ও বলা যেতে পারে। কিন্তু এ সমন্বয় পূর্ণাঙ্গ নয়, নয় দৃঢ়ভিত্তিক। সচেতন প্রচেষ্টা এবং বিচারশীল মন না থাকলে তা হতে পারে না। যে কোনও রকমের জৈব প্রেরণায় যে দোষ–ত্রুটি থাকে এতেও তা–ই। এমনি আর এক প্রেরণার ধাক্কায় এ বেটাল–বেসামাল হয়ে পড়ে।

৫

শিক্ষার এই ত্রিধারা প্রায় একশো বছর ধরে পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু এই ধারা তিনটি মিলে একটি পূর্ণসমগ্র রূপ হয়ে ওঠার জন্যে যে আন্তঃসঞ্চারণ দরকার তা হয়নি। প্রথম ধারাটির ভাষামাধ্যম সংস্কৃত, দ্বিতীয় অর্থাৎ মুসলিম ভাবধারাটির বাহন আরবি ও ফারসি, আর তৃতীয়টির হল ইংরেজি। ফইজি এবং দারা, অথবা পরবর্তী যুগের রাজা রামমোহনের মতো অন্যসাধারণ ব্যক্তিরা ছাড়া সে যুগের চিন্তাশীল লোকেরা এই ধারা তিনটির ভেতর সমন্বয় আনবার চেষ্টা করেননি। মুষ্টিমেয় জনকয়েক হিন্দু রাজনীতিক–অর্থনীতিক কারণে আরবি–ফারসি শিখেছিলেন বটে, তবে তাঁদের আবার সংস্কৃত শিক্ষা হতে পারেনি। মাত্র দু চারজন মুসলমানই সংস্কৃত শিখেছিলেন। ভারতে ইংরেজ–আগমনের পর থেকে প্রথমে হিন্দুরা বেশি করে ইংরেজি শিখতে লাগলেন, পরে মুসলমানরাও, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তিনটে ধারার এক–একটায় শিক্ষা নিতেন। টোল আর মক্তবগুলো যেন আলাদা–আলাদা রাজ্য হয়ে রইল! ইংরেজি–শিক্ষার্থীদের সে–রাজ্যে প্রবেশ যেন নিষিদ্ধ ছিল। ভারতের বর্তমান সমাজ–জীবনের অনেক অবাঞ্ছনীয় অংশেরই কারণ শিক্ষার তিনটি ধারাকে অমিশ্রণীয় করে রাখা। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁদের শিক্ষাদর্শরীতি হচ্ছে প্রাচীন ধারার। কিন্তু প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এ শিক্ষাধারার কাল গেছে ফুরিয়ে। আর এক দল আছেন যাঁরা আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হলেও সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য তথা আধুনিক পাশ্চাত্য ধারা বিষয়ে একেবারে

www.pathagar.com

অজ্ঞ। এদিকে আবার এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাহলে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় বা এই জাতীয় উচ্চ শিক্ষানিকেতনগুলোও প্রাচীন ভারতের মুনি,ঋষি, জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত, ভাবুক, সন্ত, মোহান্ত, কবি, শিল্পী, এমন কি অনেক সাধারণ নরনারী ধর্ম, নীতি ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যে সব শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা গ্রহণ করতে পারে নি।

যেসব নরনারী একই ভৌগোলিক বাতাবরণের মধ্যে বাস করে তাদের সম্পূর্ণ তফাত করে রাখা যায় না। তাই শিক্ষা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ ভাব-অনুভবের, আবেগ-আচরণের ক্ষেত্রে এসে মিলেছে। আমাদের চিন্তাবুদ্ধি আর ভাব-অনুভবের মধ্যে মিলন-সংহতি না ঘটায় ব্যক্তির মানসলোকে ঘটেছে অপ্রতিহত বিচ্ছেদ বিভাগ। তাই অনেকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা বুদ্ধি নিয়ে নিলেও মন থেকে প্রাচীন ভারতীয় ভাবাবেগ আর অভ্যাসের লুতাতন্তু ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না। তাই মনের মধ্যে আধুনিকতম ভাবধারার সঙ্গে প্রাচীন রীতির ভাব-ব্যবহার থাকে টিকে। এ ব্যাপারকে ব্যতিক্রম বা বিভ্রান্তি বলে উপেক্ষা করা যায় না, কেননা, এর সংখ্যা কম নয়। এ কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, এই তিনটি ধারা অপ্রোত থাকায় ভারতের অধিকাংশ নর-নারীর মানস-জীবন হয় ক্ষীণ ও পঙ্গু।

একটি সমগ্র-পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাধারার অভাবেই ভারতের সমাজজীবনে দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এবং ভাষাভিত্তিক আত্মকেন্দ্রিকতা। অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্য-সম্পদ নিয়ে গড়ে তুলেছে একটি সাধারণ সমগ্র শিক্ষাধারা। ভারতে এমনটি হতে পারে নি বলেই এখানে নানা খণ্ডতার জন্যে সমাজ জীবনে ঐক্য-সংহতির অভাব ঘটেছে।

৬

উচ্চশিক্ষার সুযোগ অল্পসংখ্যক লোকদের প্রাপ্য করে রাখায় সমাজে আর একটা অবাঞ্ছনীয় কুফল হয়েছে। সমাজ যে দুটো বিপরীত ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এতে সমাজের বিকাশটা হয়েছে বে-আড়া-বেঢপ রকমের। উচ্চশিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের অবজ্ঞা করতে শিখেছেন; তার সঙ্গে শিখেছেন ছোটখাট কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তিকর্মকে অবজ্ঞা করতে। এখন উচ্চশিক্ষার দ্বার যদিও খুলেছে অনেকের জন্যেই, তবু শ্রমবহুল কাজের ওপর সেই পুরনো অবজ্ঞা-উপেক্ষার মনোভাব এখনও যায় নি। বরং এখন আর একটা জিনিস দেখা দিয়েছে : সেটা হচ্ছে নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে পার্থক্য। মধ্যযুগ পর্যন্ত পার্থক্যটা ছিল সামান্যই, ছিল পরিমিত। কিন্তু এখন তা এত বড় হয়ে উঠছে যে, দুটোর ভেতর মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। গ্রামবাসীরা এখনও সেই অতীতের পরিবেশেই জীবন কাটাচ্ছেন। শহরগুলো বিশ শতকের ভাবগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে। তাছাড়া, যাঁরাই আধুনিক শিক্ষা পাচ্ছেন তাঁরাই শহরমুখো হয়ে পড়ছেন। শহরবাসীদের মনে গ্রামবাসীদের ওপর কেমন একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব এসেছে। এর জন্যেও তফাতটা বেড়েই চলেছে। এতে জাতির সমাজজীবনে ভেদ-ভাগ ঘটে সংহতি নষ্ট হচ্ছে বৈকি।

গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের রীতির এই ব্যবধান সরিয়ে ফেলার বিরাট আয়োজন চলছে। সামাজিক শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে তার কিছু কথা বলা হয়েছে। একটা বিশেষ বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। সেটা হচ্ছে এই যে, এখনও অবধি উচ্চশিক্ষা নিকেতনগুলো নগরেই স্থাপিত হয়েছে। এতে গ্রামের লোকেরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর, সবচেয়ে খারাপ ফলটা হয়েছে এই যে, গ্রামের যোগ্যতম সর্বাপেক্ষা উদ্যমী ব্যক্তিরা গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে

www.pathagar.com

বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা শহরে উচ্চশিক্ষার জন্যে এসেছেন তাঁরা আর প্রায়ই গাঁয়ে ফিরে যাননি। শহরে-নগরে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো থাকায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে শুধু সেখানকার সমস্যাগুলোর ওপর, গ্রামীণ সমস্যার দিকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরেনি। অথচ সমস্যা গ্রামেই বেশি, আর লোক বাস করে পাড়া-গাঁয়েই বেশি। তাই এখন উচ্চশিক্ষার আয়তনগুলো পল্লী অঞ্চলে গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি পড়েছে, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করারও চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ যে কী বা কেমন হবে তার কথা স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কেবল গ্রাম্য পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেই যে তা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে তা নয়; ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রামীণ সমস্যার ওপর বেশি নজর দেয়া হয় বলেও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার স্তরে বিশেষভাবে বিবেচ্য গ্রামীণ বিষয়গুলো যে কী হবে তাও নির্ধারণ করা সহজ নয়। উচ্চশিক্ষার একটা প্রধান লক্ষণ এই দেখা যায় যে, এ প্রায়ই ভাবতত্ত্ব-ধর্মী এবং সাধারণ শিক্ষা হয়ে থাকে। আসল লক্ষ্যটা রাখতে হবে এই দিকে যে, গ্রামের বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী তরুণদের যেন গ্রাম ছেড়ে শহরমুখে ধাওয়া না করতে হয়। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনও ঠিকমতো হওয়া চাই, তার ওপরেও শিক্ষার্থীদের ওদিকে আকৃষ্ট হওয়া নির্ভর করবে অনেকখানি। গ্রামীণ মানুষদের উচ্চশিক্ষা সমস্যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও সমাধানের জন্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির যে মত প্রকাশিত হয়েছিল তা এই যে, গ্রাম ও শহর অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে কোনও পার্থক্য থাকার প্রয়োজন নেই। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, পল্লী-অঞ্চলের কতকগুলো বিশেষ-বিশেষ সমস্যা আছে; নগরের শিক্ষাব্যবস্থায় সে বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া হয়নি। পল্লী অঞ্চলের এই অসুবিধা দূর করার জন্যে, আর সেখানকার তরুণদের যাতে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখো হতে না হয় তারও জন্যে এই কমিটি কতকগুলো গ্রামীণ শিক্ষানিকেতন খোলার নির্দেশ-পরামর্শ দিয়েছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর এখানে তিন বছরের পড়া পড়তে হবে। তাতে সেখানকার পাঠমান এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রথম উপাধি-পরীক্ষার মানের সমান হবে। এখনকার কলেজগুলোর চেয়ে এই শিক্ষানিকেতনগুলোর যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা থাকবে আপন আপন পরিবেশ-অনুসারে শিক্ষনীয় বিষয়ের নির্বাচনে। কয়েকবছর এইভাবে কাজ করার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যদি সার্থক হতে হয়, তবে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা ধারায় মেশানো আরেকটি পূর্ণাঙ্গ সমগ্র শিক্ষাধারা তৈরি ও পঠন-পাঠন-ব্যবস্থা করে মানুষের সমগ্র দৃষ্টি ও জাতীয়তার মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।

বহুবিচিত্র উৎস হতে উৎসারিত হয়ে ভারতের সংস্কৃতি উঠেছে গড়ে। সেই সব উৎসের পরিচয় জ্ঞান না থাকলে এই সংস্কৃতির প্রাণশক্তির বৈচিত্র্য এবং মূল্যও বুঝে-ওঠা যাবে না। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী হবে?-হবে সংস্কৃতির ভাণ্ডার এবং প্রগতির অগ্রদূত। তা যদি হতে হয় তো তাদের এমন সব পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করতে হবে যাতে ভারতীয় জীবনধারার বৈচিত্র্য হয় প্রকাশিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে মিলনতীর্থ-প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিক্ষা জ্ঞানের সঙ্গে একালের বিদেশাগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মিলনের স্থান। এই আদর্শ রীতি গ্রহণ করবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পারবে বৈচিত্র্যের ভেতর ঐক্যস্থাপন করতে, পারবে মানুষের সেই কল্পনার বিস্তার ও মানসিক ঔদার্য আনতে যা ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, স্বাতন্ত্র, সাম্য ও মৈত্রীর লক্ষ্যে উপনয়নের জন্যে প্রয়োজনীয়।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদর্শন : এডওয়ার্ড শিল্‌স-এর ভাবনা

মোজাফ্‌ফর আহমদ

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে শিবনারায়ণ রায়ের লেখা 'বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রামের এক সাহিত্য সম্মেলনে তাঁরই রেশ ধরে আমি নিজেও এ সম্পর্কে এক নিবন্ধ উপস্থাপন করেছিলাম যেটি পরবর্তীকালে মাসিক মোহাম্মদী-র এক বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। তখন থেকেই এডওয়ার্ড শিল্‌সের (জন্ম : ১৯১০) নামের সঙ্গে পরিচয়, তখন তিনি ভারতীয় প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকার বিশ্লেষণ নিয়ে নিবন্ধ লিখে বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন। পরে যখন ষাটের দশকের শুরুতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তখন তিনি তাঁর জ্ঞানানুশীলনের শীর্ষে এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন নামে দুটি বিভিন্ন ডিসিপ্লিন নিয়ে সেমিনারভিত্তিক স্নাতকোত্তর গবেষণা কার্যক্রম চালাচ্ছেন। ১৯৬২ সালে তাঁরই চেষ্টায় মিনার্ভা নামে পত্রিকাও বের হয় এবং ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল চেইঞ্জ পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন। ১৯৯৫ সালের ২৩ জানুয়ারি ৮৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

৮৪ বছরের ৬০ বছর তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেই তাঁর জীবন। তিনি অজস্র লিখেছেন, তবে ১৯৭২-এ প্রকাশিত সেন্টার অ্যান্ড পেরিফেরি এবং এসেজ ইন মাইক্রোসোশিওলজি, ১৯৮০-তে প্রকাশিত দি কলিংস অব সোশিওলজি অ্যান্ড দি পারসুইট অব লারনিং বিশেষভাবে সমাদৃত। ১৯৮০-তে যখন বইটি বের হয় তখন বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। ১৯৭৯ সালে যখন ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট অব হিউম্যানিটিজ তাঁকে অষ্টম জেফারসন লেকচারার নিযুক্ত করে, তখন তিনি ওয়াশিংটন, শিকাগো ও অস্টিনে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য ও অধিকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ সম্পর্ক নিয়ে যে জ্ঞানগর্ভ উপস্থাপনা করেন সেগুলো আজো সবিশেষ সমাদৃত। তিনি ১৯৯৫ সালে জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা নিয়ে শেষ লেখা লেখেন যেটি ১৯৯২ সালে লিখিত একুশ শতকে জ্ঞানের বিস্তার ও সামাজিক দায়িত্বের ধারায় উত্তরণ। এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা এবং বর্তমান সমাজে তার সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা নিয়েও আলোচনা করেছেন। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না বিশ্ববিদ্যালয় ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত একাডেমিক কর্মজীবিতা ছিল তাঁর চিন্তাচেতনা, বিবেচনা ও আলোচনার মূল কেন্দ্রে। এর একটি কারণ সম্ভবত তাঁর ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে একাত্মতা। তিনি উইলিয়াম ফন হামবোল্টের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ধারণাকে গ্রহণ করে আমেরিকার উচ্চশিক্ষালয়ের বিবর্তনের মুখে তাকে শাণিত ও পরিশীলিত করেছেন এবং এর প্রেরণায় তিনি ষাটের দশকে যখন আমেরিকার বিখ্যাত

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো (বার্কলে, কলম্বিয়া, হাভার্ড, মিশিগান ইত্যাদি) নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপে শঙ্কিত ও কিছুটা হলেও বিধ্বস্ত তখন তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নীতিবিষয়ক পরামর্শক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভূমিকাকে সংরক্ষণ করতে সহায়তা করেছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর শঙ্কা কখনোই কাটে নি আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক ঝোঁকের কারণে। সে কারণে তাঁরই নেতৃত্বে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন দি ফিউচার অব দি ইউনিভার্সিটি গঠিত হয় এবং আমৃত্যু তিনি এর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বর্তমানে যে বই নিয়ে আজও আলোচনা চলছে, সেই দি কলিং অব এডুকেশন প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৭ সালের শেষে এডওয়ার্ড শিল্‌সের অগ্রন্থিত কয়েকটি লেখাকে নিয়ে, যার মূলসুর অবশ্য 'দি ক্রাইটেরিয়া অব একাডেমিক অ্যাপয়েনমেন্ট', 'ডু উই স্টিল নিড একাডেমিক ফ্রিডম', 'গভর্নমেন্ট, সোসাইটি অ্যান্ড দি ইউনিভার্সিটিজ ইন দেয়ার রেসিপ্রোক্যাল রাইট্‌স অ্যান্ড ডিউটিজ', 'দি আইডিয়া অব দি ইউনিভার্সিটি: অবষ্ট্যাক্‌ল্‌স্ অ্যান্ড অপরচুনিটিজ ইন কনটেমপোরারি সোসাইটি' এবং 'দি মডার্ণ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড লিবারাল ডেমোক্রাসি' শীর্ষক প্রবন্ধগুলো। ২৮৭ পৃষ্ঠায় তিনি অনেক জটিল প্রশ্ন তুলেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর যে প্রতীতি সেটি সুসংবদ্ধ করে তুলেছেন। বলা হয়, এডওয়ার্ড শিল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝতেন একজন সুদক্ষ সিম্ফোনি কন্ডাকটারের মতো। সিম্ফোনিতে প্রতিটি মন্ত্রীর দক্ষতা ও বিভিন্ন যন্ত্রের সম্মিলন একে সুন্দর ও সৃজনশীল করে তোলে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সত্যসন্ধানী জ্ঞানানুরাগী শিক্ষক ও গবেষণা পৃথক ও যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ করে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি নিয়োগ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিকভাবে বিচার্য। এখানে যেকোনো ঘাটতি বিশ্ববিদ্যালয়কে তার ভূমিকা পালনে বাধার সৃষ্টি করবে। এজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মীর একটি নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে আর এই দায়বদ্ধতার কারণেই গবেষণা ও শিক্ষাদান পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত এবং এখানে কোনো ঘাটতি সামাজিক ও পেশাগত দায়বদ্ধতাকে বিঘ্নিত করে। এরই আলোকে তিনি একাডেমিকের স্বাধীনতা, সমাজসম্পর্ক, সরকারের ভূমিকা–এ সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করেছেন। আজ বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সঙ্কট সেটিকে বুঝতে হলে এবং তার সমাধান খুঁজতে হলে এডওয়ার্ড শিল্‌সের ধারণাগুলো সবিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। তিনি তাঁর লেখায় একথা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন যে, দর্শন ও লক্ষ্যের অস্বচ্ছতা ও একাডেমিক বিষয়ে কোথাও কোনো দুর্বল সমঝোতা সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে তার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী এবং সামগ্রিকতায় বিশ্বাসী শিল্‌স কিছু বিচ্ছিন্ন সেন্টারস অব এক্সেলেন্স সম্পর্কে শঙ্কান্বিত। তিনি একাডেমিকের জ্ঞানভিত্তিক সাহসের প্রবক্তা এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ নেতৃত্বে বিশ্বাস এবং এখানেই তিনি সততা ও নৈতিকতার ভূমিকা দেখতে পান।

তিনি ত্রয়োদশ শতক থেকে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন এবং তা থেকে তাঁর ধারণা যে, বিশ্ববিদ্যালয় উদারপন্থী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্যে গড়ে উঠেনি বরং অনেক সময়ই প্রতিকূল পরিবেশে সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হয়েছে। এর মূলে রয়েছে সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানসাধকের মুক্তিচিন্তার দ্রোহ; এজন্য সরকার বা বাইরের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এটি সত্য যে চার্চ, পরাক্রমশালী রাজা, রাজতন্ত্রী সরকার, বাণিজ্যনির্ভর রাষ্ট্রীয় দর্প, শক্তিশালী নগররাষ্ট্র অনেক সময়ই তাদের নিজেদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিতোষণা দিয়েছে এবং

www.pathagar.com

আমেরিকায় হাভার্ড, ইয়েল বা প্রিন্সটনের স্থাপনা হয়েছিল যখন উদারপন্থী দর্শন শিক্ষা ও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছে। তা সত্ত্বেও এটিও সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবপূর্ব যুগে উদারপন্থী গণতন্ত্রের ধারণা বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল না এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব ছিল যাজক বা রাজকর্মীর সৃষ্ট ঔপনিবেশিক সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনায় সাহায্য করা। এখানে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার লেশমাত্র ছিল না। স্বাধীনতা উত্তর যুক্তরাষ্ট্রেও শিক্ষার ধরন ছিল যুক্তরাজ্যের মতো, বিশেষ করে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যেখানে নৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সভ্যতার ইতিহাসের প্রাধান্য ছিল। প্রথম লিবারেল দর্শনের ভিত্তিতে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি তার দার্শনিক ছিলেন থমাস জেফারসন আর সে বিশ্ববিদ্যালয়টি হল ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যদিকে একথাও সত্য, উদারপন্থী দার্শনিকদের চিন্তাচেতনায় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উচ্চ ধারণার অভাব ছিল এবং সংশয়বাদী উদারপন্থী দার্শনিকরা সমাজ বিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন। তকভিল বা কনষ্ট্যান্ট তো বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনাই করেননি। এমন কি এডাম স্মিথেরও বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কেও উচ্চ ধারণা ছিল না। জন স্টুয়ার্ট মিলের ক্ষেত্রেও তা সত্য, যদিও ফন হামবোল্টের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা তাঁর অবিদিত ছিল না। কেবল জার্মানিতেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি ভিন্নতর ধারণা ছিল, সেখানে সংস্কৃতমনা মুক্তচিন্তাশীল দৃঢ়চরিত্রের ব্যক্তিদের সমষ্টি হিসেবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা করা হয়েছে, যদিও এজন্য উদারপন্থী সমাজের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে চিহ্নিত হয়নি। চিন্তার স্বাধীনতার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে দৃঢ়চিত্ত সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির সৃজনে কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চায় উদারপন্থী সমাজের প্রয়োজনীয়তা তখন উপলব্ধি হয়নি। উইলিয়াম ফন হামবোল্ট বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার আলোচনায় প্রথমে সংস্কৃতমনা মুক্তচিন্তার ব্যক্তির উপস্থিতির ঊর্ধ্বে গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার ঐক্য, একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষাদানের বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্বাধীনতা এ সমস্ত উদারপন্থী চিন্তার অবতারণা করেন, তবে তাঁর আলোচনাতেও সংস্কৃতিবান নাগরিক ও রাজকর্মী ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায় না। উদারপন্থী চিন্তার আরেকটি বিকাশ ঘটে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনায় যেটি জেরেমি বেনথামের দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল লর্ড ব্রাওহাম ও জর্জ গ্রোটের ধারণায়, মধ্যবিত্তের উন্নয়ন ও লালনের চিন্তা ছিল উচ্চকিত এবং এখানেই প্রথম আধুনিক জ্ঞানের সব বিষয়ে অধ্যয়ন ও চর্চার সুযোগ সন্নিবেশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনায়ও পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত লালন ও উন্নয়নের চিন্তা কার্যকর ছিল কিন্তু আধুনিক জ্ঞানের সার্বিক চর্চার সুযোগ এখানে সৃষ্টি করা হয়নি। এবং ঢাকায় লন্ডনের একাডেমিক রেজিষ্ট্রার হার্টগের যোগদান কাকতালীয়ও মনে হয় না। স্মরণীয় যে, ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদারপন্থী দর্শনের ধারক।

উদারপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজ হলো বহুধাভিত্তিক সামাজিক আদর্শের প্রতিফলন যেখানে কোনো একটি গোষ্ঠীর প্রাধান্য ঘটলে তা যথাযথভাবে সম্ভব হয় না। সে কারণে ব্রাসেলস, আমস্টারডাম, মিলানে প্রায় সমসাময়িক বিশ্ববিদ্যালয়ে উদারপন্থী চিন্তার ভিত খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় ধারণা করা হয় যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুক্তচিন্তা ও একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু জার্মানির সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ইংল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমেরিকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যেগুলো বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর দ্বারা আজো পরিচালিত, সেখানে

www.pathagar.com

সামাজিক ও একাডেমিক স্বাধীনতা তুলনামূলকভাবে সীমিত এবং অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী মতাদর্শের কারণে যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করে না। জার্মানির উচ্চশিক্ষালয়ের উদারপন্থী প্রভাব ফরাসি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিকের তুলনামূলক কম যেটি এমিল জোলার বিখ্যাত গ্রন্থ J'accuse -এ বিধৃত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে একাডেমিকের সামাজিক অধিকার অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হয়েছে, ইহুদি ও রোমান ক্যাথলিক পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুক্তচিন্তার বিকাশ সীমিত হয়েছে তার আলোচনা করেছেন শিল্‌স। অবশ্য স্মরণীয় ১৯১৫ সালে স্থাপিত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান একাডেমিক স্বাধীনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে যার ফলে কোর্সের অধিক বিষয়ের বিস্তার ও বিভিন্নতা ঘটেছে, নৈর্বাচনিক বিষয়ের সুযোগ বেড়েছে এবং আমেরিকান সরকারের বিভিন্ন রকমের তদন্তের বেড়াজাল ও অনুদানের শর্ত থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে উদারপন্থী চিন্তাধারার বিকাশে একাডেমিক সমাজ তাদের অবস্থানকে মুক্তচিন্তার চর্চার মাধ্যমে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। এ কথাও এডওয়ার্ড শিল্‌স স্মরণ করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে একাডেমিকদের সামাজিক অধিকারও অনেক সময় বিঘ্নিত হয়েছে এবং এগুলো ঘটেছে তখনই যখন যুক্তরাষ্ট্রে উদারপন্থী গণতন্ত্রের ধারায় রাজনৈতিক আঘাত এসেছে। তবে স্মরণযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষালয়ে আধ্যাত্মিক দিকটি সবসময়েই সমন্বিত হয়েছে এবং ব্যবহারিক যৌক্তিকতার সন্ধান ও উদারপন্থী দর্শনের প্রভাব এই অধ্যাত্মবাদের চর্চাকে প্রভাবিত করেছে। এর ভিত্তি অবশ্য বেন্থামের বিখ্যাত উচ্চারণ–অনুসন্ধান, সত্যের পক্ষে সুতীব্র উচ্চারণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিয়ম–রীতি প্রণয়ন সম্পর্কে সজ্ঞানতা সৃষ্টি করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে যৌক্তিক করে তুলতে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার, কেননা তাঁরাই যুক্তিসহ জনসমর্থন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় দর্শনকে জনারণ্যে প্রসারণের জন্য কাজ করতে পারেন। এর বিপরীত ছিল আর্থ–সামাজিক প্রশ্নে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রভাব যা জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশ শতকে প্রাধান্য বিস্তার করছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ও জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে উদার গণতান্ত্রিক চিন্তাধারারই প্রাধান্য ছিল। এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিকেরা সামাজিক বিষয়ে তথ্যভিত্তিক প্রামাণিক কর্মের ভিত্তিতে জনমতকে আলোকিত করে জ্ঞানচর্চাভিত্তিক আলোকিত পথকে বেছে নিয়েছিলেন। স্মরণীয় যে, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রসারের অনেক আগেই এবং সে সময়ের প্রেক্ষিতে যখন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের চাকুরি রাজনৈতিক পরিতোষণার অধীন ছিল বলে এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল গৌণ। উল্লেখ্য, ইউরোপীয় দেশে এমনটি ছিল না।

উদারপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হলে তার স্বায়ত্তশাসন একটি আবশ্যকীয় শর্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ব–শাসন অবশ্য একটি পুরোনো ঐতিহ্য কিন্তু স্ব–অর্থায়নের সীমিত অবস্থান অনেক সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্ব–শাসনকেও বিঘ্নিত করেছে। শুধু তাই নয়, গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থান চিন্তাও তাদের একাডেমিক পাঠক্রমকে অনেক সময় পরিবেশের কর্মভিত্তিক অবস্থানগত মতকে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতে বাধ্য করেছে। এ সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখেই শিল্‌স তাঁর প্রবন্ধাবলিতে বিভিন্ন সুসম্পর্কিত বিষয়াবলির অবতারণা করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে যার মধ্যে সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানের সুসংবদ্ধ আবিষ্কার ও প্রসারণের মাধ্যমে ছাত্র–শিক্ষকের বোধ জাগ্রত করা প্রধান ও অন্যতম। সত্যকে চিহ্নিত করতে শঙ্কা, পর্যালোচনার আগ্রহ এবং মূল্যবোধকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষিত

www.pathagar.com

করতে সাহস ও সংকল্পের সৃষ্টি জ্ঞানের অনুশীলনের প্রয়োজনীয় আবহ সৃষ্টি করে। সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানের অন্বেষা উদ্দশ্যহীন অথবা সীমাবদ্ধ কোনো উদ্যোগ নয়। অর্থবহ হয় না। সত্যের যে মহিমা ও মূল্য আছে তাতে অন্তত বিশ্বাস যার আছে এবং যে প্রতিষ্ঠানের কর্মে তা অন্তর্নিহিত হয় সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভিত্তি সম্পর্কেই প্রকৃত অর্থে অনবহিত। এডওয়ার্ড শিল্‌সের একাডেমিক মূল্যবোধের আলোচনা সত্যানুসন্ধান, সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানের অন্বেষা ও লালন, আবিষ্কারের অধিকার ও দায়িত্ব এ সমস্তকে নিয়েই। এজন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পক্ষপাতহীন অন্বেষা, সত্যের পুনর্নিরীক্ষা যার ফলে আপেক্ষিক, ব্যক্তিক ও বৈশ্বিক সত্যকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়ে উঠে এবং প্রত্যয়দৃঢ় মনোবল নিয়ে সত্যসন্ধানের মানসিকতার সৃষ্টি হয়। সত্যের অন্বেষায় মত ও পথের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু তা থেকে সত্যের আপেক্ষিকতার ধারণা অবান্তর, সত্য সামাজিক অবস্থান বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নির্ভর নয়। তবুও সত্যের সন্ধানে পর্যবেক্ষণ ও পরিশীলিত পর্যালোচনার প্রাসঙ্গিক দুর্বলতা সাময়িক ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে আর সে কারণেই ক্রমাগত পুনর্নিরীক্ষা সত্যাসত্যসন্ধানের অঙ্গ। শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষণের মধ্যে যদি এ মানসিকতার পরিচয় না ফুটে উঠে তাহলে একাডেমিক কর্মজীবীর প্রকৃত পরিচয় শিল্‌স অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, যারা শিক্ষকতাকে তাঁর জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন যদি তার জন্য এই নৈতিক অঙ্গীকার তার না থাকে তবে তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগ্য ব্যক্তি নন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য সেটি একটি অমার্জনীয় ঘাটতি। অনেক সময় তাদের রাজনৈতিক মতবাদ এবং সমাজ সম্পর্কে একদর্শী দায়িত্ববোধ যদি সত্য সন্ধানের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজ সংস্কারের জন্য আন্দোলনকারীর সঙ্গে তার কোনো ভেদ থাকে না। যাদের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পেশাজীবী সৃষ্টি করার প্রতিষ্ঠান (যেমন প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, আইনবিদ, প্রশাসক) তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌল ধারণা সম্পর্কেই অজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল নিয়মাবদ্ধ কাজ করবার জন্য সৃষ্ট নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সম্পর্ক জ্ঞানের মৌল বিবেচনা ও জ্ঞান প্রসারণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বিপ্লবের সূতিকাগৃহ হলেও পৃথিবীতে অনেক মৌল পরিবর্তনের ধারণার প্রাথমিক সোপান সৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকেলও, এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌল কর্ম নয় বরং এগুলো তার সত্য সন্ধান ও জ্ঞানের অন্বেষার পরোক্ষ ফল। সুতরাং রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দলীয় ক্ষমতায়ন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ ও প্রশাসনকে বিঘ্নিত করে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কর্মে বিচ্যুতি ঘটে, যা স্বাধীনতা–উত্তর বাংলাদেশে আমরা বেদনাদায়কভাবে লক্ষ্য করেছি এবং এখনও করছি।

পৃথিবীর সর্বত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ বেড়েছে। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। জ্ঞানের নতুন নতুন অনুসন্ধানী ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। জ্ঞানান্বেষণে মৌলক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকার মিথষ্ক্রিয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিক্ষণের প্রাযুক্তিক বিকাশের মাধ্যমে পরিবর্তন এসেছে, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার দক্ষতার দাবিও উঠেছে, এছাড়াও রাজনীতির সঙ্গে একাডেমিকদের যোগাযোগও আগের চেয়ে বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবসার সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সে কারণে জনসাধারণের বিবেচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতিকালে আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার ব্যয় প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিক–উভয় খাতেই বেড়েছে। ফলে উদারপন্থী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নতুন নতুন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। শিক্ষকরা শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার বাইরে অনেক কর্মে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে একাডেমিক সাধনা ও জ্ঞানচর্চা আজ প্রশ্নের মুখোমুখি। সেজন্য শিল্‌স মনে করেছেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক

www.pathagar.com

হতে চান তাদের উচিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে উচ্চকিত করে বিকশিত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যারা পরিচালনা করেন তাদের কর্তব্য হবে সহজ সমঝোতার পথ পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌল ভূমিকাকে সমুন্নত রাখা। সমাজ ও সভ্যতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান ও নীতির ধারক ও বাহক হিসেবেই ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অভিভাবকত্বকেই আয়বর্ধক বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত শিক্ষকমণ্ডলী কখনো উপেক্ষা ও কখনো কলুষিত করেছেন–এ প্রশ্নের উত্তর সত্যসন্ধ হিসেবে না দিলে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করে অবক্ষয়ের পথকেই বেছে নেওয়া হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুস্পষ্ট দ্বিধামুক্ত উদ্দেশ্যযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগের প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ক্লাসে পাঠদান তার মৌল কাজের একটি মাত্র অংশ। পুস্তকের বিষয় ব্যক্তিক সাধনা ও গবেষণায় ঋদ্ধ না হলে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে কোনো পার্থক্য থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মৌল কাজ হলো জ্ঞানের চর্চা এবং জ্ঞানকে নতুনভাবে উপলব্ধি করা, বিচার করা, পরিচর্যা করা। গবেষণা তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের জন্য অবশ্যকরণীয় কাজ, কারণ এছাড়া জ্ঞানের মর্মে পৌছাবার কোনো বিকল্প নেই। গবেষণার সঙ্গে শিক্ষণের যোগাযোগ অনেক সময় স্থির ও প্রথাগত পাঠ অসুবিধার সৃষ্টি করে। সেজন্য কোনো বিষয়ের প্রাথমিক পরিচয় হতে হবে দ্রুত ও স্পষ্ট কিন্তু মাধ্যমে ও উচ্চতর পর্যায়ে পাঠদানের প্রকৃতি হতে হবে নবপরিচর্যার বিকাশের সাথে যুক্ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণভাবে অপরিবর্তনীয় পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাপদ্ধতি জ্ঞানবিকাশ ও জ্ঞানের পরিচর্যাকে যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিল্‌স অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, একাডেমিক নৈতিকতা হলো জ্ঞান ও সত্যের পরিচর্যায় শিক্ষকের নিয়ত অঙ্গীকারের অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা তাই কেবল জীবিকার্জনের পেশা নয়, বাজারনির্দিষ্ট বেতনক্রমের সুখবদ্ধ প্রকাশ নয়, এটি এমন একটি অঙ্গীকারের প্রকাশ যেখানে সমাজ ও সভ্যতার সত্যসন্ধানের দাবি তার শিক্ষকের মানসিকতায় এবং জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান পরিচর্যায় বিকশিত এবং এ পরিচর্যার প্রকৃতি এমন যে জ্ঞানের বর্তমান পরিসীমাকে বিস্তৃত করাতেই প্রাথমিক তৃপ্তি পাওয়া যায়। এ কারণে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন মত ও মননের ভারসাম্য সৃষ্টিরও প্রয়োজন। কারণ অমন মিথস্ক্রিয়ায় জ্ঞানচর্চায় গভীরতা আসে, জ্ঞানের মৌল বিষয়ে নতুন দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি হয়। আমাদের নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও নিজ বিভাগের স্নাতক নিয়োগের যে প্রক্রিয়া দলীয়করণের সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে তার ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে সিম্ফোনিক আবহ সৃষ্টি আমাদের বিবেচনায় বিশেষ স্থান পায় না। অথচ এই মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টিই ছিল উদারপন্থী গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্ব–শাসনের মূল যুক্তি। ঐ স্ব–শাসন জ্ঞানচর্চায় মৌল বিষয়ে নতুন অনুসন্ধান সৃষ্টির স্বাধীনতাকে সংশয় ও দ্বিধামুক্ত করে। শিক্ষকের বা প্রতিষ্ঠানের স্বৈরাচার থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিকে, ছাত্রকে, শিক্ষককে যা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করতে সহায়ক হয়, সভ্যতাও সমৃদ্ধ হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে পেয়েছি অধিকার হিসেবে কিন্তু এর জন্য যে দায়বদ্ধতা তা যে পালন করিনি সেকথা আমাদের স্মরণে কতোটুকু থাকে সেটি অবশ্য বিচার্য। দায়বদ্ধতাবিহীন একাডেমিকের স্বায়ত্তশাসন জ্ঞান ও সমাজকে বঞ্চিত করে, বিকৃত করে। আমাদের বর্তমানে যে অবক্ষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান তাতে জ্ঞানচর্চার আদর্শিক অবস্থার কতোটুকু অবদান সম্ভব হয়েছে সে বিচার আমাদের করতেই হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্রুপদ ঐতিহ্য ধরে রাখলে সামষ্টিকভাবে একাডেমিক আবহ তৈরি করতে হয়, ধরে রাখতেও হয়। এই আবহ সৃষ্টিতে ঔদাসিন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সংকট

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে। শিল্‌সের ধারণা,বিশাল সংখ্যক ছাত্র পরিবেষ্টিত কেবল শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের যে বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে প্রয়োজনীয় একাডেমিক আবহ সৃষ্টি ও তার লালন বাধাগ্রস্ত হয়। স্মরণযোগ্য, শিল্‌স শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন কাটিয়েছেন যেখানে এখনো ছাত্রসংখ্যা নয় হাজারের নিচে এবং এর কলেজ পর্যায়ের ছাত্রসংখ্যা তিন হাজারের নিচে। একাডেমিক আবহ সৃষ্টিতে আকারভিত্তিক নেতিবাচক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ছাত্র–শিক্ষকের উন্নতি নৈতিক অঙ্গীকার ধরে রাখা সম্ভব হয় না। যদিও মূল কথা হলো শিক্ষকদের মধ্যে সময়ক্ষেপণকারী ও দায়িত্ব উপেক্ষাকারীর সংখ্যা সমস্ত বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বেশি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের সঙ্গে এ অভিজ্ঞতা তো আমাদেরও অবিদিত নেই। অবশ্য এই বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল রাখতে কিছু কিছু অত্যুজ্জ্বল একাডেমিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বরণীয় কিছু শিক্ষককে রাখা হয়, কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনায় সেটি তেমন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এ কারণে যে সমস্ত একাডেমিক সে অর্জনের জন্য সম্মানিত তারা মূল একাডেমিক নৈতিকতা মেনেই তাদের কার্যক্রম চালিত করেন। এটি অবশ্যই সত্য যে কোনো একসময়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল একাডেমিক সমান মানের শিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম করেন না, সে জন্যই তো শ্রদ্ধেয় জ্ঞানতাপসের স্মৃতি বহুদিন ছাত্র মনে রাখে। তবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মানগ্রাহ্য শিক্ষণ ও গবেষণা থেকে বিরত থাকেন এবং যতো বেশি ছাত্রকে শিক্ষায় অনুৎসাহী মনে করেন সে সব বিশ্ববিদ্যালয়েই একাডেমিক আবহ দ্রুত অপসারিত হয়। শিল্‌সের এ কথা আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষকদের ভিতরে যোগ্যতা, শৃঙ্খলা ও শিক্ষায় নিবেদিত অবস্থানের যে ঘাটতি তার ফলে অমনোযোগ, দায়িত্বহীনতা ও দায়বদ্ধতার জন্ম এবং যেটি স্ব–শাসন ও দলীয়করণ থেকে প্রতিরক্ষিত না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের যথাযথ সুরক্ষা হয় না। ফলে অদক্ষ ও অনুজ্জীবিত সনদপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা বাড়লেও আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে সেটি সমাধানের চেয়ে সমস্যার আবর্তই সৃষ্টি করে। ছাত্রের যেমন পূর্বস্তরের সনদ থাকলেই উচ্চশিক্ষার যোগ্যতা অর্জন হয় না তেমনই শিক্ষকেরও কেবল ডিগ্রি থাকলেই যোগ্যতা ও শিক্ষায় নিবেদিত অবস্থানের প্রমাণ হয় না। সে জন্য ছাত্রকে যেমন প্রতিনিয়ত সাধনার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে উন্নত করতে হয়, শিক্ষককেও সে সাধনারই উচ্চতর প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিযুক্ত করতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও নতুনের সম্পর্কের অভিজ্ঞান, সামাজিক দাবির সাথে যুক্তিনির্ভর সংহতি প্রকাশ ও ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সংহতি। শিক্ষকের আত্মনিরীক্ষার এই প্রয়োজন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ প্রথাগতভাবেই অনুপস্থিত। এই মূল্যবোধকে ধরে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতিনিয়ত নবায়ন করতে হয়। তাতে প্রশাসন বদলায়, পাঠক্রম বদলায়, শিক্ষকের গুচ্ছরূপ বদলায়, পাঠদানের পরিবেশ বদলায়। এ নবায়ন প্রক্রিয়ায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যথার্থ অর্থে অনুপস্থিত। ফলে নতুনের সন্ধানে বুদ্ধিবৃত্তিক যে পরিচর্যা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করে তার ঘাটতি আজ প্রকট।

বৃহদায়তনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিল্‌সের বিবেচনায় সেবাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ ঘটেছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রকর্মী, যাজককর্মী, সমাজসেবাকর্মী, রাজনৈতিককর্মী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী অথবা পেশাজীবীকর্মীর সৃষ্টি করে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন–নির্দিষ্ট কোর্সের সমাহার ঘটায় এবং শিক্ষার সমন্বিত রূপটিকে বিভাজিত করে। শিক্ষকেরা পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে যতোটা উৎসাহিত, ততোটাই জ্ঞানচর্চায় পরাঙ্মুখ। অর্থায়নের ব্যাপারে এসব বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তিভিত্তিক কাজ

www.pathagar.com

করে। সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম চালু করে এর প্রয়োজন মিটিয়ে ভালোই করেছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা যে সংস্কৃতি মন ও মননের আঁতুড়ঘর সেদিকের সঙ্গে এদের কখনোই পরিচয় ঘটে না। শিক্ষকরা চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন। ছাত্ররা সংক্ষিপ্তসার জ্ঞানের চুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করেন তাদের প্রয়োজনের নিরীখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজসম্পর্ক ও জ্ঞানের ব্যবহারিক দিককে অস্বীকার করার অবকাশ নেই কিন্তু জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধির সিসটেমিক আচরণকে ভুলে গেলে এটি জ্ঞানবিকাশের মৌল ক্ষেত্রের অপরিচিত জ্ঞান প্রসারণকেই উৎসবিহীন করে দেয়। জ্ঞানের যারা ব্যবহার করবেন তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু তাৎক্ষণিক যদি জ্ঞানান্বেষণকে সীমিত করে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তার স্থবিরতাকেই ডেকে আনবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আজ জ্ঞানঋদ্ধ কর্মীর যে প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়কে সে চাহিদা মেটাতে হবে তার মৌলশিক্ষার বিস্তৃত পরিধির পরিসরেই। সুনির্দিষ্ট কর্মভিত্তিক চাহিদা মৌলকর্মের সংযোজন হতে পারে কিন্তু মৌল উদ্দেশ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় যেন বিচ্যুত না হয়। সমাজের চাহিদা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন উদাসীন থাকতে পারে না তেমনি জ্ঞানের দীর্ঘকালীন সম্ভাবনাকেও বিশ্ববিদ্যালয় অনগ্রাধিকার দিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় তার সামাজিক দায়িত্বের স্বীকৃতি শিক্ষাসম্পর্কিত কিন্তু পাঠক্রম-বহির্ভূত সহশিক্ষা কর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিক ও সামাজিক অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেও তার দায়িত্ব পালনের পরিচয় দিয়ে থাকে। এর বিস্তৃতি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কর্মকে বিঘ্নিত করে তবে শঙ্কিত হতেই হয়।

শিল্‌স রাজনৈতিক বা কোনো বিশেষ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। চার্চ বা সরকার অতীতে শিক্ষক ও ছাত্রের আনুগত্য দাবি করেছেন, সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত সরকারি অনুদাননির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে না এবং এর অনেক নিয়োগেই সরকারি রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। সরকার অতীতে অনেক শিক্ষককে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর্মত্যাগে বাধ্য করেছেন। আমাদের দেশেও এমনটি ঘটেছে। যদি বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তজ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র হয় তাহলে নাগরিক আনুগত্য ও জ্ঞানের প্রতি আনুগত্য সমার্থক না হলে এমিকাস কিউরি হিসেবে কাজ করার মতো সামাজিক আস্থা অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ কেবল তাদের প্রতিভা, কর্মস্পৃহা ও নিবেদিত কর্মের ঔজ্জ্বল্যেই অর্জন করতে পারেন কিন্তু বিবৃতিবাজ বিভক্ত শিক্ষকসমাজের রাজনৈতিক পরিচয় এতে বাধার সৃষ্টি করে। এরই প্রেক্ষিতে শিল্‌সের ভাষায় মুক্তবুদ্ধির বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ ঘটেছিল সে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যেগুলো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উন্মুক্ত আলোচনায় তাদের অবস্থান তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য শিল্‌স স্বীকার করেছেন এটি করতে নির্লোভ ও জ্ঞানঋদ্ধ যে মনীষার সমাহার প্রয়োজন হয় তাকে টিকিয়ে রাখতে নিরন্তর সামাজিক সমর্থন উদারপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজেও পাওয়া দুস্কর হয়ে উঠে। সমাজ-সরকার-রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জটিল সমীকরণ অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্যকর্মকে বিঘ্নিত করেছে। শিল্‌স যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন ও জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে এটাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। শিল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রায়নে সবচেয়ে শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলাতান্ত্রিকায়নের অবশ্যম্ভাবিতা আলোচনা করেছেন। কিন্তু জার্মানিতেই স্ব-শাসনই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের মূল প্রকৃতি ছিল যেখানে যথার্থভাবে নিযুক্ত খ্যাতনামা অধ্যাপকরা প্রশাসনিক দায়িত্ব স্বল্পকাল পালন করেও তাদের একাডেমিয়ার প্রতি সমর্থন ও জ্ঞানের চর্চাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত রূপ ও

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সংস্পর্শ এই ঐতিহ্যকে অনেকাংশে বিঘ্নিত করেছে। সব আমলাতন্ত্রের অন্তজ প্রকৃতির মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলাতন্ত্রও প্রসারিত হয়ে উদারপন্থী গণতন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিতে একটি ভিন্নতর মাত্রা যোগ করেছে যেটি একাডেমিক নৈতিকতাকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করেনি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যাকে শিল্‌স বলেছেন 'নৈতিকভিত্তিক নড়বড়ে হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান'।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণ খুঁজতে শিল্‌স ফিরে গেছেন শিক্ষকের দায়বদ্ধতার কাছেই, কারণ শিক্ষকেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরিচিতি নির্দিষ্ট করেন। এর দায়বদ্ধতার প্রথমেই তিনি তুলে ধরেছেন সত্যসন্ধ জ্ঞানান্বেষণের প্রতি শিক্ষকের অন্তজ দায়বদ্ধতা। এখানে শিক্ষকের যেকোনো ঘাটতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমানুবর্তনে সমৃদ্ধি আনে না। জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে শিক্ষণ ও গবেষণায় যে শিক্ষক কোনো মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে ছাত্র ও সহকর্মীর উজ্জীবন ঘটাতে ব্যর্থ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গর্ব বা সম্পদ হতে পারেন না। সে জন্য শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি কঠোর পরিশ্রম, ন্যায়ানুরাগ সিদ্ধান্ত, আত্মশৃঙ্খলা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিজেকে নিরত করার নিষ্ঠা। যিনি এ থেকে বিচ্যুৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজে তার অবস্থান অনিশ্চিত করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। সেজন্য স্থায়ী নিয়োগ সম্পর্কে শিল্‌স প্রশ্ন তুলেছেন, যদিও তিনি জানেন যে নিয়োগের স্থায়িত্ব ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই সত্যসন্ধ জ্ঞানের অন্বেষণ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যাবস্থাতেই তাঁর সমর্থন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কেবল গবেষণার ক্ষেত্র নয় যদিও যুক্তরাষ্ট্রে মৌল গবেষণা কেবল উদারনীতি ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়েই বিকাশ ঘটেছে। শিক্ষাদান অর্থাৎ জ্ঞানের সঞ্চালন ও সঞ্চারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌল কর্ম। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য শিক্ষণ ও গবেষণার সমন্বয়ের প্রয়োজন। ক্লাসে পাঠদান কেবল একটি সুসংহত তত্ত্ব ও তথ্যের সম্পর্কে জ্ঞানদান নয়। উপরন্তু পাঠদানের মৌল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রের মনে বিষয় সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও উৎসাহ সৃষ্টি এবং সে উৎসাহ নিবৃত্তিতে জ্ঞানান্বেষার পথনির্দেশ। যে শিক্ষক তার পাঠদান পদ্ধতিতে যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ ও সৃজনশীলতায় ব্যর্থ তার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতা করার যোগ্যতা কতোটুকু রয়েছে সেটিই প্রশ্নসাপেক্ষ বলে শিল্‌স মনে করেন। শিক্ষকের নিজের বিশ্বাস ও মতামত যেন ছাত্রকে অনুকরণে ব্যাপৃত না করে এ ব্যাপারে সাবধানতা অতীব প্রয়োজন; কারণ বুদ্ধিভিত্তিক সম্ভাবনার উন্মোচনই মুখ্য, বুদ্ধিবৃত্তির তাৎক্ষণিকতা নয়। অনেক বৃহদায়তন শিক্ষণে যে যান্ত্রিকতা এসেছে সে সম্পর্কে শিল্‌স শঙ্কিত। কারণ এর ফলে ছাত্রদের দক্ষতা নির্মাণ ও জ্ঞান আহরণের স্পৃহা প্রতিবন্ধকতার নিষ্পেষণে দলিত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকের অনিয়মতান্ত্রিকতা, অনুদারতা ও অনিরপেক্ষতা তার নৈতিক অবস্থানকে ধ্বংস করে দেয়। এর বিপরীতে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ঐতিহ্যের যেমন ভূমিকা আছে একাডেমিক প্রশাসনের দক্ষতা ও নিরপেক্ষতারও তেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই ঐতিহ্যকেই শিল্‌স প্রজন্ম-পরম্পরায় জাতশিক্ষকের দায়বদ্ধতা বলে উল্লেখ করেছেন এবং এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে শিক্ষক নির্বাচনকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন শিল্‌স। কারণ তার মাধ্যমে নবীন ও প্রবীণের যথাযথ সমন্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তির নানা দৃষ্টিকোণের বিচার-সমৃদ্ধ মুক্তবুদ্ধির শক্ত ভিত রচনা হয়। যেটি বিভাগ, অনুষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রসরমান রেখে তার পরিবর্তনশীলতাকে সমৃদ্ধ করে। শিল্‌সের ভাষায় বিভাগ ও অনুষদের মাইক্রোকজম এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রফেশনের ম্যাক্রোকজম দুটোই যথারীতি সমন্বয় সাধন করতে হবে। বিভাগ বা অনুষদের বিভাজিত ও ক্ষুদ্রবিবেচনায় নির্দিষ্ট অবস্থান এমন সুযোগ সৃষ্টি করে না,

www.pathagar.com

এই প্রেক্ষিতে সহকর্মীদের দায়বদ্ধতার বিবেচনা প্রয়োজন। সহকর্মীদের সম্পর্ক যদিও বিভাগের মধ্যেই অধিক বিকশিত, সমন্বিত ও সঞ্চারিত তবুও জ্ঞানের অনুসন্ধান ও সমৃদ্ধির জন্য মতান্তর ও মিথস্ক্রিয়া বিভাগে ও বিভাগান্তরে যদি সম্ভব না হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট এমন ভাবতে শিল্‌স দ্বিধা করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষণ ও গবেষণার ঐতিহ্যই হলো অধীত বিষয়ের ধারাকে পরীক্ষণ করে যথার্থ ও বিশেষকে নিশ্চয়করণ এবং জ্ঞানের ধারার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়েও অভিহিত হওয়া। সে কারণে মতামত ও তত্ত্বেও বহুমাত্রিকতা একাডেমিক উৎকর্ষের জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন ধারার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মতোই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে একাডেমিকের সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রাথমিক মাধ্যম হলো শিক্ষণ ও গবেষণা, কারণ তারই মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে জ্ঞানের ঐতিহ্য লালিত হয়, জ্ঞানের প্রসার অবধারিত হয় এবং অন্য যে কোনো কর্ম-তা সমাজসেবা হোক, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মই হোক-এখানে গৌণ। শিল্‌স তাই বিশ্বাস রাখেন অনুসন্ধিৎসা ও নিরীক্ষাতে, যৌক্তিক তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক বিচারে, পরস্পর সমৃদ্ধকারী মতবিনিময়ে ও মিথস্ক্রিয়ায় এবং বহুধারার তত্ত্ব ও তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত মতামতের সহাবস্থানে।

এ সমস্ত কিছুই বিঘ্নসঙ্কুল। সবাই শিল্‌সের এ মতের সঙ্গে একমত হবেন তাও নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ আলোচনা সহজে কোথাও মেলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষকের এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যারা ভাবেন, যারা সিদ্ধান্ত দেন তাদের জন্য তাঁর বইগুলো অবশ্য পাঠ্য। 'দি কলিং অব এডুকেশন' বইটি স্টিভেন গ্রসবি সম্পাদনা করেছেন, জেমস এপষ্টেইন তার মুখবন্ধ লিখেছেন। দুটোই সুপাঠ্য। আমি বইটি পড়তে পড়তে শিল্‌সের দৃষ্টির বিস্তার ও সূক্ষ্মতায় মুগ্ধ হয়েছি এবং নতুন করে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক চত্বরে তাঁর সাহচর্য ও জ্ঞানঋদ্ধ আলোচনাকে স্মরণ করেছি।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ড ও গন্তব্য

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যালয় কোন দিকে যাচ্ছে ও যাবে এটা একটা জরুরী প্রশ্ন বটে–বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের জন্য তো বটেই, সমাজের জন্যও। সমাজের জন্যই বেশি দরকারী এটা জানা যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্তব্যটা কি, কেননা প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঠিক সেই নির্দিষ্ট অর্থেই, যে অর্থে মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী; দ্বিতীয়ত, সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনেক কিছু আশা করে, প্রত্যাশা রাখে নেতৃত্বদানের, পথপ্রদর্শনেরও।

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় নানা দিকে প্রসারিত এবং বিভিন্ন নিরিখে উন্নত হয়েছে; কিন্তু যে প্রশ্ন থেকেই যায় সেটা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্তব্যটি কোন দিকে ছিল, এবং এখনো রয়েছে। যাবার কথা তার সমাজের দিকে; গেছেও বটে, কিন্তু কতটা, কি ভাবে? সে–জিজ্ঞাসাটি বিবেচনার আগে উন্নতির ব্যাপারটার দিকে একবার তাকানো যাক।

স্থানের দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা সংকুচিত হয়েছে বৈকি। কিছু জায়গা সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ছেড়ে দিয়েছে। গাছপালাও সেই আগের মতো নেই। কিন্তু আবার প্রসার ঘটেছে নানাদিক থেকে। ১৯২১ সালের সূচনালগ্নে এর ছাত্রসংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে ৮৭৭ জন, এখনকার সংখ্যা ২৮ হাজার। সেদিন ছাত্রী ছিল মাত্র ১ জন, এখন ২৮ হাজারের ভেতর ঠিক অর্ধেক না হলেও শতকরা ৪০ জনই ছাত্রী। প্রথম চারটি সমাবর্তনে দেখি বক্তারা শুধু 'জেন্টেলমেন'দেরকেই সম্বোধন করছেন, যার তাৎপর্য এই যে, অনুষ্ঠানে কোনো মহিলাই উপস্থিত ছিলেন না, সনদ নেবার জন্য তো নয়ই, এমনকি দর্শক হিসাবেও নয়। এবারকার সমাবর্তনে সনদ নেবার জন্য নিবন্ধনকৃতদের সংখ্যা ছিল মোট ৮,০৬৯ জন, তার মধ্যে ৩,৩৮৩ জন ছিলেন মহিলা। শুরু হয়েছিল ৬০ জন শিক্ষক নিয়ে, শিক্ষকদের বর্তমান সংখ্যা এক হাজার চারশত। ১৯২১ এ শিক্ষকদের ভেতর একজনও মহিলা ছিলেন না, এখন মহিলাদের সংখ্যা শতকরা ৩০ জন। সূচনায় অনুষদ ছিল তিনটি, এখন অনুষদের সংখ্যা দশ। সঙ্গে আছে নয়টি ইনস্টিটিউট এবং দু'ডজনেরও বেশি গবেষণা কেন্দ্র। তখন ছাত্রাবাস ছিল তিনটি, এখন সেখানে পাওয়া যাচ্ছে সতেরটি, যার মধ্যে চারটি মেয়েদের। তেয়াত্তর বছরের সময়কালে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিকাশকে সামান্য বলা যাবে না।

www.pathagar.com

তবে বিকাশ মানেই যে উন্নতি এমনটা বলার কোনো উপায় নেই। তা উন্নতি মাপবার নিরিখগুলো কি? বিকাশ ও প্রসার যে একটি নিরিখ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানদণ্ড আরো আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রধান ক্ষেত্রটি হলো জ্ঞানের অনুশীলন, অর্থাৎ আহরণ, সৃজন ও বিতরণ। জ্ঞানের বিতরণটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্ববিদ্যালয় আর যাই হোক জ্ঞানের গুদামঘর নয়, তেমনটা হলে তা গুদামঘরই থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় হয় না। জ্ঞানের বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কেবল ব্যক্তিগত অর্জন দেখলে চলবে না, দেখতে হবে সমষ্টিগত অর্জন কতটুকু। কয়েকজন অত্যন্ত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি পাওয়া গেলো, বাদবাকিরা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়, এমন অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোটেই গৌরবের ব্যাপার নয়। উন্নতিটা কেবল খাড়াখাড়ি হবে না, হবে আড়াআড়িও; জ্ঞান একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে এবং ছড়িয়ে পড়বে। পাহাড়পর্বতের প্রয়োজন আছে, কিন্তু নদী আরো বেশী উপকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজটা হওয়া চাই প্রবহমান, সৃষ্টিশীল, উর্বরতাদায়ক। এর তৎপরতা যেমন চলবে গবেষকের নির্জন কক্ষে, তেমনি ক্লাশরুমে, ল্যাবরেটরিতে, আলাপ-আলোচনায়, বিতর্ক সভায় এবং অতিঅবশ্যি প্রকাশনায়।

এখানে মেরুদণ্ডের প্রসঙ্গটি আসে। জ্ঞান বলি, বুদ্ধি বলি, মেরুদণ্ড না থাকলে মানুষ তো মানুষই নয়। তাই দেখতে হবে জ্ঞান মেরুদণ্ডকে শক্ত করছে, নাকি দুর্বল করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমরা মানবসম্পদ চাই না, মানুষ চাই; সম্পদ অন্যের কাজে লাগে, মানুষ অত্যাবশ্যক, ব্যক্তির নিজের জন্য; যে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, ভর করে চার পায়ে, তাকে বনমানুষ বলা হয় তো বা যাবে কিন্তু মানুষ বলা কঠিন হবে। জ্ঞান যেন পিঠের বোঝা না হয়, সে যেন কাত বা নত করে না দেয় জ্ঞানীকে, তার জন্য মেরুদণ্ড সোজা রাখা চাই।

শিরদাঁড়া শক্ত করবার জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আবশ্যক। কোনো কাজই একাকী করা সম্ভব নয়, যেতে হয় অন্যের কাছে। কিন্তু কিভাবে যাবো? ভৃত্যের মতো, নাকি প্রভুর মতো? ওই দু'টির কোনোটিই নয়, যেতে হবে বন্ধুর মতো-এটাই হচ্ছে সৃষ্টিশীলতার জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করা। যে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, একাকী থাকে, থাকতে পছন্দ করে তার পক্ষে মেরুদণ্ড ঋজু রাখা সম্ভব নয়। মেরুদণ্ড অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা চায়, নইলে কাবু হয়ে পড়ে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঘটনাটা সত্য।

জ্ঞানের চর্চা দরকার মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই। অন্যভাষায় জ্ঞানের অনুশীলন অসম্ভব নয়, কিন্তু সেই জ্ঞান না হবে গভীর, না পুষ্টিকর। এক সময় ছিল যখন ধ্রুপদী ভাষার বাইরে জ্ঞানের চর্চা ছিল অসম্ভব। সেই কালটা অন্ধকারের, তাকে বলা হয় মধ্যযুগীয়। আধুনিক যুগের সূত্রপাতের পদধ্বনিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মাতৃভাষার চর্চা। পৃথিবীতে এখন এমন দেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন যে দেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও সভ্য বলে দাবী করে, কিন্তু মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিতে অপারগ। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাভাষা আন্দোলন থেকে যাত্রা শুরু করে; এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, এবং অবশ্যই এর স্বাভাবিক অঙ্গীকার ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জ্ঞানানুশীলনের। যে কাজটি আমরা করতে পারি নি। সেটা যে আমাদের জন্য কত বড় ব্যর্থতা আমরা তা অনুধাবন করি না। ভাগ্যিস করি না, করলে বড়ই অস্থির থাকতাম; কাজ, দায়িত্ব ও অসন্তোষ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেতো। স্বাধীনতার পর মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জ্ঞানানুশীলনে অতিসামান্য উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম, কিন্তু অচিরেই সেখান থেকে আমরা যে 'সসম্মানে' পশ্চাদপসরণ করলাম সে-তৎপরতা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ডকে শক্ত করে নি, দুর্বল করেই রেখে

www.pathagar.com

দিয়েছে। মাতৃভাষার চর্চা ব্রিটিশ আমলে তেমন ছিল না, আশা ছিল পাকিস্তান আমলে হবে; পাকিস্তান আমলে হলো না, আমরা ভরসা করলাম বাংলাদেশ আমলে হবে, তখনও যখন হলো না তখন প্রমাণের কী আর অপেক্ষা রাখে যে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের চর্চা করছে ঠিকই, তার অর্জনগুলো যে সামান্য তাও নয়, কিন্তু নিজের পায়ে সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। আমরা গন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইছি, কিন্তু চলার আগে তো ঠিক মতো দাঁড়ানো চাই; যার দাঁড়ানোটাই দুর্বল, সে চলবে কি করে? বিশ্বের দিকে চলার আগে তো সমাজের দিকে চলা দরকার।

মাতৃভাষার সঙ্গে দেশপ্রেমও অবিচ্ছিন্নরূপে জড়িত। মাতৃভাষার চর্চা দেশপ্রেম নির্দেশ করে এবং তাকে শক্তিশালী করে। যার দেশপ্রেম দৃঢ় নয় সে যে শক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমনটা ভাবা কষ্টকল্পনা বৈকি। বাংলাদেশে দেশপ্রেমের বর্তমান হাল যে কেমন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে না বুঝবার কারণ থাকে না। একটা সময় ছিল যখন আমরা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলাম; সেটা ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত বিস্তৃত; সেকালে আমাদের আদর্শবাদের ভেতর দেশপ্রেমই ছিল প্রধান উপাদান। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ওই জায়গাটিতে টান পড়েছে। ভাবটা এখন এমন যেন আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। জাতীয় মুক্তি অর্জিত হয়ে গেছে, এখন আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজেরটা দেখবো, যে যেমন ভাবে পারি সম্পদ অর্জন করবো। ধনী হবো।

এটিই হলো সাধারণ মনোভাব, বলা বাহুল্য এটি স্থায়ী হয়ে গেছে, এবং দিনে দিনে বরঞ্চ বৃদ্ধিই পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই মনোভাবের বাইরে থাকবার কথা ছিল। আশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পথ দেখাবে, নেতৃত্ব দেবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তা করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের আগে আগে চলে নি, বরঞ্চ সামাজিক যে আদর্শ তার অধীনে চলে গেছে।

১৯৪৭ এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা ছাত্র ছিলেন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সম্পর্কে সুখকর বহু স্মৃতি বহন করেন। ১৯৪৩–'৪৭ এ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত। স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখায় তিনি বলেছেন, পেছনের সেই জীবনের দিকে ফিরে তাকালে মনে হয় 'যেন রূপকথার রাজ্য পেরিয়ে এসেছি।' [সংকলিত, আমারে তুমি অশেষ করেছ, সম্পাদক– সেলিনা বাহার জামান, ঢাকা,২০০৪, পৃ. ১০৪] সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটা নিজস্ব জীবন থাকে যেটা স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও সেটা ছিল। নিজস্বতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও তৎপরতামুখরতার জন্য সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকের কাছেই যে রূপকথার রাজ্য বলে মনে হয়েছে সেটা ঠিক; কিন্তু তাই বলে ওই জীবন যে মাধ্যাকর্ষণবিহীন ছিল তা নয়, তার সঙ্গে যোগ ছিল সমাজের, সংযোগ ছিল রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার ও সংকটের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ চাইতেন শিক্ষার জগতটা আলাদা হবে, বাইরের জগৎ থেকে। একেবারে যে বিচ্ছিন্ন হবে তা নয়, সেটা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়; কেন না বিশ্ববিদ্যালয় তো কারাগার নয়, হাসপাতালও নয়, কারিগরি দক্ষতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও নয় সে। সূচনাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধারণা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে, তাতে সমাজের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের ব্যাপারটা ছিল বৈকি; কর্তৃপক্ষ ছাত্রদেরকে তাই পরিবারের প্রতি দায়িত্ব, সমাজসেবা, এমনকি দেশপ্রেমের কথাও বলতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে, তখন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ পর্যন্ত তো বটেই, সাতচল্লিশের পরেও সমাবর্তন বক্তৃতাগুলোতে দেখা যাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে

www.pathagar.com

বারবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন রাজনীতির বিষাক্ত ছোবল বাঁচিয়ে চলে। ১৯৩০ সালের সমাবর্তন বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (যিনি বাংলার গভর্নরও) বলছেন–

> A sinister attack has been made on the whole fabric of education in India. I do not propose to touch upon the question of the proper relationship of students to politics, but every thinking man must agree that an attempt to stop the whole course of education, both in schools and colleges, is a deliberate and wicked attack on the intellectual life of the coming generation. That attempt has been made, relying partly on appeals to sentiment, but mainly on intimidation, both moral and physical. But I am glad to say that in Dacca, as in Bengal generally, it has failed, mainly owing to the recognition by both guardians and students of the essential selfishness of its promoters in attempting to sacrifice the future of the nation to the immediate necessities of their propaganda. I look to both guardians and students to present the attempt being made again: it lies in their hands; if they will show clearly that they are determined not to be sacrificed, the attempt will not be renewed. (Dhaka University: The Convocation Speeches, vol. 1, compiled by Serajul Islam Choudhury, Dhaka, 1988, p. 151]

বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন উত্তপ্ত, ব্রিটিশ–বিরোধিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে, সে জন্যই এই ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য। রাজনীতিতে যোগদানে নিরুৎসাহিত করবেন বিপরীতে তথাকথিত সমাজসেবার কাজকে কিন্তু বেশ উৎসাহিত করা হয়েছে। এর কারণও পরিষ্কার। তরুণরা পড়াশোনা করবে, সেটাই হবে তাদের তপস্যা; তারা পরিবারের কথা ভাববে, ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে, সেটাই হবে তাদের লক্ষ্য; কিন্তু তার বাইরেও তরুণ মনে যে আদর্শবাদ জন্মাবে সেখানে কাজ করবে যে সামাজিক আগ্রহ ও দেশপ্রেমিক অনুপ্রেরণা তা যাতে রাজনীতির পথে পা না বাড়ায়, তরুণ যাতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, বরঞ্চ ব্যস্ত থাকে তৃণভোজী সমাজসেবা নিয়ে সেদিকে তাদের পরিচালিত করাই উদ্দেশ্য। বাংলার তখনকার গভর্নর বুলওয়ার লিটন ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষে তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার অনেকটা জুড়ে ছাত্রদেরকে সশব্দে পিঠচাপড়ে দিয়ে তিনি বলেছেন–

> In the reports on the three Halls, I was specially interested in the account given of the Social Service Leagues. This seems to me to be the most encouraging feature in the whole work of the University and shows that the fullest use is being made of the possibilities afforded by its residential character. Mention is made of night schools conducted by the students among the poor children of the district, of first-aid classes and ambulance work, of welfare work on co-operative lines, of flood relief operations, and of successful instruction in matters of public health among the surrounding villages. Service of this kind, if it is systematically organized, has consequences of the utmost value. It necessitates a serious study of

www.pathagar.com

social problems and local conditions; it provides opportunities of testing by actual practice the theories propounded in class rooms; it affords valuable training in organized team work; and it brings the University into touch with the realities of life. All this is education in the fullest and best sense. I have asked the Vice-Chancellor to give me an opportunity when I return here during the monsoon of meeting some of the members of these Social Service Leagues and discussing with them the work on which they are engaged. I would like on this occasion to appeal to them not to drop this work when they leave the University, but to form similar leagues outside and enlist the services of others in whatever neighbourhood they may find themselves. If Dacca University can found a real school of social service and send out into the world every year numbers of young men well-trained in that school to carry on its work throughout Bengal, it will do more to establish its own reputation and to earn the gratitude of future generations than by any other feature of its work. By this means it will equip its students for the kind of work which is more required at this moment than any other, and will make its beneficial influence felt throughout the Province. [ঐ, পৃ. ৪১-৪২]

পরের বছরের সমাবর্তন বক্তৃতাতেও প্রশংসার একই ধ্বনি-

All healthy-minded young men, at a certain stage of their lives, are inspired by a burning desire to devote themselves to great and noble causes; and unless it receives a natural outlet and is directed into beneficial directions, this impulse is certain to be exploited by mischief-makers. In those social service organizations, the members of which so kindly came and explained their work to me last year, you are wisely directing this impulse towards the uplift of the degraded an the enlightenment of the ignorant. I quote from one of the reports:

"The Social Service Section of the Hall has done splendid work. They carried on their work at the schools they have established at Kajirbagh with success. In addition to this, they have organized lantern lectures on sanitation for the villages, with the kind assistance of the Health Officers of the District Board and Municipality. They also interested themselves in removing the wants of the people in respect of water-supply, and have succeeded in interesting the chairman of the Local Board, who has undertaken to sink a well in the village."

The young men who are doing work of the kind referred to in this and the other reports are learning the lessons of the highest patriotism, which is to serve, and laying the firmest foundations on which to build a nation, which is self-reliance. In the literature of all countries in the past to die for

www.pathagar.com

one's country has been represented as the highest patriotism, but there is a higher which has yet to be learnt and that is to live for one's country. To give health and happiness and life to others may be to both more difficult and more honourable than to surrender one's own. [ঐ, পৃ. ৬১]

ছাত্রদের সমাজসেবামূলক ওই কাজটা ছিল খুবই সামান্য, প্রায় অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তাকেই সর্বোচ্চ দেশপ্রেম এবং জাতিগঠন প্রচেষ্টায় উভয়ের দৃষ্টান্ত হিসাবে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তুলে ধরা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, ছাত্ররা ওইসব কাজে নত হয়ে থাকুক, তাদের ভেতরে জমে ওঠা দেশাত্মবোধের বিমোক্ষণ ঘটুক, জবরদখলকারী ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার বিপজ্জনক চিন্তাকে রাখুক তারা যোজন যোজন দূরে। সমাজসেবার তো কোনো শেষ নেই, যুগযুগান্তর ধরে তা চলবে, ছাত্ররা ওই কাজে দেহ ও মন নিমগ্ন রাখুক, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার কথা তারা যেন কখনো না-ভাবে। দাস হবার দরকার নেই, ভৃত্য হলেই চলবে। সমাজসেবাতেই কেবল উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, এমনকি সমাজসংস্কারও নয়। উপদেশ দেওয়া হয়েছে ছাত্রদের দেশপ্রেম যেন তাদেরকে নিজেদের মাতৃসম বিশ্ববিদ্যালয়কে মাতার মতোই সম্মান করতে শেখায়; এ ব্যাপারে তারা যেন অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ছাত্রদের কাছ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে। এ সব কথা এসেছে ১৯৩০ ও ১৯৩১-এর বক্তৃতায়; ১৯৩৬এ রাজনীতি আরো তীব্র হয়েছে, তার প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপরও বিলক্ষণ এসে পড়েছে। আর পড়েছে যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই বছরের সমাবর্তন বক্তৃতায় প্রধান অতিথি খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকারের সতর্কবাণীতে। তিনি বলেছেন-

> At no time probably have seductive half-truths and false doctrines about society, economics and politics caused more harm than in our land in this age. We are living in a world threatened by cunningly engineered mob passions, political promise and selfish propaganda. Our unlettered and ill-educated masses form the readiest dupes of plausible orators and writers and their deceptive slogans. The true progress, and even the very life, of our society demands that those who have been blessed with a real University education, those who have acquired the garnered truths of the world's past and formed their characters in that the noblest of all brotherhoods, should repay their debt to their country and people by fighting falsehood in thought, anarchy in the social order, and passion and folly in the life of the community-regardless of unpopularity, regardless of personal loss.

কথা সেই একই। বাইরে মিথ্যার ভয়ঙ্কর ও সম্মোহনী তৎপরতা চলছে, ছাত্ররা যেন বিভ্রান্ত না হয়, তারা যেন রাজনীতিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ভুল পথে পা না বাড়ায়। ১৯৩৬-এর ওই সমাবর্তনের উপাচার্য হিসাবে বক্তৃতা দেন এ. এফ. রহমান; তিনি সরকারের প্রশংসা করে বলেন, "Your excellency's administration has been marked by firmness in combating the forces of disintegration and by vision in laying the foundations of economic prosperity of the province." (ঐ, পৃ. ২৬৫) এ রকমটাই অবশ্য বলার কথা। সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী দুষ্কৃতকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করছে এবং সেই সঙ্গে

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে, কর্তৃপক্ষের জন্য এটি চমৎকার খবর, তা সে কর্তৃপক্ষ স্বদেশী হোক কিংবা বিদেশী। বক্রাঘাত এইখানে যে, শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহীদেরই জয় হয়েছে, এবং রাষ্ট্ররক্ষাকারী ব্রিটিশ কিছুদিনের মধ্যেই পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়েছে।

রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল, সে আন্দোলনে ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িকতারও প্রবেশ ঘটেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে না থাকলেও বাইরে দাঙ্গাহাঙ্গামার বিরাম ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার ভেতরও তা চলে এসেছে, সাম্প্রদায়িকতায় উন্মত্ত লোকের হাতে একাধিক ছাত্র প্রাণ হারিয়েছেন, সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেও দিতে হয়েছে, কিন্তু তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে তা নয়, যার একটা প্রমাণ এই যে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনগুলো নিয়মিতভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাতচল্লিশে অবশ্য সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি, কেন না সে বছর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটে। আটচল্লিশে সমাবর্তন হয়েছে বছরের প্রথম দিকেই, মার্চ মাসের ২৪ তারিখে; সেই সমাবর্তনে প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, তিনি তাঁর বক্তৃতাতে পুনরায় বলেন যে, উর্দু এবং কেবল মাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রের পূর্বতন কর্তৃপক্ষের মতোই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ও স্বাধীন পাকিস্তানের কর্ণধার ছাত্রদেরকে রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে বলেন; কিন্তু নিজেই আবার ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান অপরিহার্য করে তোলেন, রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ওই ঘোষণা দানের মধ্য দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অগ্রসর অংশের পক্ষে বুঝতে কোনো অসুবিধাই রইলো না যে, রাষ্ট্রের মালিক বদলেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য স্বাধীনতা লাভের কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয় নি। বরঞ্চ দেখা গেলো আগের বুর্জোয়া শাসকেরা ভদ্রতার যে আবরণটুকু রাখতেন, নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার সেটুকুও রাখেন নি। তাঁর ভাষা অনেক বেশি রূঢ়, ভঙ্গি অধিকতর রুক্ষ। নতুন রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ড যে শক্ত হবে না তাও পরিষ্কার হয়ে গেছে ওই সমাবর্তন বক্তৃতার ভেতর দিয়ে। ব্রিটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার চর্চা ছিল সীমিত, নতুন আমলে তা যে আরো সঙ্কুচিত হয়ে যাবে তার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিল উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেবার মারাত্মক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণার ফলে। মনে হলো যে ইংরেজরা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভৃত্য বানিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, এদের মতলব তাকে গোলাম বানানো। ছাত্ররা স্বভাবতঃই প্রতিবাদ করেছে, এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন গড়ে তুলছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই।

জিন্নাহর বক্তৃতার শেষাংশে শিক্ষার্থীদের জন্য একটা পথনির্দেশ ছিল। তিনি বলেছেন, নতুন রাষ্ট্র সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তাঁর ভাষায়-

I can give you one instance. I know a young man who was in government service. Four years ago he went into a banking corporation on two hundred rupees, because he had studied the subject of banking and today he is manager in one of their farms and drawing fifteen hundred rupees a month–in just four years.' (ঐ, Vol. ii, পৃ. ২৬)

পথের নির্দেশ একটি নয়, দু'টি। প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়ন করা চাই; দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিভঙ্গিটা হওয়া চাই পুঁজিবাদী; কিভাবে উন্নতি করা যায়, আরো বেশি টাকা উপার্জন করা যায় সেটাই হওয়া দরকার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। পরামর্শের তাৎপর্যটা অপরিচ্ছন্ন নয়। নতুন প্রজন্মের (এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরও) গন্তব্য হবে ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির

www.pathagar.com

দিকে, সমাজের দিকে নয়। আগের শাসকেরা অন্তত গায়ে গতরে সমাজসেবার কথা বলতেন, নতুন শাসকেরা তাও বলছেন না। তাঁরা চাইছেন রাষ্ট্র আরো অধিক মাত্রায় পুঁজিবাদী হোক, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিজেও পুঁজিবাদী পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকুক। জিন্নাহ তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছিলেন এই কথা বলে যে, তিনি আশা করেন, 'nay, I am confident that the East Bengal youth will not fail us.' কপাল ভালো যে, পূর্ববঙ্গের যুবকেরা তাঁর আশা পূরণ করেনি।

২

রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক একটি প্রাথমিক প্রশ্ন। ঢাকাসহ এক সময়ের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারী উদ্যোগে, এবং থেকেছে তারা সরকারী নিয়ন্ত্রণে। এ ব্যাপারে সরকারের আগ্রহ স্বভাবতই ছিল অত্যধিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের লোক যাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অংশেরও যে সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ ছিল না তা নয়; কিছুটা স্বভাবে পরিণত হওয়ার দরুন, অনেকটা অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁরা সরকারকে ডেকে এনেছেন, হস্তক্ষেপের জন্য। একাত্তর সালে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্ররা স্বাধীনতার পতাকা প্রথম উত্তোলন করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই পরে দেখা গেছে শিক্ষকদের ভেতর দালালী মনোভাবাপন্ন মানুষের সংখ্যা শতকরা হিসাবে অন্য যে কোনো সরকারী আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ মানুষের তুলনায় কম তো ছিলই না, বরং বেশিই ছিল।

এমন ঘটনা ব্রিটিশ আমলে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু পাকিস্তানী আমলেও যে এমনটা ঘটেছে সেটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। আর ঘটবে যে তার ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় অগ্রযাত্রার সূচনাতেই ঘটেছে। ওই যে ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান পরবর্তী প্রথম সমাবর্তনের কথা বললাম ওটিতে উপাচার্য হিসাবে ভাষণ দেন অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, উপাচার্য ছিলেন সেকালের জাঁদরেল ব্যক্তিত্ব, অক্সফোর্ড-শিক্ষিত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক; তিনি তাঁর ভাষণে এতই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে 'জাতির পিতা' এবং 'কায়েদে আজম' তো অবশ্যই, 'আমীর-ই-পাকিস্তান' বলেও সম্বোধন করেছেন। বোঝা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ডের আঘাত করবার ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানই যে কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তা নয়, প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও এমন লোক ছিলেন যাঁরা এই আঘাত আসুক এটা কামনা করছিলেন।

কিন্তু ছাত্রদের মেরুদণ্ড বাঁকা হয় নি, গন্তব্যের ব্যাপারেও তারা বিপথগামী হয় নি। দুর্বৃত্তরা ছিল, আলবদর রাজাকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক তো বটেই ছাত্রদের ভেতরও ছিল, কিন্তু মূল ধারাটা ছিল স্বৈরাচারবিরোধী। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে চুয়ান্নর নির্বাচন, ষাটের দশকে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, উনসত্তরের অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সকল বিস্ফোরণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিল সামনে। চেতনার দিক থেকে ছাত্ররা এগিয়ে গেছে। কিন্তু রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে স্বৈরাচারী। দু'পক্ষের ভেতর সংঘর্ষ বেধেছে বারবার। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে নানা সময়ে।

রাষ্ট্রীয় সংকটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ যে স্বাভাবিক ছিল না তার অনেক প্রমাণের একটি হচ্ছে পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনগুলো নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। একান্ন, তেপ্পান্ন, ছাপ্পান্ন, তেষট্টি সালে সমাবর্তন হয় নি, চৌষট্টি সালে হয়েছে, কিন্তু তারপরে পাঁচ বছর কোনো সমাবর্তনের খবর নেই। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

স্বাধীন হবার পর সমাবর্তন আরো অনিয়মিত হয়ে পড়ে। হিসাব মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ পর্যন্ত সর্বমোট একাশিটি সমাবর্তন হওয়া উচিত ছিল, হয়েছে মাত্র বিয়াল্লিশটি, যার মধ্যে পঁচিশটির অনুষ্ঠান ঘটেছে ব্রিটিশ আমলে অর্থাৎ ১৯২৩ থেকে (যখন প্রথম সমাবর্তন হয়) ১৯৬৪ পর্যন্ত কালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকে সর্বমোট উনচল্লিশটি সমাবর্তন হারিয়ে গেছে।

রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে; শিক্ষকদের কেউ কেউ বিদেশে চলে গেছেন। এ ঘটনা সাতচল্লিশে একবার ঘটলো, যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা, যাঁরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁরা অনেকেই চলে গেলেন। ছাত্রছাত্রীদেরও একাংশ দেশত্যাগ করলো। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ জন শিক্ষক শহীদ হন; বহু ছাত্র ও কর্মচারীর নামও শহীদদের দীর্ঘ তালিকায় পাওয়া যাবে। স্বাধীনতার পরে কয়েকজন শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ডের ওপর যে আঘাতের পূর্বাভাস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে ১৯৪৮-এর সেই প্রথম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সমাবর্তনে পাওয়া গিয়েছিল, সেই আঘাত ক্রমাগত তীব্র হয়েছে। একাত্তরে ঘটেছে চূড়ান্ত ঘটনা, তার আগেও তখনকার পূর্ববঙ্গে যত আন্দোলন হয়েছে প্রত্যেকটির কারণে আঘাত পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র শহীদ হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে, কাউকে কাউকে বহিষ্কারাদেশ সহ্য করতে হয়েছে; শিক্ষকেরাও রেহাই পান নি, তাঁরাও কারাবন্দী হয়েছেন। ভয়ঙ্কর রকমের একটি আইনী হস্তক্ষেপ ঘটেছিল আইউব খানের সামরিক শাসনের পরে। ১৯৬১ সালে সামরিক অর্ডিন্যান্স জারি করে ব্রিটিশ আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটুকু স্বায়ত্তশাসন ছিল তাও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিণত করা হয় সরকারী প্রতিষ্ঠানে।

ওদিকে ভেতর থেকেও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার একটি ধারা যে তৈরি হয়েছিল সেটাও কিন্তু মর্মান্তিক সত্য। ১৯৪৮-এর ওই সমাবর্তনে উপাচার্য আত্মসমর্পণের যে সঙ্কোচহীন মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, সেটা যে তাঁর একার ছিল তা নয়, ছিল অনেকের ভেতরেই।

কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাস করতেন। ছাত্ররা তো অবশ্যই করতো। ফলে কালাকানুন-বিরোধী আন্দোলন হয়েছে। ওই আন্দোলন পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পাশাপাশি চলেছে, এবং সন্দেহ নেই যে মূল আন্দোলন থেকেই তা শক্তি সংগ্রহ করেছে। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হলো এবং দেশ যখন একটি নতুন সংবিধান পেলো, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ নামে একটি শাসনবিধি পেয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ওই গণতান্ত্রিক শাসনবিধিটি পাওয়া সম্ভব হতো না। কিন্তু রাষ্ট্রে যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে এমন নয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা দুই দুইবার স্বাধীন হয়েছি, দুইবারই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ওই অর্জন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সাতচল্লিশের পরে যেমনটা ঘটেছিল, একাত্তরের পরেও তেমনটাই ঘটলো; স্বাধীনতা এলো সামনের দরজা দিয়ে, তবে পরাধীনতাও পিছু ছাড়লো না, সেও পুনরায় এসে গেলো, পেছনের দরজা-পথে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই সেই পথ খুলে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনটা না ঘটলেও পারতো, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের তো হবার কথা অগ্রপথিক, তার তো থাকবার কথা নিজস্ব শক্ত মেরুদণ্ড। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যে ব্যতিক্রম

www.pathagar.com

হবে, তা পারলো না। যে স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছিল সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের লোকেরাই তার মূল অংশ ফেরৎ দিয়ে দিলেন সরকারের হাতে। রাষ্ট্র তো আসলে রয়ে গেছে আগের মতোই আমলাতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী, সে তো চাইবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে হাত রাখতে; কিন্তু ওই হাত-রাখাটা সম্ভব হতো না ভেতর থেকে যদি সরকারের সঙ্গে যোগসাজস না করা হতো, যদি না বড় দুই রাজনৈতিক দলের দলীয় রাজনীতিকে নিয়ে আসা হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে। নিয়ে আসবার কাজটা যাঁরা করেছেন তাঁদের অন্তর্গত উদ্দীপনাটা যে পুরোমাত্রায় মতাদর্শিক ছিল তা মোটেই নয়, আসল ব্যাপারটা ছিল পদলাভসহ বৈষয়িক সুযোগসুবিধা হস্তগত করা। রাষ্ট্র যেভাবে চলে গেছে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাও সেভাবেই আত্মসমর্পণ করেছে রাষ্ট্রের কাছে।

একথা আজ সবাই বলবেন যে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের আদর্শবাদ কার্যকর ছিল, রাষ্ট্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিবৃত্ত রাখবার যে প্রকারের চেষ্টা ছিল, আজ আর তেমনটা নেই। এর কারণ বুঝতে হলে যে গভীর কোনো সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দরকার পড়ে তা মোটেই নয়; কারণটা সহজেই চোখে পড়ে। কারণ হচ্ছে আদর্শবাদের পতন।

পাকিস্তানের কালে রাষ্ট্রকে শত্রু হিসাবে চেনা গিয়েছিল। মানুষের মনে তখন স্বায়ত্তশাসন তো অবশ্যই, স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংগ্রাম করেছে, শিক্ষকরাও সঙ্গে ছিলেন। আদর্শবাদ যাকে বলছি তার ধারা ছিল দু'টি, একটি জাতীয়তাবাদী অপরটি সমাজতান্ত্রিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভেতর দিয়েই, সেটি ছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ; পরে ওই জাতীয়তাবাদের অনুসারীদের অনেকেই মোহমুক্ত হয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের দিকে সরে এসেছেন, মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন, নতুন প্রজন্মের শিক্ষকদের ভেতর আওয়ামী লীগের সমর্থক তৈরি হয়েছে। ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে ধারাপ্রবাহ গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিতে এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে এই জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে তো আর সামনে এগোনো সম্ভব ছিল না। একদা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদীদের একাংশ তবু বাঙালী জাতীয়তাবাদী হবার একটা পথ খোলা পেয়েছিলেন, বাংলাদেশ পরবর্তী জাতীয়তাবাদীরা তেমন কোনো পথ সামনে দেখতে পেলেন না। পথ অবশ্য ছিল। সেটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, পুঁজিবাদের বিরোধিতা করা, কিন্তু সেটা তো জাতীয়তাবাদীরা করতে পারেন না, করলে তাঁরা যে ধরনের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন সেখানে থাকতে পারেন না, তাহলে তো তাঁদেরকে সমাজতন্ত্রী হতে হয়, সেটা তাঁদের জন্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ওদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিভাজন, এবং পরে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের ফলে সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণও কমে এসেছে, সারা বিশ্বেই কমেছে, তবে বাংলাদেশে কমেছে বিশেষভাবেই।

সমাজের দিকে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ তাই হ্রাস পেলো, জাতীয়তাবাদীরা থেমে গেলেন, সমাজতন্ত্রীরাও দুর্বল হয়ে এলেন। কিছুটা শূন্যতা তৈরি হলো। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের পতাকাকে উচ্চে তুলবার যে প্রণোদনা আটচল্লিশের সমাবর্তনে জিন্নাহ দিয়েছিলেন সেই পুঁজিবাদী আদর্শ তখন বিশ্বজুড়ে একাধিপত্য স্থাপন করেছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও তা প্রবল হয়ে উঠলো, সমষ্টিগত অগ্রগতি সম্ভব করবার আদর্শবাদ সঙ্কুচিত হওয়ার দরুন তৈরি শূন্যস্থান পূরণ হয়ে গেলো আত্মস্বার্থ নিমগ্নতায়। শিক্ষকেরা

www.pathagar.com

অনেকেই ঝুঁকে পড়লেন টাকা করার দিকে। অন্য পেশায় যা ঘটলো শিক্ষকতাতেও তাই দেখা দিলো; শিক্ষকতার পক্ষে ব্যতিক্রম হওয়া আর সম্ভব হলো না। সুযোগ পেলেই বিদেশে ছোটা, সম্ভব হলে সেখানে থেকে যাওয়া, সমষ্টিগত কাজ ভুলে ব্যক্তিগত কাজে মনোযোগ দেওয়া, কনসালটেন্সি খোঁজা, বিদেশীদের দেওয়া প্রজেক্ট পেলে লুফে নেওয়া–এসব রোগ অবাধে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর এলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়; সেখানে উপাচার্য হওয়া থেকে শুরু করে খণ্ডকালীন, পূর্ণকালীন ইত্যাদি শিক্ষকতার কাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই নিয়ে নিলেন, মূলত।

জাতীয়তাবাদীরা অন্তত পক্ষে মাতৃভাষার চর্চা করবেন এমনটা আশা করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার চর্চা ক্রমশ কমে এসেছে। বইপত্র প্রবন্ধ প্রকাশনাতে ইংরেজি ভাষার ওপরই জোর পড়ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো একধাপ এগিয়ে গেলো, তাদের পাঠ্যসূচীর কোথাও বাংলা ভাষার নামনিশানা পর্যন্ত রইলো না। বেসরকারী পঞ্চাশটির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে, তাদের একটির নামও বাংলা নয়। জিন্নাহ যে নবীন প্রজন্মকে উৎসাহ দিয়েছিলেন ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পাঠ নিতে, ভাগ্য যাতে খুলে যায় সেই বিশেষ প্রণোদনা তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রে যে পরিমাণ কার্যকর হয়েছিল, পাকিস্তানের পতনের পর স্বাধীন বাংলাদেশে সেটি তৎপর হয়েছে ওই–তুলনায় অনেক গুণ বেশি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্য বিষয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ব্যবসা–বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় যে থাকছেই, থাকবেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩

শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কেমন হবে সে নিয়ে বিস্তর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। মহল বিশেষ থেকে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু প্রথম দিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মুসলমান ছাত্রদের ভিড়–উপচে পড়েছিল তা কিন্তু নয়। শুরু হয়েছিল যে ৮৭৭ জন ছাত্র নিয়ে তাদের ভেতর সাকুল্যে ১৭৮ জন ছিল মুসলমান। আর শিক্ষার মান যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় হীন ছিল এটাও সত্য নয়। এখান থেকে ডিগ্রি নেওয়া স্নাতকেরা পরবর্তী জীবনে দেশেবিদেশে নানা ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠার চার বছর পরে ১৯২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়,বর্তমানে ওই ডিগ্রিপ্রাপ্তের সংখ্যা ছয়শ'তে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর দ্বিতীয় সমাবর্তনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯এ; তাতে উপাচার্যকে তাঁর ভাষণে উল্লেখ করতে শুনি যে সেই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সতেরজন বিভাগীয় প্রধানের ভেতর দশজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাবেক ছাত্র।

কিন্তু বাঙ্গালদের প্রতি কলকাতার সামাজিক উন্নাসিকতা তো ছিলই, সেটা কাটে নি। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যিক গুণের তুলনায় তাঁর পাণ্ডিত্য যে কম ছিল তেমনটা বলা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তিনি নামকরা ছাত্র; পরীক্ষার ফল ছিল ঈর্ষণীয়, কিন্তু কলকাতা শহরে শিক্ষকতা করতে গিয়ে তিনি উপযুক্ত কদর পান নি। অর্থনীতিবিদ এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সাবেক অর্থমন্ত্রী আশোক মিত্র চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, তিনি আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> মাত্র ক'দিন আগে এক বাংলা দৈনিকের রবিবাসরীয় বিভাগে 'মানুষগড়ার কারিগর' শিরোনামে এক মস্ত প্রবন্ধ ফাঁদা হয়েছিল : ... কিংবদন্তী শিক্ষকদের তালিকায়

www.pathagar.com

সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রায় অনুল্লিখিত, অনুচ্চারিত অমিয় দাশগুপ্ত মশাইয়ের নামও। সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রায় পঁচিশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন; তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকিরণও ঢাকাতেই। ১৯৪৫ সালের পর অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এসেছিলেন বছর পাঁচ-ছয়ের জন্য, তারপর শান্তি নিকেতনে, জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে বৃত হওয়া, রাজ্যসভার সদস্য। কিন্তু, হলে কী হয়, সেই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে একবার জাত খুইয়েছিলেন, তার আর পুনর্জয় করতে পারলেন না। কলকাতার বিদ্বজ্জনের কাছে তাঁর স্থান মেঘনাদ সাহার অনেকটাই নিচে। [সংকলিত, আমারে তুমি অশেষ করেছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮]

অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত সম্পর্কে অশোক মিত্রের বক্তব্য :

অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে তাঁর মত তন্নিষ্ঠ গবেষণা ইতিপূর্বে আমাদের দেশে কেউ করেন নি। তাঁর চেয়ে দক্ষতার শিক্ষকও আমি দেশে-বিদেশে কোথাও পাইনি। তাঁর বিদ্যা ও পড়ানোর উৎকর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাদপ্রতিম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দশকের পর দশক ধরে তিনি ঢাকায় প্রতিভাধর এন্তার ছাত্র তৈরি করেছেন। পরে কটকে র‍্যাভেনশ কলেজে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দিল্লীতে, একই জ্ঞানচর্চার পরম্পরা।
[ঐ, পৃ. ৯৭]

অশোক মিত্রের মতে অমিয় দাশগুপ্তের 'ললাটলিখন' ছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চাইতেও শোকাবহ।

পশ্চিম বাংলা কৃচিৎ-কদাচিৎ একজন দু'জন পণ্ডিত মানুষ ব্যতিরেকে বিশেষ তাঁর নাম উচ্চারণ করেন না। অথচ তিনি জীবনের শেষ বারো-চোদ্দো বছর একাধিক্রমে শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন, ওখানকার ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছেন, যে যখনই তাঁর কাছে জ্ঞাত্য কিছু জানবার জন্য গিয়েছেন, স্বভাবঔদার্যে সমাদরে সে-সব অনুরোধ-আবদার রক্ষা করেছেন। এমনকি শান্তি নিকেতনে থাকাকালীনই নিভৃতে নিজের মতো করে অন্তত তিনটি তত্ত্বভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেছেন; সে-সব গ্রন্থ বিদেশে প্রকাশিত ও সংবর্ধিত, কিন্তু পশ্চিম বাংলার নিথর ডোবায় তাঁর কোনো অনুকম্পন অনুভূত হয়নি। আমার একটা প্রতীতি, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির শিক্ষক আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি। [ঐ, পৃ. ৯৮]

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল একটি পুরাতন শহরে। ১৯২১ সালে ঢাকা একটি মফস্বল শহর বটে; ছোট এবং অপরিচ্ছন্ন; দিনের বেলাতেও মনে হতো সে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু শহরের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সামাজিক বিরোধ দেখা দেয় নি। ১৯০৫ সালে ঢাকাকে একটি নতুন প্রদেশের রাজধানী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল; বেশকিছু দালান-কোঠা তৈরি করা হয়েছিল, ১৯১১ তে সে উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ভবনগুলো রইলো, এবং সেগুলোতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানসঙ্কুলান হলো। শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা শহর যে খুব পিছিয়ে ছিল তা নয়, ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজে যত ছাত্র ছিল প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে সে তুলনায় ছাত্র সংখ্যা ছিল সামান্য। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে গিয়ে তাই কাউকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে হয় নি, শহরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো বেমানান প্রতিষ্ঠান ছিল তাও নয়। পরবর্তীকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময়ে ব্যাপারটা ঘটেছিল ভিন্ন রকম। সেখানে ভবন তৈরি করবার জন্য কৃষি জমি দখল করতে হয়েছে, সে জমি থেকে উৎখাত হয়ে গেছে বহু মানুষ, যারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে সরে গিয়ে বসতি স্থাপনে বাধ্য হয়েছে। ঢাকায় যা হয় নি, রাজশাহীতে তা হলো, গ্রামীণ পরিবেশে একটি

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলো, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎখাত হয়ে–যাওয়া মানুষদের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে না, প্রবেশাধিকার পায় বটে তবে পড়ার জন্য নয়, অতিসামান্য চাকরি বাকরি নিয়ে, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে রইলো স্থানীয় জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। কেবল তাই নয়, স্থানীয় মানুষ রয়ে গেলো শত্রুভাবাপন্ন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে দেখা গেছে যে, বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির মীমাংসা আর করা যায়নি; ধর্মীয়–ফ্যাসিবাদীরা এই দূরত্বটাকে নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালের বাইরে অসন্তুষ্ট এলাকাকে তারা নিজেদের আশ্রয়, বিচরণ ও সমর্থন সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসাবে খুঁজে পেয়েছে।

সাভারে যখন একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তখন কোনো কোনো মহলে এমন একটি আশা ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সেখানে হয়তো একটি জনপদ গড়ে উঠবে, সাক্ষাত পাওয়া যাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরের, যেমনটি ইউরোপের কোথাও কোথাও পাওয়া গেছে। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কোনো শহর গড়ে ওঠেনি; অপরদিকে আশেপাশের জনবসতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে তাও হয় নি। মূল কারণটা রাজনৈতিক, রাষ্ট্র চায়নি বিশ্ববিদ্যালয় জনজীবনসম্পৃক্ত হোক। ওই সম্পৃক্তির অভাব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে, রাজশাহীতে যেমন চট্টগ্রামেও তেমনি ধর্মীয়–ফ্যাসিবাদীরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জনবসতিকে নিজেদের নোংরা কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে।

শিক্ষানুশীলনের ব্যাপারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য সুবিদিত। সেটা হলো ছাত্র–শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল একটি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে। তার পেছনে চিন্তাটা ছিল এই রকমের যে, প্রত্যেকটি ছাত্রই একটি ছাত্রাবাসের সঙ্গে যুক্ত থাকবে– যারা আবাসিক তারাও, যারা অনাবাসিক তারাও। ছাত্রাবাসে থাকবে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন, যাতে ছাত্ররা অংশ নেবে, শিক্ষকরাও যোগ দেবেন। শ্রেণীকক্ষে, ল্যাবরেটরি ও গ্রন্থাগারে বিদ্যার যে অনুশীলন হবে তার পরিপূরক হয়ে দেখা দেবে আবাসিক হলের সংস্কৃতি চর্চা। শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতার পাশাপাশি ব্যবস্থা থাকবে টিউটরিয়ালের, যেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সরাসরি আলোচনা করবেন। একইভাবে ল্যাবরেটরিতেও শিক্ষকরা উপস্থিত থাকবেন ছাত্রদেরকে নির্দেশনা দিতে। বিভাগে সমিতি থাকবে, থাকবে ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ইউনিয়নও থাকবে একটি। এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নির্বাচন হবে, যার ফলে শিক্ষার্থীদের ভেতর পরিচয় বৃদ্ধি ও আদান–প্রদানের সুযোগ ঘটবে, এবং একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার সাংস্কৃতিক জীবনকে তাঁরা কতটা গুরুত্ব দিতেন। ভবতোষ দত্তের লেখা থেকে আমরা যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাতে যাকে তিনি 'রূপকথার রাজ্য' বলেছেন সে রাজ্যের একটা নৈসর্গিক নিজস্বতা ছিল তো বটেই, কিন্তু তাঁর আসল প্রাণ ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই। ভবতোষ দত্তের ওই লেখাতেই আছে :

> উদার সবুজাস্তীর্ণ মাঠে মোগলাই স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত ছড়িয়ে থাকা সেইসব সুরম্য সৌধ, মাঝে–মাঝে টলটলে বাঁধানো পুকুর, সবুজের মধ্যে গড়িয়ে–যাওয়া পীচের কালো রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে গাছ বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষীর মত। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকা শ্রেণী, আর একদিকে ছাত্রাবাস, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল। কার্জন হল, লিটন হলে বসত সান্ধ্য অনুষ্ঠান–সাহিত্যসভা অথবা নাটকের অভিনয়। আজ এতদিন পরে যখন পিছনে ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় যেন রূপকথার রাজ্য পেরিয়ে এসেছি। *[আমায় তুমি অশেষ করেছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪]*

www.pathagar.com

অশোক মিত্রের স্মৃতিকথাতেও একই রকমের বক্তব্য পাবো :

> প্রধানত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, রমনার মায়াবী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো, সময়ের গতি ঢিমেতাল, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপকদের পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় করে আনে। প্রতিটি হলে আলাদা বিনোদন-কক্ষ, যেখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বিতর্ক কিংবা বক্তৃতা, সাহিত্যসভা কিংবা সংগীতের আসর বসে। প্রতিটি হলে বার্ষিক নাট্য-উৎসব ছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে আনন্দসন্ধ্যার আয়োজন, ঢাকা-জগন্নাথ হলে একটু বেশি, সলিমুল্লাহ হলে একটু কম। [ঐ, পৃ. ৮৯]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় কেবল লেখাপড়ায় পাওয়া যায় না, পেতে হয় তার সাংস্কৃতিক জীবনেও। পাকিস্তান আসার পরে যে শাসকশ্রেণী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখলো তারা সাংস্কৃতিক কাজে মোটেই উৎসাহী ছিল না। উর্দুভাষা চাপিয়ে-দেওয়া, বাংলাভাষার সংস্কার করা, হরফ বদলানো, রবীন্দ্রনাথকে স্থানচ্যুত করা, নজরুলকে মুসলমান বানানো ইত্যাদি তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পূর্ববঙ্গের মানুষের মেরুদণ্ড দুর্বল করে দেওয়ার ইচ্ছা। অশোক মিত্র যে উল্লেখ করেছেন সাংস্কৃতিক কাজগুলো ঢাকা-জগন্নাথ হলে ছিল একটু বেশি, সলিমুল্লাহ হলে একটু কম; তাঁর সে বক্তব্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই। ঢাকা ও জগন্নাথ হল ছিল হিন্দু ছাত্রদের আবাস, সলিমুল্লাহ হল মুসলমান ছাত্রদের। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিচর্চায় হিন্দু মধ্যবিত্ত মুসলিম মধ্যবিত্তের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে ছিল বৈকি, সেই বাস্তবতাটা যেমন ছাত্রসংখ্যার হেরফেরে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি ধরা পড়েছে সংস্কৃতিচর্চায় এক পক্ষের এগিয়ে যাওয়া ও অন্য পক্ষের পিছিয়ে থাকার ভেতরও।

৪

তবু সংস্কৃতিচর্চা চলেছে বৈকি। ছেলেমেয়েরা নিরুৎসাহিতকরণ এবং নিষিদ্ধকরণের দরুন যে হতোদ্যম হয়েছে তা নয়, রাজনৈতিক কাজের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কাজ বহমান থেকেছে। তবে রাষ্ট্রের অনুগত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অনুকূল হাওয়া পেয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে নিরুৎসাহিতকরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে তার বহুবিধ উদাহরণ রয়েছে। আমার নিজের স্মৃতি থেকেও অন্তত দু'টি ঘটনা উদ্ধার করতে পারি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বছরে, অর্থাৎ বায়ান্ন সালে। পরের বছরের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে যে সংসদ নির্বাচন হয় তাতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সংসদে সদস্যপদের প্রার্থীদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আমাদের পক্ষের প্রার্থীদের পরিচয়পত্র নিয়ে নিউজ প্রিন্টে ছাপা একটি ছোট পুস্তিকা বের হয়েছিল। বলাই বাহুল্য আমরা ছিলাম সরকার-বিরোধী পক্ষের প্রার্থী। ওই পুস্তিকাটি ক্লাশ রুমে বিতরণ করা হয়েছিল। দৃশ্যটা আজও মনে পড়ে। অর্থনীতির সাবসিডিয়ারি ক্লাশ নিতেন যে শিক্ষক তিনি যখন ইংল্যান্ড থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সদ্য ফিরেছেন, এবং প্রষ্টরের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন। ক্লাশের সামনের সারি একটি বেঞ্চ থেকে আমাদের ওই প্রচার পুস্তিকাটি তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখে তিনি বললেন, 'এত পয়সা এরা পায় কোথায়? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ স্কলারশিপ পেয়ে থাকে, সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার, স্কলারশিপের টাকা যদি এইসব কাজে খরচ হয় তাহলে স্কলারশিপ বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ।' সেকালে বৃত্তিপাওয়া ছেলেরাই সাধারণত নির্বাচনে প্রার্থী হতো। প্রষ্টরের ক্রোধান্বিত ঘোষণা শুনে আমি যে বিচলিত হয়েছিলাম তা নয়, কেন না নিশ্চিত ছিলাম যে নির্বাচনে প্রার্থী হবার অপরাধে বৃত্তি কাটা যাবে এমন কোনো বিধি তিনি খুঁজে বের করতেই পারবেন না, কিন্তু তাঁর অপ্রত্যাশিত উষ্মা ও রুদ্র মূর্তি আমাকে আঘাত করেছিল।

www.pathagar.com

এবং সে ছবি যে এখনো ভুলেছি তা নয়। বায়ান্নার অব্যবহিত পরে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নানা ধরনের নিপীড়ন চালাচ্ছিল; যে ছাত্র সংসদ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রাণস্পন্দনগুলোর একটি, তাতে কাজ করতে চাওয়াটাকে অছাত্রসুলভ আচরণ বিবেচনা করবার মনোভাবটি সরকারী আচরণেরই সম্প্রসারণ বলে সেদিন আমার মনে হয়েছিল। আজও তাই মনে হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও প্রায় একই রকমের। তখন আমি আর ছাত্র নই, শিক্ষক হয়েছি। ততদিনে দেশে চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে এবং তাতে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় ইত্যাদির বাতাবরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গন বেশ সরগরম। ছাত্ররা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, শিক্ষকরাও অংশ নেন। কিন্তু সবকিছু আবার হঠাৎ করেই স্তিমিত হয়ে গেলো ১৯৫৮তে আইউব খানের সামরিকশাসন জারিতে, তবে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। ততদিনে প্রক্টরও বদল হয়েছেন, নতুন যিনি প্রক্টর তিনিও বিলেতফেরত, এবং নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত। শিক্ষকদের লাউঞ্জের এক টেবিলে একটি সাহিত্যসভার কয়েকটি আমন্ত্রণপত্র পড়ে ছিল; প্রক্টর সেখান থেকে একটি তুলে নিয়ে দেখলেন, পড়লেন, এবং উষ্মার সঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'এখনো এসব চলছে, অথরিটিকে জানাতে হবে।' মুহূর্তে সমস্ত পরিস্থিতিটা বদলে গেলো, বিশেষ করে এই জন্য যে ওই হ্যান্ডবিলটিতে বক্তাদের ভেতর অন্যদের সঙ্গে আমার নামও ছিল। সাহিত্যসভাটি অবশ্য প্রক্টরের পক্ষে থামানো সম্ভব হয়নি,কেন না সেটি আসলে আগের দিনেই হয়ে গেছে; কিন্তু আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, প্রচারপত্রটির বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েই ক্ষান্ত হবেন না, হয়তো–বা বাইরের কর্তৃপক্ষকেও জানাবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই ধরনের অবৈধ তৎপরতা চলছে।

এর পরে এসেছে একষট্টির সেই কালাকানুন যাতে ছাত্রদের স্বাধীনতা তো কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বটেই, শিক্ষকদেরও কোনো সংগঠনের সদস্য হলে, এমনকি কোথাও কোনো রচনা প্রকাশ করতে চাইলেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। অন্যদিকে আবার ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্র এবং ব্যায়ামাগার তৈরি করা,আবাসিক হলে টেলিভিশন সরবরাহ, ট্যালেন্ট বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্যদিয়ে চেষ্টা চলছিল ছেলেমেয়েদেরকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে আনবার, তাদেরকে ব্যস্ত রাখবার অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম। এক সময় এমনও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকা শহর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে টঙ্গীতে বসানো হবে; সেটা সম্ভব হয়নি, এমনকি সরকার সমর্থক শিক্ষকেরা পর্যন্ত ব্যাপারটাকে অবান্তর বলে ভূষিত করায়। কিন্তু শহর থেকে দূরে রাখলে বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির দূষণমুক্ত থাকবে এই বোধ থেকে রাষ্ট্রের কর্তারা মুক্ত হন নি, যে জন্য তাঁরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে যখন বাধ্য হয়েছেন তখন জায়গা খুঁজে বের করেছেন ঢাকা শহর থেকে দূরে, সাভারে; এবং চট্টগ্রাম শহর থেকে বিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ী এলাকায়। তাতে বিশ্ববিদ্যালয় দূষণমুক্ত কতটা হয়েছে বলা মুস্কিল, হয় নি যে সেটাও সত্য, কিন্তু তার চেয়েও মর্মান্তিক সত্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি তাদের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে; প্রমাণিত হয়েছে এই পুরাতন সত্য যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সমাজবহির্ভূত করার চেষ্টা প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড তো অবশ্যই, প্রাণশক্তির উপর আঘাত বটে।

রাষ্ট্রের কর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠানের চাইতে বরঞ্চ অনুগত নাগরিক তৈরির কারখানা হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। ভেতর থেকে বরঞ্চ কখনো কখনো প্রতিবাদ

www.pathagar.com

উঠেছে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দিক থেকেও। যেমন ধরা যাক, ১৯৫৭-এর সমাবর্তনে উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমের বক্তব্যে :

> It is also feared that university education may be reduced to a mere training in citizenship as distinguished from the training of the individual. That there is a cause for such an apprehension cannot perhaps be denied. There is an obvious distinction between the training of the citizen and the training of the individual. The two do not mean the same thing. The citizen is only a particular type of individual and his horizon of life is cricumscribed and limited by his political affiliation and loyalty to the existing order of things or an order imposed by the most powerful political party in the state. It is obvious that if education is directed with such a narrow outlook the advancement of knowledge may be hampered. (*Convocation Speeches, vol. II,* পৃ. ১৫৬, ১৫৭)

এই বক্তৃতায় দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যীশু খ্রিস্ট যদি অনুগত নাগরিক হবার জন্য জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তো খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব ঘটতো না; অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মের নবী প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন বলেই না ইসলাম ধর্ম পাওয়া গেছে, নইলে পাওয়া যেতো না। ভদ্রভাবে যা বলা হচ্ছে তা হলো ভৃত্য নয়, দাস তো নয়ই, বিশ্ববিদ্যালয় তার ছাত্রছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে স্বাধীনচেতা মানুষ হতে। কথাটা কেবল যে উপাচার্যের একার ছিল তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এমনকি জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের উদারনৈতিক অংশও এই ধরনের চিন্তাকে ধারণ করতেন। ওই সমাবর্তনটির সময়টাও উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গে তখন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণঅনাস্থা ব্যক্ত হয়েছে, তবে যুক্তফ্রন্ট তার বিজয়কে ধরে রাখতে পারে নি, নিজেরা বিভক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় শাসকদের জন্য সুবিধা করে দিয়েছে। তার মধ্যেও উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ওই কথাগুলো বলেছিলেন; তবে তাতে তাঁর কোনো বিপদ হয় নি, উপরন্তু আইউব খান যখন সরাসরি সামরিক শাসন জারি করলেন তখন বিচারপতি ইব্রাহিম আইউব খানের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

১৯৫৭ এর ওই সমাবর্তনে চ্যান্সেলার হিসাবে বক্তৃতা করেন এ. কে. ফজলুল হক, যুক্তফ্রন্টের একজন নেতা হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তখন তিনি পূর্ববঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন, এবং গভর্নর হিসাবে চ্যান্সেলারের দায়িত্বও নিয়েছেন। উপাচার্যের বক্তব্যটি তিনি কিন্তু গ্রহণ করেন নি; তাঁর বক্তব্যে বরঞ্চ বেজে উঠেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর, যে-সুর পুরাতন বটে, যা আগেও বহুবার শোনা গেছে, আগের চ্যান্সেলার-গভর্নরদের বক্তব্যে। ফজলুল হক বলেছেন, "I beg to be excused for differing with you, Vicechancelor, and not accepting the distinction which you have drawn between 'training in citizenship' and 'the training of the individual.' উপাচার্যের বক্তব্য গ্রহণ করতে না পারার পেছনে যে যুক্তি তিনি দিয়েছিলেন সেটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অতিউচ্চ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে যে অপ্রত্যাশিত নয় : "The real, definite and decisive reason why I do not accept the distinction between education of the individual and of the citizen is the all-important fact that this distinction runs counter to the fundamental principle of Islam." [ঐ, পৃ. ১৭০, ১৭১] স্মরণীয় যে যুক্তফ্রন্টের

www.pathagar.com

বিজয়ের পরে, তাঁর এই বক্তৃতার কিছুদিন আগে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর পূর্বতন কর্মক্ষেত্র কলকাতায় গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলা ভাগ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতি ভাগ হয় নি, সেটি অবিভাজ্যই থাকবে। ওই বক্তব্যের জন্য কেন্দ্রীয় শাসকেরা তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলেছে, কিছুদিন গৃহবন্দী করেও রেখেছে, তবে পরে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পরে গভর্নরের পদে স্থাপন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে নিশ্চুপ করে দেবার চেষ্টা ছিল আইয়ুব খানের শাসনকালের একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য। সে শাসন অবশ্য চিরস্থায়ী হয় নি, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরে তার পতন ঘটেছে, তারপরে এসেছে নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে জেগে উঠেছিল। যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সে নানাভাবে ও বিভিন্ন মাত্রায়; কিন্তু তার সামনে তখন নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। নতুন আইন তাকে স্বাধীনতা দিল। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম মহোৎসাহে শুরু হলো।

কিন্তু, হায়, টেকে নি। সে ইতিহাস আমরা জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, মধ্যরাতে পুলিশ ঢুকে ছাত্রীদের হলে তাণ্ডব ঘটিয়েছে, ছাত্রীদের ধরে নিয়ে গেছে থানায়। ছাত্রদের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম যখন একটি উঁচু ও উন্নত মাত্রায় পৌঁছেছিল তখনই হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের আবির্ভাব ঘটে, এবং এরশাদাগমনে বলতে গেলে প্রথম আঘাতটাই সহ্য করতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। তার সাংস্কৃতিক জীবন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সেটা সামরিক শাসকদের ইপ্সিতও বটে; বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা পরিণত করতে চেয়েছে শিক্ষিত মানুষের বস্তিতে, যেখানে কলহ কোলাহল সংঘর্ষ সবকিছুই থাকবে, শুধু অভাব ঘটবে সুস্থ ও স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক জীবনের। সামরিক শাসন একসময়ে চলে গেছে; তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার এসেছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তার সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। ছাত্রদের ভেতর আগে যে দেশপ্রেমিক আদর্শবাদ ছিল, এখন আর তা দেখা যায় না।

ওদিকে বলা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। কথাটা অর্ধসত্য। হ্যাঁ, নেমেছে; তবে আবার বেড়েছেও। শতকরা পাঁচজন ছাত্রছাত্রী এখন অবশ্যই পাওয়া যাবে যারা আগের যে কোনো সময়ের তাদের সহপাঠীদের তুলনায় কম জানে না, বরঞ্চ বেশিই জানে। সেটা আসলে ঘটেছে যে কারণে তা হলো গড়পড়তা ছাত্র বলে এখন আর কিছু নেই, আগে যেমনটা ছিল। এখন অল্প কয়েকজনই ভালো, বাদবাকিরা ভালো নয়। ভেতরে যা ঘটেছে তা হলো বিদ্যার্জনের আগ্রহে ঘাটতি, যার প্রধান কারণ বিদ্যায়তনিক নয়, অর্থনৈতিক বটে। সমাজে বেকার সমস্যা এখন ভয়াবহ, বিদ্যার্জন জীবিকার কোনো নিশ্চয়তা দেয় না, আগে যে নিশ্চয়তা পুরোপুরি না পাওয়া গেলেও মোটামুটি পাওয়া যেতো। শিক্ষকদের মধ্যেও শিক্ষাদানের ব্যাপারে আগের অভিনিবেশে চিড় ধরেছে, তাঁরাও পুঁজিবাদী কায়দায় মুনাফা অর্জনের যে সাধারণ রোগ সমাজে বিদ্যমান ও বর্ধিষ্ণু তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন; মেরুদণ্ড শক্ত রাখা কঠিন হচ্ছে, রাজনৈতিক কারণে যতটা নয় তার চেয়ে অধিক অর্থনৈতিক কারণে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনেক। শিক্ষিত, দক্ষ, বিজ্ঞ, নানা ধরনের মানুষ সমাজকে সে উপহার দিয়েছে। দুর্বৃত্তও যে তৈরি করে নি তা নয়। বিলক্ষণ করেছে। জাতিগঠনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার কথা বলা হয়, সে কাজে বিশ্ববিদ্যালয় কতটা কি করেছে তার পরিমাপ করা সহজ নয়, কিন্তু শ্রেণীগঠনে তার ভূমিকা যে খুবই প্রত্যক্ষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (শ্রেণীগঠন যে জাতিগঠনে সহায়ক নয়, সে একটি সত্য বটে, সে প্রসঙ্গে আমরা এখন যাচ্ছি না।)

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শক্তি আহরণে খুবই সাহায্য করেছে। এই উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ওই শ্রেণীর বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

১৮৫৭ ব্রিটিশ–বিরোধী সিপাহী অভ্যুত্থানের বছর; ওই বছরই কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী শহরে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বছরও বটে। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের 'নৈতিক ও বৈষয়িক সুফলগুলোকে' সুবিস্তৃত করা; ভেতরের ইচ্ছাটা ছিল ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা অনুগত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ প্রক্রিয়াতে নতুন বেগ সঞ্চার করা। শেকস্‌পীয়রের দি টেমপেস্ট নাটকে প্রসপেরো তাঁর নির্জন দ্বীপে দু'টি প্রাণীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, একটি হচ্ছে স্থূল ক্যালিবান, অপরটি হাওয়ার ভেতর ঘুরে বেড়ানো ফুরফুরে এরিয়েল। প্রসপেরো ওই দু'জনেরই প্রভু; কিন্তু ক্যালিবানকে খাটাতো সে দাসের মতো, আর এরিয়েলকে কাজে লাগাতো ভৃত্য হিসাবে। ক্যালিবান বিদ্রোহী; পারলেই সে প্রসপেরোকে হত্যা করে; এরিয়েল অনুগত ভৃত্য, সে প্রভুর সেবা করে এই ভরসায় যে প্রভু তাকে একদিন স্বাধীনতা দেবে, তদুপরি প্রভু তাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় ক্যালিবানের মায়ের শাসনকালে সে কেমন করে বন্দী ছিল গাছের গর্তের ভেতর। প্রসপেরো এসে মুক্ত না করলে কীভাবে তাকে ওখানেই কাটাতে হতো, ভাবতে বলে সেটাও। ব্রিটিশ–প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল শিক্ষার মধ্য দিয়ে ক্যালিবানের মতো বিদ্রোহপ্রবণ দাস নয়, এরিয়েলের মতো অনুগত সারা জীবন কৃতজ্ঞ ও আশাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে শক্তিশালী করে তোলা। সে কাজে সে ব্যর্থ হয় নি।

কিন্তু আরো একটি কাজে স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের। সেটি হলো মধ্যবিত্তকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে রাখা। ১৮৫৭–এর অভ্যুত্থানে মধ্যবিত্ত যোগ দেয় নি, বরঞ্চ নিজস্ব পদ্ধতিতে অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেছে। তবু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভেতর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং স্বাধীনতার জন্য স্পৃহা যে গড়ে উঠছিল সেটা তো সত্য; এবং এই অসন্তোষের কারণে তরুণ মধ্যবিত্ত যদি ভবিষ্যতের কোনো অভ্যুত্থানে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে ফরাসি বিপ্লবের মতো ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে বলে ব্রিটিশ শাসকেরা উদ্বিগ্ন ছিল বৈকি। ওই উদ্বেগের কারণেই ১৮৫৭ তে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আটাশ বছর পরে একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আইসিএস অফিসারের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল সেসবকে নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশের জন্য পথ করে দেওয়া, এবং সেই সঙ্গে ভারতশাসনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কিছুটা হলেও যুক্ত করা। কংগ্রেসের ভরসা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত মানুষেরাই। পরে মুসলিম লীগ এসেছে, এবং রাজনৈতিক মঞ্চে দুই সম্প্রদায়ের দুই মধ্যবিত্তের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হয়েছে এবং একসময়ে ভারত দুই রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেছে; যার নাম দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি।

পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একই সঙ্গে শক্তিশালী এবং সমাজবিচ্ছিন্ন করেই রাখতে চেয়েছে। শ্রেণীচ্যুত হয়ে মধ্যবিত্ত তরুণ জনগণের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বৈকি, যার ফলে বামপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তেমন কাজকে মোটেই উৎসাহিত করে নি। চরিত্রগতভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান, এবং পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তান–বিরোধী যে চেতনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছিল তাকে ছাত্ররা যত সহজে ধারণ করতে পেরেছে, শিক্ষকেরা সেভাবে পারেন নি। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয় সমাজের ভেতরই জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় আদর্শই কার্যকর ছিল। একাত্তরের বাংলাদেশ যখন নতুন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন শিক্ষকদের ভেতর যাঁরা জাতীয়তাবাদী তাঁরাই প্রবল হয়ে উঠেছেন, যেটা ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁরা নতুন কি করবেন তা ভেবে পান নি;

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতারা যা করেছেন তাঁরাও তা-ই করেছেন, নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। দেশের রাজনীতিতে যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরও তেমনি, জাতীয়বাদীরাই এখন নিয়ামক শক্তি-একদল বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, অন্যদল বলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা, এবং তাদের নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের দলীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত রাখেন। এঁদের জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তো নয়ই, পুঁজিবাদী আদর্শে দীক্ষিত এবং সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন লাভে ব্যগ্র বটে।

সমাজতন্ত্রীরা পেছনে হটে গেছেন, যেমন দেশের রাজনীতিতে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও। ছাত্র আন্দোলনেও ওই একই ঘটনা, মূল শক্তি ও সংঘাত জাতীয়তাবাদীদের করতলগত। বিশ্ববিদ্যালয় তাই তার গন্তব্যের দিকে এগুতে পারছে না। গন্তব্য হচ্ছে সমাজ, সমাজের ভেতর দিয়েই তাকে হতে হবে বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক; কিন্তু সে গন্তব্য ভুলে বা সেটাকে অবজ্ঞা করে সে আটকা পড়ে রয়েছে পুরাতন বৃত্তে। যে তরুণ একদিন শ্রেণীচ্যুত হয়ে সমাজের দিকে চলে যেতে চাইতো, তাকে এখন খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।

পুঁজিবাদী আদর্শের এখন জয়জয়কার। অর্ধশতাধিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক প্রয়োজন মেটাচ্ছে; কিন্তু তারা আসলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বটে। তাদের মেরুদণ্ড আছে কি নেই সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা তাদের অপরিহার্য বিধিলিপি। কিন্তু সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে মেরুদণ্ড ঠিক রেখে সমাজের সঙ্গে সংলগ্ন হবার কর্তব্য পালন করছে তাও নয়। পুঁজিবাদের কারাগার তাদেরকে আটক করে ফেলেছে। শিক্ষা যে ক্রমান্বয়ে কেনাবেচার পণ্যে পরিণত হচ্ছে এই অভিযোগ মোটেই মিথ্যা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, একটি নির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু মাতৃভাষাকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়ে নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা যে অচিরে চালু হবে এমন ভরসা খুবই কম। ওই কাজের জন্য যে উদ্দীপনা ও ঐকান্তিকতা অত্যাবশ্যক তা এখন প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদেরকে করতেই হবে, নইলে তো আমাদের স্বাধীনতা শুধু কথার কথা হয়েই থাকবে। কাজটা তখনই সম্ভব হবে যখন আদর্শবাদ জেগে উঠবে, যে আদর্শবাদ সমাজকে নিয়ে যাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে, বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না, সে হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ অর্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিচ্ছিন্নতার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াবে সংলগ্নতা। বলার অপেক্ষা রাখে না, ওই রকমের একটা কাজের দায়িত্ব জাতীয়তাবাদীরা নেবে না, নিতে হবে সমাজতন্ত্রীদেরকেই, যদি তারা নেয়, যদি নিতে পারে। জাতীয়তাবাদীদের শত্রু প্রয়োজন, শত্রু ছাড়া তার শক্তির অনুশীলন বাড়ে না। বর্তমানে ক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ নয়, বিশ্বায়নে অভিভূত রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা নয়, শত্রু তারা পরস্পরের। আদর্শিক কারণে নয়, স্বার্থের কারণে। এই শত্রুতার বৃত্ত ভেঙে সমাজের দিকে এগিয়ে যাবার সুযোগ নেই তাদের জন্য। বৃত্ত ভাঙবে তারাই যারা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী।

সেটা না করতে পারলে আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকবো, আলো তৈরি হবে না, ভালো মানুষও সৃষ্টি হবে না।

www.pathagar.com

উচ্চস্তরের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদান

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দেশ, জাতি ও বর্ণ-নির্বিশেষে দেখা যায় যে, ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত তরুণ কিশোর-কিশোরীদের অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করে। এই সময় তাহাদের শরীরের যেমন পরিবর্তন হইতে থাকে মনেও তেমনি দেখা দেয় পরিবর্তন। শিক্ষক মাত্রেই জানেন এই সন্ধিঃক্ষণ তাহার পক্ষে সমস্যামূলক। কোনও শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ইহা মাহেন্দ্রক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়, কাহারও ক্ষেত্রে উহা বাল্যবেলার যাত্রার মতো মনে হয়। ইতিহাস শিক্ষকের নিকট ইহা অধিকতর সমস্যামূলক। তিনি জানেন হয় শিক্ষার্থীর হৃদয়ে এই সময়ে ইতিহাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবেন নয়ত চিরদিনের জন্য ছাত্রদের নিকট উহা বিশ্বাসরূপে পরিগণিত হইয়া থাকিবে; যেমন পড়িবে তেমন ভুলিয়া যাইবে। শৈশবে ইতিহাসের যে সমস্ত কাহিনী লইয়া শিশু রঙিন স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এখন সে উহার গূঢ় অর্থ, তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবে। এই সময় ইতিহাস পাঠ তাহাকে সামগ্রিক কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিতে চেষ্টা করিবে।

আমাদের দেশে প্রচলিত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের গড় বয়স ১৫/১৬ বলা যাইতে পারে। এই শেষ কয়বৎসরের ইতিহাস শিক্ষার্থীর অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ঘটনার সমালোচনামূলক জ্ঞান জন্মায়। শিক্ষকের হাতে সময় সংক্ষিপ্ত। তিনি প্রধানত চেষ্টা করেন ছাত্রকে তাহার জাতীয় ইতিহাস শিক্ষাদান করিতে। ছাত্রগণ যখন মানবজাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পড়বে, তখন তাহারা দেখিবে জগত কিভাবে যুগে যুগে মনীষীগণের নিকট ঋণী, তখন তাহারা আপনা হইতেই বিশ্বের কল্যাণকামীদের বিষয়ে তথা জগতের সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে কৌতূহলপরায়ণ হইবে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, শিক্ষক কিভাবে অন্যান্য জাতির তুলনামূলক পর্যায়ে জাতীয় ইতিহাস পড়াইবেন। শিক্ষকের প্রধান এবং মুখ্য লক্ষ্য থাকে তাঁহার ছাত্রগণ যেন আন্তর্জাতিক সখ্য ইতিহাস-পাঠে অর্জন করিতে পারে এবং তাহার মনে যেন কৌতূহল জাগে যাহাতে সে গবেষণামুখিন হয় এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলো সম্বন্ধে চিন্তাশীল হয়।

জাতীয় ইতিহাস সবসময়ই আন্তর্জাতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান উচিত। আন্তর্জাতিক কৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধীতব্য বিষয়সমূহ ছাত্রদের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারে। ভারতের ইতিহাসে আর্যদের আগমনের সহিত পৃথিবীর ইতিহাস জড়িত। মুসলমানদের আক্রমণ, ইসলাম ধর্মের আন্তর্জাতিক প্রচার, ইউরোপিয়ানদের আগমন, সমগ্র জগতের বাণিজ্যিক সাড়া এগুলো লক্ষ রাখিয়া শিক্ষক পাঠ্য বিষয় উপস্থিত করিবেন। এই

www.pathagar.com

প্রকার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস অধ্যয়নকালে ছাত্র বুঝিতে পারে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ভালো এবং মন্দ উভয়ই আছে। যাহার যেটুকু ভালো সেটুকুই আদর্শ।

শিক্ষক অধ্যাপনাকালে ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ের এমন অতিরিক্ত জ্ঞান জন্মাইবারও চেষ্টা করিবেন যাহাতে ছাত্র জগত–সমাজের বিষয়ে চিন্তাশীল হয়। আধুনিক জগত আন্তর্জাতিক ভিত্তির উপর গঠিত। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষক যুদ্ধের বিবরণ অধ্যাপনা প্রসঙ্গে স্বদেশের ত্রুটিসমূহ গোপন রাখিয়া অন্য দেশের ত্রুটিই বড় করিয়া প্রদর্শন করেন। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের উচিত কেবল ঘটনাসমূহের বিবরণ উপস্থাপিত করা। ছাত্রগণের কার্য হইতেছে কেন এই সমস্ত যুদ্ধ ঘটিল তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। যদি ইহাতে অধ্যয়নার্থিগণ দেখিতে পায় যে, তাহারা প্রকৃত কারণের সন্ধান করিয়াও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না তাহাতেও দুঃখের কোনও কারণ থাকিবে না। শিক্ষকের কাজ এখানে আন্তর্জাতিক জ্ঞান–বিদ্যা–বুদ্ধির দ্বারা ছাত্রদের নিকট উন্মুক্ত করা।

একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

কোনও দেশ কেবল স্বজাতির ইতিহাস পড়াইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। তাহারা ইচ্ছা করে সমগ্র মানবজাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসই ছাত্রগণ অধ্যয়ন করুক। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহাতে বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক উদারতার প্রসার হয়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশ্বের ইতিহাস পড়াইবারও প্রস্তাব করা হয়। অনেক সময় শিক্ষকগণের জ্ঞানের অভাব ইহার অন্তরায় হয়।

নির্দিষ্ট বিষয়–সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কেহ কেহ এই স্তরের ইতিহাস অধ্যয়নের পক্ষপাতী। ইহার সুবিধা এবং অসুবিধাও আছে। প্রধান অসুবিধা এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া (Topical basis) ইতিহাস সাধারণত লিখিত হয় না। অতএব অধ্যাপনার পক্ষে এই পন্থায় অগ্রসর হওয়া কষ্টকর। অপরদিকে সুবিধা ও যৌথ অধ্যয়ন প্রথায় অগ্রসর হইলে শিক্ষার্থিগণ অধিকতর আনন্দ পায় এবং স্ব স্ব চিন্তাধারায় প্রসারতা আনিতে পারে।

একদল শিক্ষাবিদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড়াইবার পক্ষপাতী।

এইবার শিক্ষকের আচরণ বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে। শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার পর তাঁহার অধিকাংশ ছাত্রদের আর ইতিহাসের সহিত সংযোগ থাকিবে না, অতএব এই সময় তাঁহার ছাত্রকে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হইবার পূর্বে ইতিহাস সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষককে হইতে হইবে উদার, বৈচিত্র্যময়, পরমতসহিষ্ণু ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি শিষ্যদের বুঝাইবেন ইতিহাসের ঘটনাবলীর আবর্তন, রাজা এবং রাজনীতিকদের উত্থান–পতনের কাহিনী, পুঁজিবাদী এবং বিদ্রোহীদের সংগ্রাম, জনসাধারণের জীবনযাত্রার কাহিনী। শিক্ষক এইভাবে ছাত্রদের নিত্য নতুন তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রোৎসাহিত করিবেন।

শিক্ষক ছাত্রকে এই সময় অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিবেন। যুদ্ধ–বিগ্রহ, রাজনীতি ইহাই যেন ছাত্রের শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া না দাঁড়ায়। "রাজনীতি" একেবারে এড়াইয়া চলা সম্ভব নহে। ছাত্ররা খবরের কাগজ পড়ে, পথে–ঘাটে, ট্রামে বাসে, র‍্যাশন আনিতে গিয়া রাজনীতির আলোচনায় জড়াইয়া পড়ে। তাহাদের অজ্ঞাতসারেই রাজনীতি তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এই বিষয়ে ইতিহাস–শিক্ষক কী করিতে পারেন?

www.pathagar.com

ইতিহাস শিক্ষকের এই স্থানে দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ–তাঁহার অংশও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার কার্য হইবে ছাত্রকে সর্ববিষয়ে সমদৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তোলা। শিক্ষক ছাত্রের নিকট জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না।–সে চেষ্টা করিলে ফলও ভালো হয় না। নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্রতিই মানুষের কৌতূহল হয় বেশি।

ইতিহাস শিক্ষক ছাত্রের মনকে প্রস্তুত করিতে পারেন। তিনি ছাত্রকে বিজ্ঞানের সাধনায় যেমন বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হন, তেমনি নিরপেক্ষ দর্শকরূপে ইতিহাসের কার্য অনুধাবন করিতে শিক্ষা দিতে পারেন। তাঁহার ছাত্রগণ যেন মনকে সকলের উপরে রাখিয়া জ্ঞান ও সৎবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতে শিখে।

শিক্ষক এই সময় জ্ঞান ও বুদ্ধির ভাবধারা এবং নৈতিক বলের ইতিহাসে প্রাধান্য বিষয়ে ছাত্রকে অবহিত করিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্ম ও নীতিবাদের প্রচারকগণের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ছাত্রদের নিকট তৎকালীন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কারিতে চেষ্টা করিবেন। সমগ্র জগতের পরমবান্ধব মানবকূলের হিতৈষীরূপে বৈজ্ঞানিকগণের আবির্ভাব, দাসপ্রথা নিরোধকল্পে সমাজকল্যাণকামীদের প্রচেষ্টা, রেডক্রস আন্দোলন, লুই পাস্তর, জেনেট প্রভৃতির বিবরণ এই সময় ছাত্রছাত্রীদের নিকট উপস্থিত করা প্রয়োজন। আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। চিকিৎসাবিদ্যার ইতিবৃত্ত, শিল্প প্রসারের ইতিহাস প্রভৃতিও এই সময় বিশদরূপে পর্যালোচনা করা যায়। এই সমস্ত ইতিহাস তো সমগ্র জগতের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত।

এই সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীগণকে শান্তি এবং সহিষ্ণুতার প্রতীক মহাপুরুষদের বিষয়ও আলোচনা করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি ছাত্রদের নিকট পর্যালোচনা করিয়া দেখাইতে পারেন যে, সত্যের পথ কত সরল এবং যুগ–তমিস্রা ভেদ করিয়াও সত্যব্রতীদের চরিত্র উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। অতীতের অত্যাচার, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার চেয়েও সত্যকে উজ্জ্বলতররূপে প্রতিফলিত করাই যেন শিক্ষকের লক্ষ্য হয়। শিক্ষক ইহাও ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন যে, দেশে যেখানে এক সময়ে দেখা গিয়েছিল যে মতবাদ গরল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা দ্বারাই ঐ স্থানে এখন সৃষ্টি হইয়াছে অমৃতের।

সমগ্র জগত আজকাল আন্তর্জাতিক বন্ধনে আবদ্ধ। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের নিকট রেডক্রস, বয়স্কাউট, ইউএনও, বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতির বিষয়ে জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা উন্মুক্ত করারও প্রয়োজন।

এই স্তরের অধ্যাপনার লক্ষ্য থাকিবে প্রধানত আলোচনা। শিক্ষক পাঠের প্রারম্ভে সামান্য একটু মুখবন্ধ দ্বারা, তাহাদের পরস্পরের পর্যালোচনা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে সকলের সম্মুখে দাঁড় করাইবেন। মাঝে মাঝে ব্ল্যাকবোর্ডের আশ্রয় লইয়া বিষয়সমূহ স্পষ্টতর করিতে পারা যায়। সর্বশেষে একটি নোট প্রদান করিয়া বিষয়টির উপর সমাপ্তিরেখা টানা যায়।

ইতিহাসের উৎসসমূহ বা মূল তথ্যবিষয়ক ইতিহাসের উপকরণসমূহও এই স্তরে কিছু কিছু পড়ান যায়। কোনও কোনও শিক্ষক বলেন– সময় কম, শিক্ষার্থীরাও হয়ত তেমন পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক নয়। তদুপরি উৎসের অনুসন্ধানে প্রয়োজন গভীর এবং অক্লান্ত পরিশ্রম। অতএব এই সময় মূল বিবরণীতে না যাওয়াই ভালো। সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই–এই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন একদল শিক্ষকের যাঁহারা নিজেরাও মূল দলিল তথ্য ইত্যাদি অনুসন্ধানে দক্ষ। হয়ত এই কথা সত্যই। কিন্তু এই প্রচেষ্টার বীজ যাহা নিহিত করা যায় তাহাই তো লাভ। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিন প্রভৃতিতে বা বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কালে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির রায়, জাহানারার আত্মকাহিনীর বিবরণ বা সম্রাট অশোকের

www.pathagar.com

অনুশাসনের দুই একটির মূল উৎস বাহির করিলে ইতিহাসের মৌলিক দিকটির প্রতি শিক্ষার্থীর মন উন্মুক্ত করা যায়।

সর্বোপরি এই স্তরে শিক্ষার্থীদের লেখার, সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করিবার এবং মূল তথ্য হইতে বিবরণসমূহ বাছাই করিয়া তাহার চুম্বক লিখিবার অভ্যাস করান একান্ত প্রয়োজন শিক্ষার্থিগণ কথোপকথন, চিঠিপত্র, কবিতার ছন্দ প্রভৃতি রচনা দ্বারাও ইতিহাসের সজীবতা রক্ষা করিতে পারে।

ব্যক্তিগত কার্য ছাড়াও সমবায়মূলক কার্য দ্বারা ইতিহাসে অনুরাগ জন্মে। নিম্নস্তরেও শিক্ষার্থীরা অভিনয় করে। তদুপরি ঐতিহাসিক বিষয়ে বিতর্ক সভায় এই স্তরে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় ঐতিহাসিক সম্মিলনীর সময়ে সমগ্র ভারতের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে–ড. রমেশ মজুমদার এবং ড. বসাক–এর মধ্যে–শশাঙ্ক বাঙালী ছিলেন কিনা ইহা লইয়া যে বিতর্ক–সভা হয়–তাহা দর্শকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

একত্র বিন্যাসমূলক কার্যের আর একটির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র রচনা, নিজস্ব রচনা বা বুলেটিন বাহির করিতে পারে। এই প্রকার এক–একটি দলে একজন সভাপতি, একজন প্রচারক, একজন চিত্রকর, একজন লেখক থাকিবে এবং প্রত্যেক গ্রুপ কার্যান্তে তাহাদের কার্য–বিবরণী সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবে। ঐতিহাসিক প্রদর্শনী–অঙ্কন প্রভৃতি কার্যও দলে বিভক্ত হইয়া করিতে পারে।

বিদ্যালয়ের এই সমস্ত শ্রেণীতে ছাত্রদের সংঘবদ্ধভাবে ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শনে লইয়া যাওয়া যায়। ছোট ছোট গ্রুপ হইলেই ভালো হয়, কেননা তাহা হইলে দর্শনীয় দ্রব্যসমূহ হইতে শিক্ষালাভ করিতে প্রকৃত সুযোগ পাওয়া যায়। যাইবার পূর্বে দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হইলে ভালো হয়, ইহাতে শিক্ষার্থীর মনের সম্মুখে কল্পনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় এবং সে প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় প্রকৃত ইতিহাসের রূপ দেখিতে পায়।

অনেকে উচ্চশ্রেণীতে অধ্যাপনার সুবিধার জন্য কোনও পাঠ এক সপ্তাহ বা এক পক্ষকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ইহাকে বলে Assignment method। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও নমুনা পরিশিষ্টে দেখান হইবে। ইহার সুবিধা এই, পাঠ্য বিষয়ে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হওয়া, উচ্চতর শ্রেণীতে এই পন্থায় চলিলে শিক্ষার্থীদের স্বকীয় বুদ্ধি ও নিজস্ব চিন্তাধারা বিকাশের সুযোগ হয়। আমাদের বর্তমান পাঠ্যসূচিতে বিশ্বের ইতিহাস একপ্রকার বাদ দেওয়া হইয়াছে। হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসের ঘটনার আবর্তন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বোঝা হইয়া পড়ে মনে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বের ইতিহাস পাঠ্য করার আর একটা দিকও আছে। যাঁহারা ইহার পক্ষপাতী তাঁহাদের চিন্তাধারা নিম্নলিখিতরূপে অনুসরণ করা হয়।

পৃথিবী আজ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে। জন্মসূত্রে অর্জিত পৈতৃক ভূমি মানুষকে আজ আর তাহার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। বিশ্বের যেখানেই তাহার কর্মস্থল হইতেছে, সেখানেই সে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া আছে। সেখানকার লোকই তাহার আপনজন হইয়া দাঁড়াইতেছে। অতএব মানুষকে যদি ইতিহাস পড়িতে হয়,তবে তাহাকে বিশ্বের ইতিহাসই পড়ান উচিত। প্রত্যেক মানুষ আজ সমগ্র বিশ্বের। বিজ্ঞান আজ সমস্ত দেশের দূরত্ব হ্রাস করিয়া আনিয়াছে। এক দেশের কল্যাণ বা অমঙ্গল সমগ্র বিশ্বের সহিত একান্তভাবে জড়িত।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষা, ভাষা ও বিশ্ববিদ্যালয়

অম্লান দত্ত

আমি মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী; আমি চাই যে,বিভিন্ন বিষয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে মাতৃভাষার স্থান হোক।

কিন্তু এই কথাটুকু বলেই যাঁরা বক্তব্য শেষ করেন, তাঁদের সঙ্গে আমার মতের ঘোরতর অমিল। মাতৃভাষায়, অথবা আঞ্চলিক ভাষায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য বিশ বৎসর চালাবার পর এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর ভাববিনিময় চলবে কী করে?

এটা চিন্তিত হবার মতো প্রশ্ন। স্বাধীনতা লাভের সময় আমরা এমন নেতৃবৃন্দ পেয়েছিলাম যাঁরা ছিলেন চিন্তায় ও আদর্শে সর্বভারতীয়। আজ ধীরে ধীরে রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা সামনে এগিয়ে আসছেন, তাঁরা আগের নেতাদের তুলনায় অনেকটা বেশি আঞ্চলিক। এ অবস্থায় দেশের ভাববিনিময়ের সেতুটা, বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর, যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা আবশ্যক। একটা কথা এই সঙ্গে স্পষ্ট করে বলা দরকার। ইংলন্ডের মতো শিল্পোন্নত দেশেও অধিকাংশ লোক নিজ নিজ অঞ্চলে জীবনের অধিকভাগ কাটিয়ে দেন। এদেশেও অল্পসংখ্যক লোকই দেশময় আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু দেশের ঐক্যের জন্য দেশময় আলোচনার এই স্রোতটাকে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। আমরা অনেকেই ঐক্যে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমাদের ধারণা যোগাযোগের ভাষা ছিন্ন করে দিলেও ঐক্যটা টিকে থাকবে। এমন একটা প্রমাণহীন ধারণাকে অবলম্বন করে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ। দেশের ঐক্য ভাঙা সহজ : আবার গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন।

এ প্রসঙ্গে অনেকে একটা ভুল তুলনা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা, তবুও তো ওদের ভিতর আলোচনা চলেছে। তর্জমার বেড়া ডিঙিয়ে আলোচনা অবশ্য ভারতবর্ষ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পরও চলবে। আমি বিভক্ত ইউরোপের তুল্য বিভক্ত ভারতের কথা ভাবছি না বরং রাজনৈতিক ঐক্যে বিধৃত ভারতের সংস্কৃতির কথাই বলছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা সমস্যা আলোচনা করতে হবে।

অনেকে আবার বলেন যে, ইংরেজিকে তো আমরা উঠিয়ে দিচ্ছি না, অতএব ভয়ের কারণ কী? কিন্তু এখানেই আমাদের দ্বিতীয় বিরাট ভুল। আমরা বলি যে, ইংরেজিকে আমরা রাখব বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে। আজকের রুশ পণ্ডিতও প্রায়ই ইংরেজি জানেন বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যই; কিন্তু তিনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন না। আমরা ভুলে যাই যে ভাষায় নিজের চিন্তা গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারা অন্য জিনিস।

www.pathagar.com

সোভিয়েত দেশের সঙ্গে এদেশের তুলনায় একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। সোভিয়েত দেশও বহুভাষার দেশ। কিন্তু তবুও একটা পার্থক্য আছে। ওদেশে রুশ ভাষার সঙ্গে তুলনীয় সমৃদ্ধ ভাষা আর নেই। রুশ ভাষা শুধু সংখ্যায় বেশি লোকই কথা বলেন না, পুশকিন-ডস্টয়েভস্কি-টলস্টয়ের ভাষা সাহিত্যিকসম্পদে সোভিয়েত দেশের সকল ভাষার ভিতর অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। এদেশের অবস্থা ভিন্ন। আমাদের কোনও ভাষাই অন্যান্য সব ভাষার তুলনায় ঐরকম প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না; বাঙালি, উর্দুভাষী অথবা তামিল স্বীকার করবেন না যে হিন্দী ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। ফলে সোভিয়েত দেশের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে রুশভাষা ঐক্যের বন্ধন হিসাবে যেমন সহজে গ্রহণযোগ্য, এদেশে হিন্দী তেমন নয়। নগরে নগরে সাধারণ মানুষের ভিতর খানিকটা হিন্দী অবশ্য ছড়িয়েছে; সে জন্য সরকারি ফতোয়া বা আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আইনের জোরে এ দেশের উপর হিন্দী চাপাতে গেলে তার পরিণাম কি হতে পারে দক্ষিণ ভারত থেকে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগের প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছেন। এই যোগাযোগটা হবে নিশ্চয়ই মাতৃভাষার মাধ্যমে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যাঁরা নিজ অঞ্চল ছেড়ে ভারতের ভিন্ন কোনও অংশে স্থায়ীভাবে অথবা দীর্ঘদিনের জন্য বসবাস করতে চাইবেন তাঁরা এই অঞ্চলের ভাষা শিখে নেবেন। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দেশময় সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দী শেখাবার প্রয়োজন নেই। কোনও শিক্ষিত বাঙালি অথবা হিন্দীভাষী যদি তামিল চাষির ভিতর কাজ করতে চান তো তাঁকে সেই চাষির ভাষাটাই শিখে নিতে হবে; সমস্ত তামিল চাষিকে সেজন্য হিন্দী শেখবার অর্থ হয় না। স্বাভাবিক গতিতে হিন্দী যতটা ছড়ায় ততটাই ভালো। কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নটা তবু থেকেই যায় : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সারা ভারতে যোগাযোগের ভাষা কি হবে?

এ কথাটা আজ আমাদের পরিষ্কারভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে যে, আজ থেকে বিশ বছর পর ইংরেজিকে আমরা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের ভিতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা সমস্যা আলোচনার মাধ্যম হিসাবে রাখতে চাই কি না? যদি চাই তো কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ইংরেজি এতখানি শিখতে হবে যে, তাঁরা শুধু ইংরেজি বই পড়েই বুঝতে পারবেন না, ইংরেজিতে নিজের চিন্তাও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। কথাটা অন্যভাবেও রাখা যায়। হিন্দী যদি অবশ্যপাঠ্য হয়ও তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইংরেজি ও হিন্দী দুটোই সামান্য শিখবার পর অহিন্দীভাষী ভারতীয় উচ্চশিক্ষার জন্য কোন ভাষাটি ভালো করে শিখবেন? তিনটি ভাষায় উচ্চচিন্তা সুচারুভাবে প্রকাশ করতে শেখা কঠিন কাজ। কিন্তু দুটি ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা দুরূহ নয় এবং আমাদের দেশে এটা প্রয়োজন। মাতৃভাষা আমাদের চাই : কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তঃভারতীয় যোগাযোগের একটি ভাষাও চাই। সেই ভাষা হবে কোনটি? কোন্ দুটি ভাষার যোগাযোগ আমাদের জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা যথাসম্ভব বৃদ্ধি পাবে? এ বিষয়ে সন্দেহ এই যে, দুটি ভারতীয় ভাষা উচ্চ পর্যায়ে শেখার চেয়ে একটি ভারতীয় ভাষা (মাতৃভাষা) ও ইংরেজি ভালো করে শিখলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ লাভবান হবে বেশি।

অর্থাৎ, আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যে, এ দেশের ছাত্রেরা ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষা উভয়ের মাধ্যমেই শুধু পুস্তক পাঠেই সক্ষম হবেন না, বিদ্বজ্জন সমাজে নিজেকে প্রকাশ করতেও পারবেন। রামমোহন থেকে জগদীশচন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই

www.pathagar.com

এটা পারতেন; কিন্তু আজ শিক্ষার সুপরিকল্পনা ছাড়া বিশ বছর পর এ আর সম্ভব হবে না। অথচ দেশের ঐক্য ও অগ্রগতির জন্য এটা আমাদের না হলেই নয়।

২

শিক্ষকতা আমার পেশা; আমি শিক্ষক সম্প্রদায়ের একজন। অপরের সমালোচনায় ভদ্রতার প্রশ্ন থাকে ; আত্ম-সমালোচনায় সে প্রশ্ন অবান্তর। তাছাড়া, শিক্ষার সমস্যা আজ এতই গুরুতর, শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রয়োজন এতই জরুরি যে,বলবার কথাটা একটু জোর দিয়ে বলাই ভালো।

গত কয়েক বছর যাবত পরীক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রদের হৈ-চৈ-টা বেড়ে চলেছে। প্রশ্ন কঠিন বা প্রত্যাশিতের বাইরে বলে ছাত্রেরা বেরিয়ে চলে আসছে। কয়েকজন ছাত্র, যারা পরীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক, অপর ছাত্রদের জোর করে পরীক্ষাকক্ষ থেকে বের করে নিয়ে আসছে। আইনভঙ্গকারীদের আঘাতে কখনও আসবাবপত্র ভাঙছে, কখনও নির্দোষ লোক জখম হচ্ছে। পরীক্ষার হলে নকল তো এখন নিত্যনৈমিত্তিক। কি করে এ জিনিসটা বন্ধ করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এটাই আজ একটা প্রধান চিন্তার ব্যাপার হয়ে উঠছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রে যে ব্যাপারটা ঘটছে, সেটা নিন্দনীয় সন্দেহ নেই; এ বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিন্তু আজকের প্রবন্ধে সেটা আমার প্রধান বলবার কথা নয়। পরীক্ষার প্রতিটি কেন্দ্রে যদি আজ কোনও যাদুবলে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অনেকেই তা হলে নিশ্চিন্ত হতেন। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে এমন সামঞ্জস্যবিহীন, ছাত্রদের মনে জ্ঞানস্পৃহা জাগবার পক্ষে এটা এতই অনুপযোগী যে এর পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে ততদিন শুধু পরীক্ষাকক্ষে শান্তি রক্ষা করেই যিনি নিশ্চিন্ত বোধ করেন শিক্ষার প্রকৃত সমস্যাটা তাঁর চেতনায় প্রবেশ করেনি বলেই আমার ধারণা।

এই বৃহত সমস্যার একটি অংশ মাত্র নিয়ে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ; আমার বক্তব্যও প্রধানত উচ্চশিক্ষার দুয়েকটি সমস্যাতেই আবদ্ধ রাখব। কিন্তু তার আগে বলে নিতে চাই যে, প্রাথমিক শিক্ষাটা পর্যন্ত আজ অবধি আমরা এ দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি, এটা অত্যন্ত ক্ষোভের কথা। অন্তত খানিকটা শিক্ষা আপামর জনসাধারণের ভিতর ছড়িয়ে দিতে না পারলে আমাদের গণতন্ত্রও যেমন অসম্পূর্ণ থাকবে, কৃষি তথা আর্থিক উন্নতিও তেমনি গোড়ায় দুর্বল থেকে যাবে।

আলোচনার গোড়ায় উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খানিকটা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। মধ্যযুগে উচ্চশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সনাতন ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা এবং বংশপরম্পরায় সেটাকে অবিচল শ্রদ্ধায় বাঁচিয়ে রাখা। বর্তমান যুগের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। এ যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ। প্রগতিশীল প্রতিটি দেশে এমন এক শ্রেণীর মানুষ প্রয়োজন যাঁদের কাজ হবে জ্ঞানবিজ্ঞানের এই অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা, নিদেনপক্ষে নিজের চিন্তাকে ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়া জগতের সঙ্গে তাল রেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান কাজ এই বিশেষ ধরনের জ্ঞানব্রতী মানুষ তৈরি করা। যে দেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় এই মানুষ তৈরি হবে না সে দেশ পিছিয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

চাকরির সমস্যার কথা আমি আপাতত বলছি না। সেটার জন্য প্রধান প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার পুনর্গঠন এবং শিল্পের প্রসারের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ভিন্ন। শুধু কেরানি তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চালানো তুচ্ছ বস্তুর উৎপাদনে দামি যন্ত্রের ব্যবহারের মতই সামাজিক সম্পদের অপচয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কেরানি তৈরি নয়, বরং সেই মানুষ তৈরি যিনি গৃহীত জ্ঞানকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করতে পারেন, বর্ধিষ্ণু বিজ্ঞানের সঙ্গে পা মিলিয়ে বলতে পারেন, যাঁকে ছাড়া দেশের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতি সম্ভব হয় না। আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এই মানুষ তৈরি করার পক্ষে উপযোগী কি না, এটাই প্রধান প্রশ্ন, ডিগ্রিধারি কটি অথবা কহাজার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরলো, সেটা প্রধান নয়।

এই গোড়ার কথাটা মনে রেখে আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে একবার তাকানো যাক। শিক্ষাকে আমরা যুক্ত করতে পারিনি নিয়ত বিবর্তিত জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতা ও সমস্যার সঙ্গে। এটা করা প্রয়োজন। শিক্ষার নামে এখানে চলেছে ধমক, ধমকে মুখস্থ বিদ্যার চর্চা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-বছরের শেষে একটি পরীক্ষা, তাতেই ছাত্রের ফলাফল বিচার হয়। পরীক্ষা কাছে না-এলে ছাত্রদের লেখাপড়ার চাড় থাকে না। কাজেই প্রথম দেড় বছর শিক্ষার্থীরা,বিশেষত কলা বিভাগের ছাত্রেরা, শিক্ষায় মনঃসংযোগ করে না। এতে বুদ্ধি ও চরিত্র দুয়েরই ক্ষতি। বছরের পর বছর এই বুদ্ধিনাশের তুলনায় পরীক্ষা হলে অশান্তির ফলে যে ক্ষতিটুকু হয় সেটা সামান্য। শেষ ছ-মাসে পড়াশোনার তাড়া পড়ে। বাছাই করা কিছু প্রশ্নোত্তর ছেলেরা তৈরি (অর্থাৎ পরীক্ষার খাতায় লিখবার মতো মুখস্থ) করে যায়। এর বাইরে কোনও প্রশ্ন এলে তারা ক্রুদ্ধ বোধ করে, অধ্যাপক তাদের সঙ্গে শর্ত ভঙ্গ করেছেন এই রকম একটা অনুযোগে মুখর হয়ে ওঠে। দু-বছরের ভিতর ক্লাসে কোনও পরীক্ষা নেই-পরীক্ষা নেওয়া হলেও শেষ ফলাফলের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। কাজেই সে পরীক্ষাতে বিদ্যার্থীর কোনও আগ্রহ নেই। ক্লাসে অধ্যাপক ছাত্রদের কোনও প্রশ্নে টানলে, কোনও আলোচনায় তাকে যোগ দিতে বললে, সেটা তার বিরক্তির কারণ হয়। আবার ছাত্রেরা প্রশ্ন তুললে অনেক অধ্যাপকও তাতে বিরক্ত হন। আসলে আমরা নিজে চিন্তা করে একটা সমস্যার অবতারণা করতে, সেই সমস্যা নিয়ে ভাবতে ও ভাবাতে, অভ্যস্ত নই। 'চিন্তা করা' ও জ্ঞানান্বেষণ নামক কার্যটি যে কি অনেক ছাত্রেরই সেটা জানা হয়ে ওঠে না। অনেকের যেন ধারণা যে কয়েক পাতার একটি সংক্ষিপ্ত নোট তৈরি করার নাম বুঝি জ্ঞানান্বেষণ, আবার কেউ কেউ ভাবেন যে কিছু শ্লোগান বা বাঁধা বুলি চেঁচানটাই মৌলিক চিন্তার নিদর্শন।

অতএব যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ আমরা জ্ঞানস্পৃহ এবং সম্যক সমালোচনায় অভ্যস্ত ছাত্র তৈরি করি না; বরং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যা-পুস্তক পুঁজি করে শিক্ষার দরিদ্র মুদিখানা চালিয়েই যাই। মাঝে মাঝে এর ভিতর থেকেও দুয়েকটি উজ্জ্বল ছেলে বেরিয়ে আসে পৃথিবীর যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছেলে প্রশংসিত হবে। কিন্তু সেজন্য গৌরবের অধিকারী নয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। উপর দিককার দুয়েকটি ছেলে-কোনও অব্যবস্থাই যাদের প্রতিভাকে বিনষ্ট করতে পারে না-তাদের ছাড়িয়ে গেলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অজন্মা চোখে পড়ে তা দিয়েই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার হবে।

আমরা শিক্ষকেরা যে এ ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত এমন মনে হয় না। আমাদের শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা বার বার বেতন বৃদ্ধি দাবি করেছি। সে দাবি ন্যায্য। কিন্তু এর বাইরে আমরা কতটুকু করেছি? বেতন বাড়াবার আন্দোলনে আমরা যে উৎসাহ

www.pathagar.com

দেখিয়েছি শিক্ষা অথবা পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে তার এক-দশমাংশও কি কখনও দেখা গেছে? আমাদের সরল যুক্তিটা এই, বেতন না বাড়ালে প্রতিষ্ঠানে ভালো লোক আসবেন না, কাজেই শিক্ষার মানের উন্নতি হবে না। কিন্তু এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাঁরা পড়াচ্ছেন তাঁরা অনেকেই কোনও একদিন কৃতী ছাত্রই ছিলেন। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার গুণে তাঁদের জ্ঞান বদ্ধ জলাশয়ের মতো কিছুদিনের মধ্যে পচতে শুরু করে। আমরা ভালো লোক খানিকটা ভালো মাইনে দিয়ে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনতে পারি, কিন্তু তারপর তাঁদের অধঃপতন রোধ করবার জন্য কি করছি?

অধিকাংশ শিক্ষক দশ বছরের ভিতর নিজ নিজ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের অনেকটা পিছনে পড়ে যান। দর্শন, গণিত, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পিছিয়ে পড়াটা একবার শুরু হলে কারও একক চেষ্টায় সেটা রোধ করা অনেক সময় কঠিন। কিন্তু অধঃপতন বন্ধ করবার অন্য নানা উপায় আছে। একটি উপায় হল অধ্যাপকদের জন্য নিয়মিত পূজোর ছুটিতে অথবা গ্রীষ্মাবকাশে শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করা। শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান থেকে এ বিষয়ে উৎসাহ নেই। অথচ শিক্ষকেরা নিজেদের ক্রমাগত শিক্ষিত করে তুললে যে জ্ঞান তাঁরা বিতরণ করবেন সেটা বিতরণের অযোগ্য হয়ে উঠবেন, এবং সেই অযোগ্য শিক্ষার নামে সমাজের কাছে বর্ধিত পারিশ্রমিক দাবি করতেও বিবেকবান শিক্ষকের একটা সংকোচ বোধ করা উচিত।

কিছুদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিষ্ঠাবান অধ্যাপক বিভিন্ন কলেজের সম্বন্ধে একটি বিশেষ সাল ধরে (১৯৬২-'৬৩) কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। সত্তরটি শিক্ষায়তন থেকে সংগৃহীত উত্তরে প্রকাশ যে, অধিকাংশ (দুই-তৃতীয়াংশ) কলেজে বছরে অর্ধেক দিন ক্লাস হয়নি। এই বার মাসে তের পার্বণের দেশে খুচরো ছবিগুলো যথাসম্ভব তুলে দেওয়া দরকার। এটা শুধু ছুটি কমাবার প্রশ্ন নয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক একটা দীর্ঘ অবকাশের প্রয়োজন আছে; কিন্তু কাজের তালে আধুনিকতার স্পন্দন জাগাবার জন্যও খুচরো ছুটি ছাটাই আবশ্যক। এই দাবি ছাত্র ও শিক্ষকদের ভিতর থেকে আসা উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা উপরে বলেছি। যেমন পুরনো বিদ্যার বদ্ধ জলাশয়ে নতুন চিন্তা ও বিচারের স্রোত প্রবাহিত করার জন্য পড়াবার পদ্ধতি ও পরীক্ষার ব্যবস্থা এই দুইয়েরই পরিবর্তন আবশ্যক। পরীক্ষা আরও ঘন ঘন না হলে ছাত্রদের পরিশ্রমী ও জ্ঞানান্বেষণে সতর্ক করে তোলা যাবে না। কিন্তু এই সব সংস্কারের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উদাসীন। সংস্কারের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনটা যাঁরা বোঝেন না প্রশাসনগত অসুবিধাগুলোই তাঁদের চিন্তায় পরিবর্তনের বিপক্ষে বিরাট মুক্তি হয়ে দাঁড়ায়। একটি ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। বি এ-র তুলনায় এম-এ পরীক্ষার সংস্কারসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। দু-বছরের শেষে আর একটি, এইভাবে দু-ভাগে পরীক্ষা নেওয়া এমন কিছু দুঃসাধ্য কাজ নয়। এই পরিবর্তনটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকেরা নানা কারণে গ্রহণ করতে পারেননি। অর্থনীতি বিভাগ থেকে এর সপক্ষে অভিহিত শোনা যায়। ঘরোয়া আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় কর্তাব্যক্তিকে আমি বলি যে, অন্তত অর্থনীতি বিভাগে পরীক্ষা ব্যবস্থার এই সংস্কারটুকু চালু করবার অনুমতি দেওয়া হোক। আমার সে আবেদন সমর্থন লাভ করেনি। যে কোনও পরিবর্তনই সমস্ত বিভাগের একসঙ্গে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে, প্রশাসনকর্তা এবং বর্তমান ব্যবস্থার সমর্থকদের কাছে এটা যেন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই মতৈক্যের বেড়া ডিঙিয়ে কোনও পরিবর্তন সাধনই দুষ্কর, এ কথাটা সংস্কারের প্রয়োজন যাঁরা বোঝেন তাঁদের কাছে অত্যন্ত

www.pathagar.com

পরিষ্কার। আসলে আমরা মুখে যাই বলি–না কেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রয়োজনটাই আমাদের ভাবনায় তেমন গভীরভাবে ঢোকেনি। তাই আমাদের কলহ ও দুশ্চিন্তা ছোট ব্যাপার নিয়ে, পরীক্ষা কেন্দ্রে আর একটু শান্তি, কোর্সটা কোনও রকমে শেষ করবার ব্যবস্থা, আর কয়েকটা নম্বর, অবশেষে যোগ করে আরও কয়েকজনকে পাশ করিয়ে দেওয়া অথবা না দেওয়া।

আমরা শিক্ষকেরা এ কথাটা কবে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করব যে, স্বাধীনতার পর গত বিশ বছরে আর কিছুতেই দেশে এত বড় ক্ষতি হয়নি যতটা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিতে; আগামী বিশ বছরে আর কিছুতেই হয়ত এতটা উন্নতি সম্ভব নয় যতটা সম্ভব শিক্ষা ব্যবস্থার সুচিন্তিত, বলিষ্ঠ সংস্কারের; এবং শিক্ষার এই সংস্কারের শিক্ষকদেরও কিছু কর্তব্য আছে।

এদেশে সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজ গড়তে হলে একই সঙ্গে চাই প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার এবং উচ্চশিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধন। এর একটিকে ছেড়ে অন্যটির প্রতি পক্ষপাত দেখানো ভুল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ছাড়া দেশের জড়ত্ব ভাঙবে না। আবার উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি ও গুণগত পরিবর্তন ছাড়া দেশের দিকভ্রষ্টতা ঘুচবে না, দেশের জাগ্রত–শক্তি খোকামি আর ক্ষ্যাপামিতে নিজেকে ক্লান্ত করবে, ভবিষ্যতকে করবে বিপন্ন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলব। শিক্ষায়তনের ভিতর থেকেই শুধু শিক্ষার স্থায়ী উন্নতি সম্ভব। ব্রিটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাকে বিশেষ মূল্য দিতে আমরা শিখেছিলাম কয়েকজন অসামান্য শিক্ষাব্রতীর নির্ভীক নেতৃত্বে। আজ কারও কারও মুখে শোনা যায়, যে–সরকার জনগণের প্রতিনিধি তার হস্তক্ষেপে দোষ নেই। এটা ভুল ধারণা। শিক্ষা ও রাজনীতির প্রকৃতি ভিন্ন। দলীয় রাজনীতির প্রয়োজনে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে শিক্ষার চরিত্র নষ্ট হয়। শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারে সরকারি দাক্ষিণ্য আবশ্যক; কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাব্রতীদের রাজনীতিক নির্দেশ ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল করে তুললে তাতে শিক্ষার স্থায়ী ক্ষতিসাধনই সম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা : আমাদের দায় ও কর্তব্য

সালাহউদ্দীন আহমদ

উচ্চশিক্ষার সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। বস্তুত উচ্চশিক্ষা নিম্নস্তরের শিক্ষা,অর্থাৎ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। যদি নিম্নস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে উচ্চশিক্ষাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশও শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও এখন এক অশান্ত, অনিশ্চিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এর প্রধান কারণসমূহকে এইভাবে চিহ্নিত করা যায় : সীমাহীন দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা, ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস এবং পরমতসহিষ্ণুতার অভাব, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস, কৃষি, শিল্পবাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতা এবং পরিশেষে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে জাতীয় সমঝোতা বা ঐকমত্যের অভাব। এই পরিস্থিতির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যে কারণে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন সেগুলো হল : দারুণ অর্থাভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, বইপত্র ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, শিক্ষার্থীদের আচরণের মধ্য দিয়ে নিয়ম ও শৃঙ্খলাবোধের অভাব এবং পড়াশুনার চেয়ে দলীয় রাজনীতির প্রতি বেশি আকর্ষণ, শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ও কোন্দল, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং বহিরাগত শক্তির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।

প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আকারে অসুদপায় অবলম্বন করার প্রবণতা এবং এর জন্য শত শত পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার ও এর ফলে ব্যাপক গোলযোগ, বোর্ড এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেট নিয়ে রমরমা ব্যবসা–এসব তো কোনও সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। অথচ এই হল বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের চালচিত্র।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ড. কুদরাত–এ–খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। দু–বছর পর ১৯৭৪ সালের মে মাসে কমিশন তার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশমালার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য :

১ দেশের কলেজসমূহের অবস্থা এবং সেগুলোর শিক্ষার মান নির্ণয় করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

২ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক কর্মসূচি প্রণয়নের সময় দেশের মৌলিক সমস্যার কথা বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত।

৩ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কলা ও বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যসূচি বা পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য আগাগোড়া সংশোধন করা প্রয়োজন।

৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। মেধা এবং যোগ্যতাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মাপকাঠি।

৫ প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রম কলা ও মানবিকী সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা বাঞ্ছনীয়।

৬ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল এবং কারিগরি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়সমূহ শিক্ষাদান করা উচিত।

৭ উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক–এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিভাগ খোলা প্রয়োজন।

৮ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিকেতনের আশপাশে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে।

৯ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণাকর্মের ওপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কলেজসমূহেও গবেষণার জন্য সুযোগ–সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

১০ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব বহুবিধ সমস্যা থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের তত্ত্বাবধান করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য কমিশন সুপারিশ করে যে, কলেজসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে মুক্ত করে প্রয়োজনবোধে সময়মতো কয়েকটি প্রধান কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত করা যেতে পারে।

কুদরাত–এ–খুদা কমিশন রিপোর্ট সরকার কর্তৃক বিবেচনাধীন থাকাকালীন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। পরবর্তী সরকারের আমলে অবশ্য প্রধানত রাজনৈতিক স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল; কিন্তু এগুলো ছিল নেহাত ভাসা–ভাসা। এগুলোর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও মৌলিক বা গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে কমিশনের সুপারিশমালা অনুযায়ী একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে–যেটা বলা যেতে পারে মোটামুটি সুচারুভাবে চলছে। তাছাড়া কলেজগুলো নিয়ে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার কার্যক্রম এখনও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারিনি। আঠারো শতকের শেষের দিকে ইংরেজরা যখন এদেশে তাদের প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল তখন তারা এদেশে তাদের নিজস্ব ভাষা ও আইনকানুন প্রবর্তন করতে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। বরং তারা এদেশের প্রচলিত ঐতিহ্যিক ব্যবস্থাকেই বেশ কিছুকাল ধরে টিকিয়ে রেখেছিল। এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার কর্তৃক স্থাপিত প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি হল কলকাতা মাদ্রাসা। কলকাতার মুসলমানদের অনুরোধক্রমে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে এটি স্থাপন করেন। এর দশ বছর পর বেনারস

www.pathagar.com

সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ইংরেজ শাসকরা এদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোতুষ্টি সাধন করতে চেয়েছিল। অবশ্য কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি বাস্তব কারণ ছিল। যেহেতু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কাজে তখনও ফারশি ভাষার প্রচলন ছিল, এই দুই বিভাগের নিম্নস্তরের পদসমূহের জন্য ফারসি ভাষায় জ্ঞানসম্পন্ন যথেষ্টসংখ্যক এদেশীয় লোক নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। একটি সমকালীন সূত্র অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৮৩৫ সাল নাগাদ কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষিত কমপক্ষে দুশো মুসলমান যুবক কোম্পানির সরকারের অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত ছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা যায়। মুসলমানদের অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ঘোর বিপক্ষে ছিল। তাদের মধ্যে এই ভয় বদ্ধমূল ছিল যে, এদেশে যদি ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করা হয় তাহলে এর ফলে এদেশের লোক নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করবে। অপরদিকে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত বাস্তবমুখি এবং অনেকটা যুক্তিবাদী। তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, নতুন শাসক ইংরেজদের ভাষা শিখতে পারলে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। স্মর্তব্য যে, দীর্ঘ মুসলিম রাজত্বকালে হিন্দুরা সে-আমলের রাজভাষা ফারসি ভাষা আয়ত্ত করে নানাদিক দিয়ে লাভবান হয়েছিল। অনেক হিন্দু আরবি ভাষাও শিখতে দ্বিধা করেনি। আরবি-ফারসি শিখে হিন্দুরা তাদের হিন্দুত্বকে এতটুকু বিসর্জন দেয়নি। বস্তুত হিন্দুদের মধ্যে ফারসি-আরবি চর্চা উনিশ শতক পর্যন্ত ছিল। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮০৩-১৮০৪ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ "তুহ্ফাত-উল-মুহাহ্হীদ্‌দীন" আরবি শিরোনাম ও ভূমিকাসহ ফারসি ভাষায় রচিত।

এদেশে ইংরেজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দুরা পরিবর্তিত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষা এবং সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভর না করে কলকাতার বেশ কিছুসংখ্যক বিত্তশালী হিন্দু নিজেরা চাঁদা তুলে ১৮১৭ সালে কলকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। এই ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করেন কলকাতার কতিপয় উদারমনা ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষাদান করা ছিল হিন্দু কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুত হিন্দু কলেজের মাধ্যমে তৎকালীন হিন্দু সমাজের তরুণেরা কেবল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, সমকালীন ইউরোপের উদার ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচিত হতে শুরু করে এবং এর ফলে কলকাতার হিন্দুসমাজে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকের হিন্দুসমাজে সংস্কার আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন একসময় হিন্দু কলেজের ছাত্র। বস্তুত ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজ বহুগুণে সঞ্জীবিত হয়েছিল। এই নব্যশিক্ষিত হিন্দুশ্রেণী বাংলাভাষার চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উৎসাহী ছিল। হিন্দুসমাজের এই নতুন শিক্ষা আন্দোলন দ্রুত শহর থেকে ক্রমে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু সামান্য রূপভেদ থাকা সত্ত্বেও বাংলাভাষা ছিল নগরবাসী শিক্ষিত হিন্দু এবং গ্রামাঞ্চলের হিন্দু জনসাধারণ উভয় শ্রেণীর ভাষা, সে কারণে তাদের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে নতুন চিন্তাধারার প্রসার সহজতর হয়েছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলার মুসলমানদের ব্যাপারে অবস্থাটা ছিল ভিন্ন। আঠারো শতকে মুসলিম রাজশক্তির অবক্ষয় এবং পতনের ফলে মুসলমানরা তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল বলা যায়। ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু থাকা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল রাজশক্তির বলে সমাজের নেতৃত্ব ছিল তাদেরই হাতে। কিন্তু সেই রাজশক্তি যখন হাতছাড়া হয়ে গেল তখন সেই শক্তির ওপর ভিত্তি করে যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো দাঁড়িয়েছিল সেটাতেও ভাঙন দেখা দিল। কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত সেই ভগ্নপ্রায় কাঠামোকে ইংরেজ সরকার এদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করার ফলে কৃত্রিম উপায়ে টিকিয়ে রেখেছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার এদেশের প্রশাসনের ক্ষেত্রে কোনও বড় রকমের পরিবর্তন আনতে বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাই দেখা যায় যে, পুরাতন মুসলমান আমলের বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে কিছুটা রদবদল করে চালু রাখা হয়েছিল। মুঘল যুগের রাজভাষা ফারসিকে তার বিশেষাধিকার প্রাপ্ত আসনে বহাল রাখা হয়েছে। এসব কারণে মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে অলীক ধারণা এবং মিথ্যা দম্ভ প্রশ্রয় লাভ করেছিল। অথচ এর বিপরীতে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত বাস্তবমুখি। তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, কোন্ দিকে হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং সেই অনুযায়ী তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল।

অন্যদিকে মুসলমানদের আচরণ ছিল নির্লিপ্ত, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক। পাশ্চাত্যের নব-নব চিন্তাধারা যার প্রভাবের ফলে এদেশে সুদূরপ্রসারী বিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী, তার গুরুত্বকে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান অনুধাবন করতে পারেনি। তারা যেমন ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের প্রতি অনীহা দেখিয়ে এসেছে, তেমনি বাংলাভাষা চর্চার ব্যাপারেও অবহেলা প্রদর্শন করেছিল। ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কর্তৃক ঘোষিত নয়া শিক্ষানীতির ফলে মুসলমানদের অবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই নীতির ফলে ইংরেজি ভাষাকে উচ্চশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম করা হয়। ১৮৩৭ সালে বিচার বিভাগ থেকে ফারসি ভাষার প্রচলন তুলে দেওয়া হয়। ঠিক হয় যে উচ্চ আদালতের ভাষা হবে ইংরেজি এবং নিম্ন আদালতে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করা যাবে। এই পরিবর্তনের জন্য হিন্দুরা তো প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মুসলমানরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না; ফলে তারা হয়েছিল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

কলকাতা হিন্দু কলেজ যেমন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার হিন্দুসমাজ রেনেসাঁর সূত্রপাত করেছিল, তেমনি আলীগড় কলেজও উনিশ শতকের শেষের দিকে উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করে।

বাংলার আবদুল লতিফ কিন্তু সেরকম বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পারেনি। এদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা ছিল দুর্বল। তিনি এ ব্যাপারে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু সৈয়দ আহমদ খানের মতো ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের জন্য কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেননি। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সোসাইটি ১৯৬৩ সালে আবদুল লতিফের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বক্তৃতা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য বিতরণ করা। আবদুল লতিফের কলকাতার বাসভবনে প্রতিমাসে সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বক্তৃতা বা আলোচনা সভার আয়োজন

www.pathagar.com

করা হত। উল্লেখ্য যে, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির সভায় যে বক্তৃতাগুলো দেয়া হত সেগুলো বাংলায় দেয়া হত না। অথচ বাংলার সাধারণ মুসলমান জনগণের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। তাই দেখা যায় যে, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির কার্যকলাপ ও প্রভাব কেবল মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণী উর্দুভাষী এবং নগরবাসী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বস্তুত আবদুল লতিফের সমাজচিন্তা ছিল রক্ষণশীল। পুরাতন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য ছিলেন ঘোর সমর্থক। অন্যদিকে আবদুল লতিফের সমসাময়িক কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রগতিশীল মুসলিম নেতা যেমন সৈয়দ আমির আলী ও দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখ মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিয়ে তার স্থলে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য দাবি উত্থাপন করেছিলেন। তাদের মতে মান্ধাতার আমলের মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক যুগের প্রয়োজন মেটাতে মোটেই সক্ষম নয়।

বস্তুত একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ রেভারেন্ড ড. মিল যিনি কলকাতা মাদ্রাসার গণিত বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন, ১৯২৬ সালে এই মন্তব্য করেন যে, মাদ্রাসায় আরবি ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়সমূহে যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছিল সেটা হাজার বছরের পুরনো এবং তার স্থান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক পিছনে। তার মতে প্রাচ্যের সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে মেধার বিকাশ সম্ভব নয়। উনিশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ১৮৮২ সালে সৈয়দ আমির আলী বিলেত থেকে প্রকাশিত The Nineteenth Century পত্রিকায় এই প্রস্তাব করেন যে, মাদ্রাসাগুলো তুলে দিয়ে এগুলোর জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তাই দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। এই ধরনের মতকে জোরালোভাবে সমর্থন করে আর একজন মুসলমান নেতা দেলওয়ার হোসেন আহমদ, যিনি ছিলেন সারা ভারতের প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট (তিনি ১৮৬১ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ করেন)। তিনিও মাদ্রাসাগুলো তুলে দিয়ে ঐগুলোর জায়গায় ইংরেজি এবং অন্যান্য আধুনিক বিষয়সমূহে শিক্ষাদানের উদ্দেশে কলকাতা এবং অন্যান্য শহরে মুসলমানদের জন্য নতুন স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেন। দেলওয়ার হোসেনের মতে মাদ্রাসাগুলোতে যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছিল সেটা ছিল যুগের প্রয়োজন মেটাতে একেবারেই অক্ষম। দেলওয়ার হোসেন মুসলমানদের প্রতি জোরালোভাবে আহ্বান জানান যেন তারা অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে বাংলাভাষার চর্চা করে। তিনি বলেন যে, মুসলমান অভিজাতশ্রেণী বাংলাভাষার প্রতি এতদিন যে অবহেলা প্রদর্শন করে এসেছে তার ফলে বাঙালি মুসলমানরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে কালে বাংলার মুসলিম অভিজাত শ্রেণী যাদের বলা হত আশরাফ তারা নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করত। তাদের ভাষা ছিল উর্দু এবং বাংলাভাষাকে নিম্ন শ্রেণীর (আতরাফ) ভাষা বলে একে অবজ্ঞার চোখে দেখত। ফলে নগরবাসী মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণের পার্থক্য অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। দেলওয়ার হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সকল বাঙালি মুসলমানকে উর্দু বাদ দিয়ে বাংলাকেই নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি মনে করতেন যে, একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণ সহজে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। যেহেতু সকলের পক্ষে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। দেলওয়ার হোসেন প্রস্তাব করেছিলেন যে : বিজ্ঞান, দর্শন এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইগুলো বাংলা ভাষায় তর্জমা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এভাবেই পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল চিন্তাধারা জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করতে পারে।

www.pathagar.com

ইংরেজ সরকার অবশ্য আমির আলী ও দেলওয়ার হোসেনের প্রগতিশীল মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে মাদ্রাসাগুলোকে টিকিয়ে রাখার সপক্ষে আবদুল লতিফের রক্ষণশীল মতকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উল্লেখ্য, বাংলার মুসলমানরা ছিল অধিকাংশই রক্ষণশীল। সুতরাং সরকার এমন কোনও পদক্ষেপ নিতে চায়নি যার ফলে মুসলমান সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাই এদেশে দুটি সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা–একটি আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং দ্বিতীয়টি পুরাতন ঐতিহ্যিক মাদ্রাসা ব্যবস্থা চালু থেকে যায় এবং দীর্ঘ একশ' বছর পরেও সেই অবস্থা এখনও বিরাজ করছে। ১৮৮২ সালের স্যাডলার কমিশন, ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশন এবং পরিশেষে ১৯৭৪ সালের কুদরাত–এ–খুদা কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে একে আধুনিক, সাধারণ এবং যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এমনকি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত নতুন শিক্ষা কমিশনও এ বিষয়ে কোনও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কীনা জানি না। কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন সেটা আমাদের নেতৃত্বে অনুপস্থিত।

আমাদের দেশ এত চড়াই–উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে এসেছে, অথচ আজও দুটি বিপরীতমুখী শিক্ষাব্যবস্থা এখানে সমান্তরালভাবে বিরাজ করছে। আমি মনে করি এখানেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা। একজন মক্তব–মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের মন ও মানসিকতার সঙ্গে একজন স্কুল–কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের মন ও মানসিকতার সাদৃশ্য থাকবে কী করে? এই প্রবহমান দ্বন্দ্বের প্রতিফলন আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখা যায়। এর থেকে উদ্ভূত বিভ্রান্তির কারণে আমাদের দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

অতএব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাববার আগে একটা ঐকমত্যে পৌঁছানো দরকার যে, আমরা কোন্ ধরনের শিক্ষায় নিজেদের বা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষিত করে তুলতে চাই। বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এক, সমরূপ এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষে দেশে জাতীয় ঐক্যমত্য গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

আগামী একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য যুগের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। কুশিক্ষা অশিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। আমরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চাই যেটি মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে, মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হবে। আমি এ কথা বলব না যে, মাদ্রাসাগুলো তুলে দেয়া হোক। আমার প্রস্তাব হল আমাদের মাদ্রাসাগুলোকে বিগত মধ্যযুগীয় আবর্ত থেকে উদ্ধার করে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যেতে পারে। ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সকল ধর্মের সর্বজনীন নীতিমালা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে উপদেশগুলো মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্যান্য বিষয়গুলোর সঙ্গে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

জ্ঞানের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় অনুবাদ সংস্থা স্থাপন করা আশু প্রয়োজন। এর কাজ হবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। এই প্রক্রিয়ার ফলে উন্নত বিশ্বে জ্ঞান–বিজ্ঞান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বাংলাভাষার মাধ্যমে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীর নিকট

www.pathagar.com

পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। এর ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব। উনিশ শতকের শেষের দিকে জাপানের আধুনিককীকরণ এবং অভূতপূর্ব অগ্রগতি এই পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সাধিত হয়েছিল।

শিক্ষক হিসেবে আমার প্রায় পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে পৃথিবীর যে কোনও উন্নত দেশের ছেলেমেয়েদের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, রাষ্ট্র ও সমাজ তাদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা দিতে নারাজ কিংবা দিতে অক্ষম। এর ফলে আমাদের মানব সম্পদের উন্নয়ন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং বহিরাগত মাস্তানদের, বিশেষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশকে দূষিত করে রেখেছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নিজেদের দলীয় বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করার প্রবণতা শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা বিনষ্ট করতে সাহায্য করেছে। আগে অবস্থা এতখানি খারাপ ছিল না।

পরিশেষে একটা অপ্রিয় কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ গোটা দেশের পরিবেশ থেকে আলাদাভাবে দেখা যায় না।

পরিবেশ তো মানুষের সৃষ্টি। অর্ধশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত এবং দুর্নীতিবাজ মানুষ আজ আমাদের সমাজে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এরাই তো বর্তমান দূষিত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী। সুতরাং এই পরিবেশ বদলাতে হলে জাতীয় ক্ষেত্রের সকল স্তরে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। এই নেতৃত্ব হতে হবে জ্ঞানদীপ্ত, সৃজনশীল, মানবতাবাদী, দূরদর্শী এবং মহৎ ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী। আমরা কি এই আশা করতে পারি না যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্য দিয়েই এই ধরনের নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটবে।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার–সমস্যা

শামসুল হক

পৃথিবীব্যাপী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সমস্যার প্রকৃতি বিভিন্ন। এসব সমস্যাগুলো হচ্ছে :

১ শিক্ষার এবং বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি;

২ উচ্চশিক্ষার ব্যয় আর্থিক ও সামাজিক ব্যয়–বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নিচের স্তরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক চাহিদা, ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানা কারণে উচ্চশিক্ষা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র ভর্তির চাপ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া;

৩ শিক্ষার উচ্চস্তরের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা প্রাথমিক স্তরের ছাত্রসংখ্যা ছাড়িয়ে যায় এবং উচ্চস্তরের ছাত্রের মাথাপিছু গড় সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ পূর্ববর্তী স্তরসমূহের যে কোনও ছাত্রের মাথাপিছু সরকারি গড় ভর্তুকির পরিমাণের চেয়ে বেশি ;

৪ যে হারে ছাত্ররা উচ্চশিক্ষায় কৃতকার্য হচ্ছে, সে হারে দেশের মধ্যে তাদের কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না, ফলে শিক্ষাব্যবস্থার উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৫ উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হচ্ছে না, অবনত হচ্ছে;

৬. সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে এবং ব্যক্তিজীবনের প্রসারমান উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না;

৭ কর্মজীবনে যে যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সে–যোগ্যতা ও দক্ষতা যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে অর্জনের সুযোগ মেলে না;

৮ ছাত্র ভর্তির নীতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতার উপর আস্থা শিথিল হয়ে আসছে;

৯ মানুষের জ্ঞানের পরিধি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে বিস্তৃত হচ্ছে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক ও বিষয়সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে না;

১০ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দূরে বসবাসরত অথবা আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথবা কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও নিজ নিজ অবস্থান ও বৃত্তি বজায় রেখে উচ্চশিক্ষা

www.pathagar.com

গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছেন, কিন্তু প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা তাদের বিশেষ কোনও সুবিধা দিতে পারছে না;

১১ শিক্ষা অবকাঠামোর বিস্তৃতির ফলে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জটিলতা বাড়ছে, কিন্তু প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকগণ পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাবে কর্মদক্ষতায় সার্থক হচ্ছে না;

১২ ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও বহিঃস্থ বিভিন্নমুখি কার্যকারণের টানাপোড়েনের মধ্যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বাড়ছে।

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশীদার হচ্ছে ডিগ্রি কলেজগুলো। সরকারি, বেসরকারি, সবল, দুর্বল নানা শ্রেণীর ডিগ্রি কলেজে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজগুলোর সংখ্যা এবং সেগুলো থেকে উত্তীর্ণ স্নাতক সংখ্যা যতদিন কম ছিল ততদিন এগুলোর কার্যকরতা বা ফলপ্রদতা নিয়ে কেউই বিশেষ মাথা ঘামায়নি-যদিও বেসরকারি দুর্বল কলেজসমূহের দুর্বলতা অজ্ঞাত বা অপ্রকাশ ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে যখন কলেজের ছাত্র সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়-যখন বেকারত্ব, হতাশা, অসন্তোষ ও তার সহিংস প্রকাশ বিস্তার লাভ করতে থাকে- তখনই কেবল সমাজ-সচেতন ব্যক্তিদের সৃষ্টি ও মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয়। চিকিৎসা, প্রকৌশল, অর্থনীতি এবং পদার্থবিদ্যা ও গণিত প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করলে কর্মসংস্থানের ও উপার্জনের আকর্ষণীয় সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে-এই সম্ভাবনার ফলে মেধাবী ছাত্ররা ঐসব বিষয়ে ভর্তির জন্য ভিড় করতে থাকে। অন্যদিকে, গড়পড়তা ছাত্রদের ঐসব বিষয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা বা কলেজে ভর্তি না হয়ে কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ না থাকায় তারা দলে দলে সাধারণ স্নাতক ডিগ্রির প্রত্যাশায় কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা নামক সোনার হরিণ শিকারে প্রবৃত্ত হয়-ফলে উচ্চশিক্ষার মান বোধগম্য কারণেই নিম্নমুখি হয়ে পড়ে।

কলেজের সংখ্যা বেড়েছে, স্নাতকসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু কলেজ শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে। ফলে, কলেজগুলোর মর্যাদা ও সেগুলোর অবদানের গুরুত্ব খর্ব হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। কলেজে ছাত্রের জন্য মাথাপিছু সরকারি অনুদান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের জন্য মাথাপিছু অনুরূপ অনুদানের প্রায় ১৫ ভাগের একভাগের মতো। এ পরিস্থিতিতে দুর্বল বেসরকারি কলেজের পক্ষে শিক্ষার মান উন্নত করা বা উন্নত রাখা অসম্ভব। এক বছর আগে কাছাকাছি অবস্থিত একাধিক দুর্বল কলেজকে একত্র করে নিজ শক্তিতে টিকে থাকার মতো একেকটি সবল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা চলেছিল। সে চেষ্টা সফল হয়নি। আইনগত জটিলতা, স্থানীয় বিরোধিতা এবং রাজনৈতিক চাপের কারণেই তা ব্যর্থ হয়। ছাত্রসংখ্যা যেমন বেড়েছে পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের স্থূল সংখ্যাও তেমন বেড়ে চলেছে। এই জটিল অবস্থার কারণসমূহও জটিল যার মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার উচ্চস্তরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পদ্ধতির অসাফল্য, নিয়োজিত মূলধনের অপর্যাপ্ত ব্যবহার, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং শিক্ষাব্যবস্থার নিজস্ব দুর্বলতা।

শিক্ষা ব্যবস্থার নিজস্ব দুর্বলতা বহুবিধ-অভ্যন্তরীণ স্ব-নিয়ন্ত্রণহীনতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরও আর্থিক অনটন। কলেজে প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্রবেতন বৃদ্ধির অপারগতার কারণে নির্বিচারে ছাত্র ভর্তি, আসবাবপত্র, বইপুস্তক, যন্ত্র সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব, এমন কি সকল শিক্ষকের দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার অপর্যাপ্ততা-এগুলোই শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে। দুর্বলতার একটি প্রকট

www.pathagar.com

লক্ষণ, স্নাতক পাস কোর্সের পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যায় অকৃতকার্যতা। এ প্রসঙ্গে স্নাতক সম্মান কোর্সের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান কোর্স সামাজিক সম্মানের প্রতীক এবং সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রির বাজার দর বেশি। ঠাঁই নেই বলে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান কোর্সে ভর্তি হতে পারে না, তারা হয় কলেজের সম্মান কোর্সে ভর্তি হয়, নয়ত সম্মান কোর্স নিকটবর্তী কলেজে নেই বলে পাস কোর্সে ভর্তি হয়। এ সব ছাত্রের সকলেই মেধা ও যোগ্যতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান কোর্সের সকল ছাত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট না হলেও নিকৃষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যে সব কলেজে নির্বাচিত বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু আছে সেসব কলেজের অনেকগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক, গ্রন্থাগার বা গবেষণাগার নেই এবং তা সত্ত্বেও অবস্থার চাপে সম্মান কোর্স প্রবর্তন করতে হয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে পাশ কোর্সের ইংরেজি বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু সম্মান কোর্সের জন্য তা ছিল না। ফলে অনেকেই ইংরেজির ভয়ে পাশ কোর্সের পরিবর্তে সম্মান কোর্সে ভর্তি হয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সম্মান কোর্সের পাশের হার শতকরা এক শতের কাছাকাছি, কিন্তু পাশ কোর্সের পাশের হার নৈরাশ্যজনকভাবে শতকরা ২৫–৩৫ এর মধ্যে। এসব দুর্বলতা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে নানা মত, নানা পথ, নানা দল–উপদল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন যাঁদেরকে এমন অসাধারণ করিৎকর্মা বিবেচনা করা হয় যে একই ব্যক্তিকে একাধারে শিক্ষক, গবেষক, প্রশাসক, নীতিনির্ধারক এবং কোনও কোনও সংগঠনের অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। ছাত্রদের মধ্যে দল ও মতের কোনও কমতি নেই। দেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কাজ করে দলগত ও সাংগঠনিকভাবে যে সব ছাত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান, তাঁরা শিক্ষা পরবর্তী জীবনে ক্ষমতা, মর্যাদা ও বিত্তের অধিকারী হন। দেশ ও দলের নেতৃবৃন্দ শিক্ষাজীবনে ছাত্রদেরকে রাজনীতি থেকে দূর থেকে কেবল জ্ঞানবিদ্যা চর্চায় একাগ্র হতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছাত্র–রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতাও করে যাচ্ছেন। কেবল আদর্শের রাজনীতি করার জন্যই একালের সকলে ছাত্র রাজনীতি করছেন বলে মনে করার কারণ নেই। যৌবনের উত্তেজনা, কিছু একটা করার মাধ্যম এবং সম্ভবত কিছু জাগতিক লাভও রাজনীতির তৎপরতার সাথে যুক্ত।

এই চিত্রটি দেশের সাধারণ আর্থ–সামাজিক চিত্র থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়–ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত কলেজ আছে। কলেজের শিক্ষাক্রম নির্ধারণ এবং পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ সব দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালনে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকৃতই অসমর্থ। সরকারি, বেসরকারি, সবল, দুর্বল কলেজে স্নাতক পাশ কোর্স, স্নাতক সম্মান কোর্স এবং স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা, শিক্ষক, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার প্রভৃতির অপর্যাপ্ততা থাকা সত্ত্বেও ঐ সব কলেজের অনুমোদন রোধ বা প্রত্যাহার করা নানা কারণে অসম্ভব। পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি আরও নাজুক। পরীক্ষা সংক্রান্ত অব্যবস্থা ও কেলেঙ্কারির কথা কম বললেই লজ্জাবোধ খানিকটা কম থাকে। সম্প্রতি কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত কোর্স পদ্ধতি পরীক্ষার অব্যবস্থা দূর করতে পারেনি।

প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন (?) হওয়ার প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক স্তরে এবং তার ফলে উচ্চস্তরে ছাত্রভর্তির চাপ বাড়বে বই কমবে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং পনেরো বৎসর পর্যন্ত

www.pathagar.com

বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক হওয়ার কারণে মাধ্যমিক স্তরের উপরে যে চাপ পড়ছে এবং পড়তে থাকবে তার একটা অংশ মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষার উচ্চস্তরে অবশ্যই এসে পড়বে। বড় চাকরির জন্য উচ্চ যোগ্যতা প্রয়োজনীয় বলে উচ্চ থেকে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের অভিপ্রায় অব্যাহত থাকবে। তার পরেও, যেহেতু অনেকের জন্যই উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে না এসে লাভজনকভাবে করার মতো অন্য কোনও কাজ নেই এবং যেহেতু উচ্চশিক্ষা এখনও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক, সেহেতু অনেককেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত করা যাবে না। যাচাই করে অল্পসংখ্যক মেধাবী ছাত্র ভর্তি করলে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভিড় কমবে এবং তা করণীয়–এমন একটি ধারণা কোনও কোনও মহলে প্রচলিত এবং সরকারি দলিলপত্রেও এমন একটি কৌশলের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু, একালে কেবল একটি বিশেষ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা শ্রেণীর জন্য কিংবা নির্বাচিত কতিপয় ব্যক্তির জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা অগণতান্ত্রিক এবং সর্বসাধারণের অধিকার সঙ্কোচন করা বলেই গণ্য করা হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারণ করা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। 'নিরঙ্কুশ জ্ঞান সাধনার জন্যই উচ্চশিক্ষার অনুশীলন'–এ আপ্ত বাক্যটি এখন আর ধোপে টিকছে না। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, যে শিক্ষা জীবনের ও জীবিকার দাবি মেটাতে পারছে না, তেমন উচ্চশিক্ষা নামক মায়ামৃগ ধরার চেষ্টায় যে সময়, অধ্যবসায় ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে–সেই আকাঙ্ক্ষিত মৃগটি ধরা গেলেও তার মূল্য অনেকের কাছেই অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হচ্ছে। সময়, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয়ের সঙ্গে শ্রম, উপার্জনহীনতা ও সহিষ্ণুতার মূল্য যোগ করলে চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলতে বোধ হয় হতাশা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

কোনও বিশেষ সময়ে কোনও বিশেষ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করার একটা বড় রকমের অন্তর্নিহিত অসুবিধা আছে। সেটি এই যে, অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য সংস্কার প্রস্তাব করা হয়। নানা আলোচনা–পর্যালোচনা, বিচার বিবেচনার পর যখন সংস্কার–কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তখন বেশ বিলম্ব হয়ে যায়। সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে সমাজের প্রেক্ষিত ও প্রয়োজন অনেকখানি বদলে গেছে এবং প্রস্তাবিত সংস্কার তখনকার সময়ের সব চাহিদা পূরণ করতে পর্যাপ্ত মনে হচ্ছে না। মানুষের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টির উপর নির্ভর করা ব্যতীত উন্নততর কোনও পন্থা এখনও অনাবিষ্কৃত, অর্থসম্পদের অনটন তো আছেই। একথা বহুবার নানাভাবে বলা হয়েছে যে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা জীবনের সাথে, কর্মের চাহিদার সাথে সম্পর্কহীন। কি উপায়ে তাকে সম্পর্কিত করা যায় তা আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি অথবা আবিষ্কার অভিযানে ব্রতীই হইনি।

এদেশের প্রচলিত উচ্চশিক্ষার সমস্যার অন্ত নেই। শ্রেণীকক্ষে এবং গবেষণাগারে স্থান সঙ্কুলান হয় না বলে আরও বেশি ছাত্র ভর্তি করা যায় না। চাহিদা অনুসারে ছাত্রাবাসে স্থান সঙ্কুলান হয় না বলে দু'জন ছাত্রকে এক বিছানায় ঘুমাতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত যেখানে ১ :১৪, সেখানে কর্মচারি–ছাত্র অনুপাত হচ্ছে ১ : ৪। বিস্তৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে ১৯৭৭ সালে যুক্তরাজ্য থেকে দু–সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ঐ বিশেষজ্ঞ দলের বক্তব্যে বলা হয়েছিল; দুর্বল প্রশাসনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক পদ্ধতির সাথে তুলনা করলে বলতে হয় যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

www.pathagar.com

পদ্ধতি নিতান্ত সেকেলে। এখানে বহু সিদ্ধান্ত অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রশাসনের উচ্চস্তরে নেওয়া হয়ে থাকে। প্রশাসনিক ব্যয় প্রকৃতপক্ষে কত সে তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। যুক্তরাজ্যে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের শতকরা ছয় কিংবা সাত ভাগ ব্যয় হয় প্রশাসনে, এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হয় তা বলা যায়। প্রশাসকবৃন্দ ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে মতবিরোধজনিত উত্তেজনা বৃদ্ধির এ ও একটা কারণ।

১৯৭৩ সালের নতুন আইন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় নির্বাচনভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ প্রার্থীদের মধ্য থেকে সিনেট তিনজনকে অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে মনোনয়ন দান করেন। সিনেটের মনোনীত তিনজনের মধ্যে যে কোনও একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি, কিন্তু যেখানে প্রচলিত হয়েছে সেখানে সিনেটের গঠন বেশ ব্যাপকভিত্তিক। ৯৯ সদস্যবিশিষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি পঁয়ত্রিশ জন। এঁরাই সিনেটে এক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। উপাচার্য পদপ্রার্থী ব্যক্তিবিশেষকে মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে শিক্ষকগোষ্ঠী ভোটের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যদি এমন প্রত্যাশা করা হয় যে ব্যক্তিবিশেষকে উপাচার্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার পক্ষে ভোট দেওয়ার প্রতিদান হিসেবে তাঁরা, ঐ ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে নিযুক্ত হলে, কিছু সুবিধা আদায় করতে পারবেন তাহলে কিছু করার নেই। যিনি মনোনীত ও নির্বাচিত হবেন তাঁরও নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি–তাঁদের দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি–দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মধ্যে কাজে অভ্যস্ত হতে আমাদের আরও সময় লাগবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট নৈমিত্তিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেখানে প্রশাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে সদস্য সংখ্যা যদি সমান সমান বা তার কাছাকাছি হয় তাহলে বিতর্কিত বিষয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হতে পারে। বিপরীত অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হলে সে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে।

ছাত্রাবাসসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অকার্যকরভাবে দুর্বল। হল ছাত্র সংসদ এবং কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মতামত অগ্রাহ্য করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য তা অতিরিক্ত অশান্তির কারণ হতে পারে। মধ্যযুগীয় বিলেতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার ছাত্রাবাসের প্রশাসন চালু হয়, এবং এখনও সেই পুরনো ব্যবস্থার ছায়া গোটা ব্যবস্থাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষার ফল সব কিছুতেই হলের ছাপ মারা থাকে–কিন্তু বিভিন্ন হলে কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র বণ্টনের ব্যবস্থা নেই। পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ হতে পারে, কিন্তু সে ব্যবস্থা এখন কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। অনেকের মতে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বহু সমস্যার উৎস ছাত্রাবাস ও তাঁর ব্যবস্থাপনা। বিকল্প কোনও ব্যবস্থা হয়ত বা সম্মিলিত উদ্যম, শক্তি, সাহস এবং উদ্ভাবনশীলতার অভাবে প্রবর্তন করা যায়নি। ডিগ্রি কলেজগুলোতে সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন হলেও সেখানেও সমস্যা কিছু কম নেই। বহু সময়ে বহু শিক্ষকের শূন্যপদে লোক নিয়োগ বা যোগ্য লোক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। কলেজেও ব্যবস্থাপকমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রগোষ্ঠী নানা মত ও পথ অনুসরণ করেন। সরকারি কলেজে বদলির নিয়ম আছে। ব্যক্তিবিশেষকে স্থান বিশেষে বদলি করা বা না করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বহু অনুরোধ উপরোধ শুনে বিব্রত হতে হয়–সবক্ষেত্রে সকল মহলের অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করা যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি সেসব অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। দলীয় কোন্দল–কলহের ফলে প্রশাসনের সাথে শিক্ষকমণ্ডলীর অসহযোগিতার জন্য প্রাত্যহিক কার্য নির্বাহ করা রীতিমত কঠিন হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সবক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জবাদিহি করার ব্যবস্থায় শৈথিল্য। এ ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারত স্বকীয় নীতিমালা প্রবর্তন ও অনুসরণ। একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কোনও ক্ষেত্রেই সুশৃঙ্খল স্বকীয় পেশাগত নীতিমালা উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করার মতো অবস্থায় আমাদের বিবেক এখনও বোধ হয় জাগ্রত হয়নি। ঐতিহ্যের অভাব, অভিজ্ঞতার অভাব, ধৈর্যের অভাব, সত্য ও ন্যায়কে স্বীকৃতি দিয়ে মান্য করার সাহসের অভাব আমাদের বিবেককে জাগ্রত ও উন্নত করতে পারেনি। বলতে গেলে সবাই সময়ের দাস। নিজের কাজের মেয়াদকালে কোনও রকমে গা বাঁচিয়ে (বা মান বাঁচিয়ে) কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে পার হয়ে যেতে পারলেই যেন আমরা সবাই শান্তি পাই। অবশ্য, সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য যে গুণাবলী ও কর্মতৎপরতা প্রয়োজন তার মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব থাকতে হয়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের এ সমাজে নিদারুণ অভাব।

একটি সূত্র অনুসারে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

১. উচ্চশিক্ষা–ব্যবস্থার বিপুল বিস্তার এবং অসম ভৌগোলিক বিন্যাসের ফলে গ্রামীণ ও নাগরিক ব্যবধান;
২. কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কহীন ও অপরিকল্পিত বিস্তার;
৩. উচ্চশিক্ষা–ক্ষেত্রে জনসাধারণের এবং সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের অংশগ্রহণের অভাব;
৪ নির্দেশনা ও পরামর্শদান কার্যক্রমের অভাব;
৫ সরকারি অনুদান প্রদানের সেকেলে পদ্ধতি অনুসরণ;
৬ সুযোগের সমতাদানের নামে সমাজের অনগ্রসর অংশের বিপক্ষে পক্ষপাতিত্বমূলক বৃত্তিপ্রদান নীতি অনুসরণ;
৭ প্রাপ্ত ভৌত সুবিধাদির অপর্যাপ্ত ব্যবহার;
৮ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, সমাজশিক্ষা এবং সম্প্রসারণ ও বহিরাঙ্গন শিক্ষার সাথে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা;
৯ শিক্ষা–ব্যবস্থাপনার ক্রমবর্ধমান অবনতি (অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের সম্মান কোর্স শেষ করতে পাঁচ বছর লাগে);
১০ মহিলা এবং এ যাবত সুযোগ বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ–সুবিধার অপ্রতুলতা (তথাপি ১৯৭৩ সালের পর ছাত্রী–সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে)।

উপর্যুক্ত দশটি সমস্যার একটির প্রতি দৃকপাত করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের সম্মান কোর্স শেষ করতে পাঁচ বছর লেগে যায়, সেই সঙ্গে স্নাতকোত্তর কোর্সের সময়ও এক বছরের জায়গায় দু'বছর লাগে। অর্থাৎ নির্ধারিত চার বছরের কাজে ব্যয় হয় সাত বছর। সময়, শ্রম, অর্থ অপব্যয়ের এ এক লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা। দুটি প্রধান কারণে নির্ধারিত সময় মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে–এক. পরীক্ষা পিছানো, দুই, বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিতভাবে বন্ধ করে দেয়া। পরীক্ষা পেছানোর দাবি ছাত্রদের দিক থেকেই ওঠে–কোর্স শেষ না হওয়া, বন্যা–জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে ত্রাণকাজে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দান, দেশব্যাপী নির্বাচনে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ছাত্রদের পড়ার ক্ষতি, ছাত্রদেরকে চাকরির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ ও সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পরীক্ষা পেছানোর দাবি উঠেছে এবং কর্তৃপক্ষকে সে দাবি কমবেশি মানতেই হয়েছে। জাতীয় সুযোগ বা জাতীয় নির্বাচনের কারণে

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষকেও কোনও কোনও সময় একতরফাভাবে পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হয়েছে। ছাত্রদের দিক থেকে যখন দাবি ওঠে তখন সে দাবির পেছনে কত ছাত্রের সমর্থন আছে তা নির্ণয় করা কঠিন। যারা শ্লোগানমুখর, যারা দাবির প্রবক্তা হয়ে মিছিলে অগ্রগামী হয় তাদের বক্তব্যকেই প্রতিনিধিত্বমূলক বলে ধরে নেয়া হয় বা ধরে নিতে হয়। তারপরও আছে অনির্ধারিতভাবে বন্ধ ঘোষণা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বা ছাত্রাবাসে দলাদলি, মারামারি, এমন কি খুন-খারাবি হয়ে গেলে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা প্রশমনের নিরাপদ ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রদের চলে যাওয়ার আদেশ জারি করা। সে আদেশ কখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন কখনও বা সে আদেশ এসেছে রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ কেন্দ্র থেকে। যে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হট্টশালায় নতুন ভর্তি হয় সে জানে না কতদিন পরে তার ভাগ্যে কি জুটবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে কোনও কর্মসূচি বা নির্ঘণ্ট পায় না। বিশ্ববিদ্যালয় তেমন কার্যসূচি প্রদান করে নিষ্ঠার সাথে মেনে চলা প্রতিশ্রুতি ছাত্রদেরকে দেয় না-এটি প্রশাসনিক ব্যর্থতার আর এক নজির।

সমস্যার শেষ নেই। খুবই একটা বড় সমস্যা হচ্ছে পঠন-সামগ্রীর অপ্রতুলতা। বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। এই সমস্যাটিকে জটিল করেছে বাংলাভাষায় লেখা বইয়ের অভাব। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষা ব্যবহারের অঙ্গীকার প্রতি বছর আমরা করি-উচ্চতর জীবনের প্রত্যাশী উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা পাঠ্য বই সরবরাহ করার অঙ্গীকার অবশ্য করি না। বিভিন্ন বিষয়ের মূল পাঠ্য বই ইংরেজি ভাষায় লেখা-সেসব বইপত্রও দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। ব্রিটিশ কাউন্সিল পাঠাগারই অনেক ছাত্র ও শিক্ষকের একমাত্র আশ্রয়স্থল। কিছু বইয়ের অনুবাদ হয়েছে, কিছু মৌলিক বই লেখা হয়েছে। এসব বাংলা বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। অনূদিত বা মৌলিক বাংলা বইয়ের দুর্বলতা আছে-আঙ্গিক, পটভূমি, উদাহরণ, নজির সবই বিদেশী, কেবল ভাষাটা বাংলা-তেমন বইকে কি বলা যাবে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল?' সম্ভবত প্রবাদটি উল্টো করে বলাই ঠিক হবে। বইয়ের বাজার, প্রকাশনা, মূল্য, লেখকের পারিশ্রমিক সবকিছুই এ ব্যাপারটির সাথে জড়িত। শিক্ষা খাতে ব্যয় যদি জাতির ভবিষ্যত সমৃদ্ধির জন্য লগ্নি হয় তাহলে সে লগ্নির একটি অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র হচ্ছে সকল স্তরের জন্য উন্নতমানের বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করার ক্ষেত্র। বছরের পর বছর যদি আমরা সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্প-কারখানায় ভর্তুকি দিয়ে মুখ রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে যেতে পারি তাহলে উচ্চশিক্ষার জন্য উচ্চমানের বাংলা বই তৈরির কাজে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না যোগানোর কোনও কারণ থাকার কথা নয়।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৫ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নীহারঞ্জন রায় একটি ভাষণ দেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কট' শিরোনামে ঐ ভাষণটি ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের একটি সাময়িকপত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে বিরাজমান সমস্যাসমূহের প্রকৃতি সে দেশে এবং এ দেশে অবিকল অভিন্ন না হলেও সেসব সমস্যার চরিত্রগত মিল অনেক। ঐ ভাষণটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি, কিঞ্চিত দীর্ঘ উদ্ধৃতি, বক্ষ্যমান বিষয়ে প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

... পঁচিশ বছর, এমন কি পনের বছর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে রূপ ছিল সে রূপ আজ আর নেই। তখন পর্যন্তও বিশ্ববিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে যে সব ছিল ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সে সব নিয়ে নানা প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে। জাগতিক ও সামাজিক নানা সমস্যা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বহুমুখি এক সঙ্কটের সামনে।... বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, এই নিয়ে যথেষ্ট শিরঃপীড়া এখনও আমাদের

www.pathagar.com

মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, না বিশ্ববিদ্যার কেন্দ্রগুলোতে, না সে বিদ্যার প্রশাসনিক অধিকর্তাদের ভেতর। নানা কমিটি কমিশনের যে সব বিষয় আলোচিত ও পুনঃনির্ধারিত হচ্ছে, দেখে শুনে মনে হয়, আমরা ধরে নিয়েছি, পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ, পরীক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন টার্ম থেকে সেমিস্টারে রূপান্তর, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের সময়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রশাসনে ছাত্রছাত্রীদের অধিকারদান, দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বেশি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা, খেলাধুলা, ছাত্রাবাস ইত্যাদির সুব্যবস্থা, গবেষণাদি বিস্তৃততর সুযোগ সমৃদ্ধ ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্কট সব ঘুচে যাবে।... এ সব দাবি-দাওয়া যদি মেটানোও যায়, মেটাবার মতো অর্থবল যদি সমাজে থাকেও তা হলেও-আমি যে সঙ্কটের কথা বলতে চাইছি, সে সঙ্কট থেকে আমরা ত্রাণ পাব না। এ জাতীয় সংস্কার বা শোধনক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটি বদলাবে না এবং তা না হলে সঙ্কটও ঘুচবে বলে মনে হয় না।...

প্রথম সঙ্কটটি তো তাকালেই চোখে পড়ে; সে সঙ্কট সংখ্যার সঙ্কট।... ইতিমধ্যে একাধিকবার চেষ্টা হয়েছে, এখনও সে চেষ্টা চলছে এবং সংখ্যাবৃদ্ধির অন্ধ বেগকে যাতে সংযত করা যায়, কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যাতে সীমিত করা যায়। কিন্তু সকল সংকল্প, সকল চেষ্টাকে সমূলে ব্যর্থ করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখনও ক্রমবর্ধমান। আমার জীবদ্দশায় এই বৃদ্ধির গতি সংযত হবে বলে তো মনে হয় না। আর, কমিটি কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, সরকারি শিক্ষা অধিকর্তারা কেউই এই সামাজিক জলস্রোতের বেগ ধারণ করতে পারবে না, এমন ধারণাও আমি করতে পারছিনে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে পঠন-পাঠন, বা খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার করা মন্ত্রের শক্তি আছে একে ধারণ করবার, এমন বিশ্বাসও আমার নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের সর্বত্র একটি বৃহৎ অগ্নিগর্ভ সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই বিস্ফোরণ এখন সঞ্চারিত হয়েছে সমাজের সর্বদেহে। এই বিস্ফোরণ আমরাই ঘটিয়েছি, সজ্ঞান সচেতনতায়! অনেক কারণের মধ্যে দুটি কারণ উল্লেখই আপাতত যথেষ্ট। প্রথমত আমরা সজ্ঞানে গ্রহণ করেছি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, ... অর্থাৎ, একটি কলমের আঁচড়ে আমরা হাজার বছরের বদ্ধ অর্গল খুলে দিয়েছি, যে অর্গলের পেছনে আবদ্ধ ছিল সমাজের বৃহত্তর অংশের অগণিত নরনারী, যাঁরা কখনও উচ্চতর শিক্ষার অধিকার পান নি, অথচ যাঁরা চোখের সামনে দেখেছেন, এই শিক্ষাই সামাজিক মানমর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্তসম্পত্তির একমাত্র চাবিকাঠি। আজ তাঁরা এবং তাঁদের পুত্রকন্যারা উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর,অর্থাৎ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ঠেলে, ভেতরে এসে ভিড় করবেন, নতুন নতুন কলেজবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি করবেন এবং রাষ্ট্র অধিকর্তারা সে দাবি মেটাতে বাধ্য হবেন, এতে বিস্মিত হবার কোনও কারণ নেই। এই অত্যন্ত দ্রুত প্রসারমান অবস্থার মধ্যে শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পুরনো উচ্চমান ও আদর্শ, শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা বজায় রাখা যায় না, যাচ্ছে না, তাতেও বিস্মিত হবার কারণ দেখছিনে।

দ্বিতীয়, সজ্ঞানে, সচেতনভাবে আমরা বেছে নিয়েছি, এমন একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এমন একটি জাগতিক সভ্যতার আদর্শ যা একান্তভাবে টেক্‌নলজিনির্ভর। একথা বোধ হয় এখনও আমরা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি যে, যে-কোনও টেক্‌নলজি-নির্ভর সভ্যতায় উচ্চশিক্ষিত নরনারীর সামাজিক চাহিদার পরিমাণ অত্যন্ত ব্যাপক; শুধু কারিগরি শিক্ষা দিয়ে মিস্ত্রি তৈরি করে সে দাবি মেটানো যায় না! বস্তুত, স্বল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিতের সীমিত ও সংকীর্ণ একটি শ্রেণী, যা এতকাল আমাদের ছিল, তা নিয়ে আজকের

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক পৃথিবীর সমাজে প্রবেশাধিকার পাওয়াই কঠিন। সাম্প্রতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপরিধি সমাজের সর্বস্তরে বহুধা বিস্তৃত; টেক্‌নলজিনির্ভর সমাজের চরিত্রই এই। এই বহুধাস্থিত কর্মের নেতৃত্বদান সীমিত ও সংকীর্ণ 'এলিটিস্ট' একটি শ্রেণীর পক্ষে সম্ভবই নয়। উচ্চশিক্ষার ব্যাপক চাহিদার এ-ও একটি প্রধান কারণ। আমার ধারণা টেক্‌নলজির প্রসার দেশে বাড়বে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুধু কারিগরি ও বৃত্তিমুখি করলেই এ দাবিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। য়ুরোপ-আমেরিকা-জাপানে এ ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংখ্যার সঙ্কট এতে ঘোচেনি।

তবু, (আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার যদি আরও বিস্তৃত হত, মান উন্নততর হত, উদ্দেশ্য বহুমুখি হত, ব্যবস্থা দৃঢ়তর হত এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পরই ছাত্রছাত্রীদের আমরা যথেষ্ট বৃত্তি ও ব্যবসায়ে কর্মব্যাপৃত করতে পারতুম, তাহলে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রবেশাধিকার, নির্বাচনের মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যেত, এবং সংখ্যার সঙ্কট তাতে কিছুটা শিথিল হত।) কিন্তু সখেদে স্বীকার করতে হয়, এতগুলো 'যদি'-র সদুত্তর আমরা দিতে পারিনি। একথা বলার পরও আমার সন্দেহ থেকে যাচ্ছে, সদুত্তর দিতে পারলেও সংখ্যার সঙ্কট মোচন করা যেত না, কারণ, যে সেব দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার সদোক্ত সব দাবিই মোটামুটি মেটানো হয়েছে, সেসব উন্নত দেশগুলোতেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সংখ্যার এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পায়নি।

এর ফল যা হবার ঠিক তাই হয়েছে এবং হচ্ছে। (প্রথমত, রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারের উপর চাপ পড়েছে খুব বেশি। দ্বিতীয়ত, এই সুবিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা থেকে যে পরিমাণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ, যে পরিমাণে বস্তুগত উপাদান উপকরণ এবং মানবিক শক্তি ও মর্যাদার প্রসার আহরিত হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না, এবং হচ্ছে না বলেই জনসাধারণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ ক্রমশ ভাষা পেতে শুরু করেছে। এ বিক্ষোভের আরও একটি কারণ, গড়পড়তা মাথাপিছু উচ্চশিক্ষার মত অর্থব্যয় হচ্ছে তার এক-দশমাংশও হচ্ছে না প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়।) ইতিমধ্যেই এ প্রশ্নও কোনও কোনও মহলে উঠেছে যে, এই দরিদ্র, (বিপুলসংখ্যক নিরক্ষরের দেশে যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ বিস্তার আজও হয়নি, যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি এখনও সংকীর্ণ এবং ব্যবস্থাদি অত্যন্ত শিথিল, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য এই সুবিপুল অর্থব্যয়ের সার্থকতা কতটুকু। তৃতীয়ত, যেহেতু এই অর্থ জনসাধারণের অর্থ যার যথাযথ ব্যয়ের দায়িত্ব সরকারের, সেই হেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে অর্থ দেয়া হয় তার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা, তা দেখবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এবং মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকেও নানা রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে।... অর্থের অপ্রতুলতা সর্বত্র; এই অপ্রতুলতা যত বাড়ছে, রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারের উপর যত বেশি চাপ পড়ছে, উচ্চশিক্ষার খাতে অর্থব্যয়ের উপর সরকারি নজর তত বেশি কড়া হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন তত বেশি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকেরা মনে করছেন, সরকার তাঁদের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করছেন, এবং যেটুকু বা দিচ্ছেন তার বদলে তাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিচ্ছেন। সরকার মনে করছেন, যে অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেওয়া হচ্ছে সে পরিমাণে জাতীয় সম্পদ আহরিত হচ্ছে কিনা, অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দায়িত্ব তাঁদের।...

আসল কথা, সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে বিশ্ববিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলোতে এখনও যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য সক্রিয় তা একান্তই 'এলিটিস্ট', এবং বিশেষভাবে কয়েকটি উচ্চতর মর্যাদাবহ বৃত্তির

www.pathagar.com

দিকে ধাবিত। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ওয়েলফেয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের ফলে দ্রুততর একটি সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিনীত হচ্ছে সমাজশক্তির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যাচর্চার পুরোনো আদর্শের একটি সংঘাত। আমরা ব্যাপৃত আছি একটি হাস্যকর চেষ্টায় : সে চেষ্টায় প্লাবনের স্রোতকে একটি চায়ের কাপে ধারণা করবার চেষ্টা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দ্বিতীয় সঙ্কট অর্থ-সঙ্কট। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা বরাবরই, এবং সর্বত্রই ব্যয়সাপেক্ষ। এই ব্যয়সাপেক্ষতা গত ১৫/২০ বছরে চতুর্গুণ হয়েছে এবং এখনও তা ক্রমবর্ধমান। এই ব্যয় বৃদ্ধি শুধু ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর বা শিক্ষকদের সংখ্যার জন্য নয়। গত ৫০/৬০ বছরের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রয়োগবিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে যে কোনও ৫০০/৬০০ বছরেও তা কখনও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়েছে; সেই হেতু শিক্ষণ ও গবেষণাদির ব্যয়ভারও সঙ্গে সঙ্গে গেছে বেড়ে,... তা প্রধানত বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিজ্ঞান বিভাগগুলোতে এবং গ্রন্থাগারগুলোতে। যতদিন পরাধীন ছিলাম যতদিন শিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থাদি ছিল অত্যন্ত অপ্রচুর। আজ স্বল্প সময়ের মধ্যে বহু বঞ্চিত বিধিব্যবস্থার, উপাদান-উপকরণের অভাব অতি দ্রুত পূরণ করে নিতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যাদানের মাথাপিছু খরচ আজ সে কারণে অনেক গেছে বেড়ে, প্রায় চতুর্গুণ বললে কিছু অত্যুক্তি হবে না। এ খরচও ক্রমবর্ধমান। আগে যে ব্যবস্থা চালু থাকুক, এখনকার ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থায় এই বিপুল ব্যয়ভার প্রায় সমস্তটাই বহন করতে হয় রাষ্ট্রকে, অর্থাৎ করভারগ্রস্ত জনসাধারণকে, অর্থ-সঙ্কটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে আপেক্ষিকতার, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক ভারসাম্যতার।... শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় কাঠামো গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থবণ্টনে আপেক্ষিকতার প্রশ্ন ওঠা অনিবার্য এবং সে প্রশ্নের যা অনিবার্য উত্তর তা কাজে পরিণত করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকঙ্কট কঠিন থেকে কঠিনতর হতে বাধ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সঙ্কট আরও গুরুতর। এ সঙ্কটের কেন্দ্রে যে প্রশ্ন তার আশ্রয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের বিষয় ও পাঠক্রম। এই প্রশ্নটি চোখের সামনে যারা তুলে ধরেছেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা প্রশাসকেরা নন, তারা ছাত্রছাত্রীর দল। তারাই নানা অভিযোগ-আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশ্নটাকে তুলে ধরেছেন, সোচ্চারে এবং সুস্পষ্টভাবে। এ কথা সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব বিষয়ের পঠন-পাঠন হয় সেগুলো প্রধানত তিনটি খাতে প্রবাহিত, একটি ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি মানবিক বিদ্যার খাত; একটি সমাজবিজ্ঞানের খাত এবং একটি মৌলিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের খাত। কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যাদানের আয়োজনও আছে, কিন্তু এ বিদ্যা আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো একান্তই বৃত্তিমূলক, যা যথার্থ বিশ্ববিদ্যার অন্তর্গত বলে ধরা হয় না।... তিনটি খাতের বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য নেই, একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের সচেতনতা সঞ্চারের কোনও ব্যবস্থা নেই, বিশ্ববিদ্যার ক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা স্বেচ্ছাবিচরণের কোনও আয়োজন নেই। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ একটা বিক্ষোভ আছে; সাম্প্রতিক পৃথিবীর সচেতন অধিবাসী তাঁরা, বুঝতে আরম্ভ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়; সে শিক্ষা নিয়ে আজকের পৃথিবীকে জানা যায় না, বোঝা যায় না, জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না, জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আর-একটি সমস্যাও ছাত্রছাত্রীরাই তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা তাঁরা পাচ্ছেন তা অত্যন্ত পুথিগত, অত্যন্ত বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং থিয়োরিবদ্ধ; সে শিক্ষার প্রয়োগমূল্য ব্যবহারিক মূল্য অত্যন্ত কম, নেই বললেই চলে। এ বিশ্ববিদ্যা সাম্প্রতিক জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত ও সার্থক হবার মতো অস্ত্র তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছে না। নতুন স্বাধীন অথচ দরিদ্র ও অগ্রসরমান দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যার এই ব্যবহারিক প্রয়োগমূল্যের প্রশ্নটা আরও তীব্রভাবে, আরও সোচ্চারে শোনা যাচ্ছে।... একদিকে বিমূর্ত ও মৌলিক জ্ঞাননির্ভর বিদ্যা, আর অন্যদিকে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ মূল্য, এ দু-এর মধ্যে যে বিরোধ বা দ্বৈতত্ব তা মেটাবার কোনও সহজ মীমাংসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তাছাড়া, উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে, বিমূর্ত চিন্তাশক্তি ও মৌলিক জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয়ে, বা তাকে অবজ্ঞা করে, কোনও প্রয়োগবিদ্যাই বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না, বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। অথচ, এ-দু-এর মধ্যে একটা ভারসাম্য যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, একটা যোগাযোগের পথ যাতে সুগম হতে পারে তার কোনও চেষ্টা শিক্ষক বা শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে এখনও দেখা যাচ্ছে না।

উচ্চশিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যের এই প্রশ্নটা তীব্রতর ও ব্যাপকতর হয়ে দেখা দিয়েছে নতুন স্বাধীন অথচ অগ্রসরমান দেশগুলোতে। আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান বিদ্যার্থী-মণ্ডলের মধ্যে আছেন নানা বিচিত্র শ্রেণী ও জাতির অগণিত ছেলেমেয়ে, যাদের রুচি, আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যাঁদের সামাজিক পশ্চাৎপট বিভিন্ন ও বিচিত্র। এঁদের মধ্যে আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা শিক্ষার বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও অধিকার থেকে একেবারেই ছিলেন বঞ্চিত। অনেকে আবার এমন পরিবার থেকে এসেছেন যে পরিবার এঁরাই প্রথম যাঁরা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন উচ্চতর শিক্ষার অন্বেষণে। এই সব বিভিন্ন ও বিচিত্র নতুন নতুন উচ্চশিক্ষাকামী ছেলেমেয়েদের, এবং তাঁদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের মধ্যেই উচ্চশিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগমূল্যের দিকে ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল। এ শিক্ষার মানসিক মূল্য, সাংস্কৃতিক মূল্যের জন্য, ততটা নয়, যতটা এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার জন্যই, এঁরা বিশ্ববিদ্যাশিক্ষার দিকে এগিয়ে এসেছেন। এঁরা দেখতে চান, প্রমাণ পেতে চান, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে দাবি কতটা মেটাতে পারছে, বা পারবে না। এঁরা যখন দেখেন সে প্রয়োজন যথাযথ মিটছে না তখন তাঁরা ক্ষোভে আক্রোশে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, বিশ্ববিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা একান্তই অসম্পূর্ণ অসার্থক।.. বিশ্ববিদ্যাশিক্ষার মানসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য ও মর্যাদা যে এই প্রত্যক্ষ সামাজিক দায়দায়িত্ব এবং আশু লাভের প্রয়োজনীয়তার চাপে ক্রমশ ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

... বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শিক্ষা যদি দিতে হয় যে শিক্ষা সমাজের বিচিত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেণীগুলোর দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক, তা হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও পাঠক্রমের বিষয় আশয়, বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদি, ক্রমশ আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে যেতে হবে, যার ফলে ব্যয়ভারও ক্রমশ বাড়তেই থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার প্রার্থীদের সংখ্যাও। আর, ব্যয়ভার যত বাড়বে, অর্থ-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারীরা... ততই আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করবেন ততই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ন হবে। আশ্চর্য এই, যে বিশ্ববিদ্যালয় যত বেশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতার দাবি মেটাচ্ছে বা মেটাতেই চাইবে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের.. ছাত্রসংখ্যা তত বেশি, ব্যয়ভারও তত বেশি হচ্ছে বা হবে এই হচ্ছে অবস্থার পরিহাস। অথচ,

www.pathagar.com

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যাচর্চার যে ব্যবস্থা চালু আছে তার ভেতরে এই কুটিল পরিহাসের কবল থেকে কোনও নিষ্কৃতি আছে বলে তা মনে হচ্ছে না।...

... আধুনিক যুগের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় একথা ক্রমশ মেনে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রই সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই হিসেবে তাদের সামাজিক দায়িত্বও আছে। কিন্তু এ দায়িত্বের অর্থ এই ছিল না যে সমাজে কোনও আশু লঘু বা গুরু সমস্যার সমাধান তারা করে দেবে, বা কোনও সমসাময়িক অভাব তারা মোচন করে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে এমন একটি স্থান যেখানে সমাজ থেকে কিছুটা আলগা থেকে স্বাধীনভাবে কিছু লোক বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুশীলন করে যাবেন, নানা মানবিক, জাগতিক, ঐহিক, পারত্রিক প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, তা নিয়ে তর্ক করবেন, বিচার করবেন, এবং অন্য কিছু লোককে তাঁদের অনুশীলনবদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের পদ্ধতি শেখাবেন-একথা মেনে নিতে সমাজের কিছু বেগ পেতে হয়নি, কারণ সমাজ পরোক্ষভাবে তার দ্বারা উপকৃত হবে, এ বিশ্বাস সমাজের ছিল।

... দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে তো প্রায় সব দেশেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন আদর্শ দর্শন ও ভাবনার বিচিত্র ও গুরুতর দ্বন্দ্ব কোলাহল। এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল-সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকায় আছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও যুবকেরা এবং তাঁদের প্রত্যেক মতগোষ্ঠীই স্বভাবতই চাইছেন, তাঁদের বিশেষ বিশেষ মত, পথ ও কার্যক্রম সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করুক। এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল-সংগ্রামের মধ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-নিরপেক্ষতা রক্ষা করা স্বভাবতই উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, এই অবস্থার মধ্যে এই সব প্রতিষ্ঠান শুধু সন্ধান-গবেষণা, বিতর্ক-বিচার, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার শান্তসমাহিত কেন্দ্র হয়েও আর থাকতে পারছে না। সামাজিক দাবি ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছে যে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের অর্থে পুষ্ট, সেই হেতু সামাজিক সমস্যার সমাধান, সামাজিক দায়দায়িত্বে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং সমাজের আদর্শ কাঠামোর পরিবর্তনে ভূমিকা গ্রহণ তাদের সামাজিক কর্তব্য। আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো এ দাবি পুরোপুরি স্বীকারও করতে পারছে না, অস্বীকারও করতে পারছে না।... যাকে বলে 'জেনারেশন গ্যাপ' সে তো ইতিহাসে বরাবরই ছিল, যার প্রকাশ দেখা যেত প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘাতে, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। সমস্ত উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম পাদে এ ধরনের সংঘাত বারবার দেখা গেছে। কিন্তু একান্ত সাম্প্রতিককালে যা দেখছি তা এই 'জেনারেশন গ্যাপের' সংঘাত নয়; এ সংঘাতের মূলে আছে ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন, গোষ্ঠী পরিবার বিচ্ছিন্ন, উদ্‌গতযৌবন ব্যক্তি মানুষের বিদ্রোহ-ভাবনা, যে বিদ্রোহ-ভাবনা তার নিজের সমাজে এবং পৃথিবীর মানব-সমাজে যেখানে যত অন্যায়-অবিচার-মনুষ্যত্বের; যত অবমাননা, স্বাধীনতার যত খর্বতা সবকিছুর বিরুদ্ধে ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, এমন কি গোষ্ঠী ও পরিবারেরও বিরুদ্ধে। এই সামগ্রিক বিরোধ-ভাবনা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে তার চিত্তে সঞ্জাত হয়েছে একটি অন্ধ, বন্ধ্যা ক্রোধ ও আক্রোশ। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অভাব-অভিযোগ, বেকার সমস্যা ও সাময়িক দারিদ্র সেই ক্রোধে ও আক্রোশে ইন্ধন যোগাচ্ছে প্রতিনিয়ত। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে দেখছে সংখ্যার সঙ্কট, অর্থসঙ্কট, প্রাসঙ্গিকতার সঙ্কটে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাত্যহিক জীবন পঙ্গু ও দুর্বল, নানা সংশয়ে সঙ্কটে বিপর্যস্ত। সে মনে করছে এবং খুব ভুল মনে করছে না যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোই তার চোখের সামনে প্রতিষ্ঠিত সমাজশক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিভূ; সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও আক্রোশ ফেটে পড়েছে এই প্রতিভূর উপর।.. যদি ধরেও নেয়া যায় যে সকলেই স্বীকার

www.pathagar.com

করে নেবেন, কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে নিরপেক্ষ ভূমি যেখানে সমস্ত আদর্শ, মতবাদ কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিতর্কিত, আলোচিত, বিচারিত হবে বস্তু, তথ্য, বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভর করে, এবং তা করাই শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন, তা হলেই কি সমস্যা মিটাবে? প্রশ্ন থেকেই যাবে, সমাজের আশু সমস্যা মেটাবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সমাজের বিচিত্র কর্তব্য পালনের জন্য তারা কী করছেন?...

উচ্চশিক্ষার সমস্যা সমাধান

উচ্চশিক্ষা তথা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমস্যামুক্ত করার প্রয়াস বিশ্বব্যাপী চলেছে। সমস্যা জটিল, তার সমাধানও সহজ নয়। ১৯৭০–এর দশকে গঠিত ইউনেস্কোর একটি আন্তর্জাতিক কমিশন ১৯৮০–র দশকে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবর্তনযোগ্য কতিপয় ব্যবস্থাকে উপযোগী বিবেচনা করেন। এই ব্যবস্থাদির মধ্যে তৎকালীন সমস্যা সমাধানের কিছু ইঙ্গিত আছে। '৮০–র দশক এখন মাঝামাঝি পর্যায়। তবুও কমিশনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলোর দিকে নজর দেওয়া যায়। কমিশনের মতে :

১. সকল ব্যক্তির জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত;
২. শিক্ষা কেবলই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক থাকবে না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত;
৩. একটা নমনীয় কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকবে, বিষয় নির্বাচনের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না;
৪. শিক্ষার বিষয়, ক্রম ও স্তরের মধ্যে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে যে সেকেলে কৃত্রিম বাধা আছে তা দূর করতে হবে এবং পৌনঃপুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে;
৫. শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে নিজ পেশায় নিম্ন থেকে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত করার এবং এক পেশার পরিবর্তে অন্য পেশা গ্রহণের সুযোগ দেবে;
৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা–প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লক্ষ্যের যে ভিন্নমুখিতা আছে, তার অবসান করতে হবে, কেবল নিজ নিজ কর্মীবাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মধ্যেই ব্যবসা–প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে না, দক্ষ কারিগর ও গবেষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণের দায়িত্বও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে;
৭. জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা প্রবর্তিত ও গৃহীত হলে প্রচলিত শ্রেণী উত্তরণ ও সনদদান পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে এবং যোগ্যতা, প্রবণতা ও প্রেষণার প্রকৃত মূল্য স্বীকৃত হবে যা কিনা প্রাপ্ত নম্বর ও বিভাগ বা স্থানের চেয়ে অধিক অর্থপূর্ণ।
৮. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং তার বাইরে বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে;
৯. প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এ ধারণা সঞ্চারিত করতে হবে যে, শিক্ষিত ব্যক্তির মাধ্যমে অর্জিত মননশীলতা নামক মূলধনে অন্যকে অংশীদার করে নেওয়া তার দায়িত্ব;
১০. কিশোর, যুবা, প্রাপ্তবয়স্ক নির্বিশেষে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে সামগ্রিক শিক্ষা প্রয়াসে নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হবে;
১১. জাতীয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষায় নতুন নতুন উদ্ভাবনশীলতা অন্বেষণ ও প্রবর্তনের প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে যেন সে সব উদ্ভাবনশীলতা প্রয়োগের ফলে শিক্ষাক্ষত্রে অবিরাম সংস্কার সাধিত হতে থাকে, এবং

www.pathagar.com

১২. সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়িত্ব পালন ও সম্পদ বণ্টন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রিক করতে হবে যেন যাদের জন্য মূলত শিক্ষা-কর্মকাণ্ডের আয়োজন তারাও সামগ্রিক সে কর্মকাণ্ডে শরিক হতে পারে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ১৯৮৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের কতিপয় সুপারিশ করেন। সুপারিশের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতি বছর অধিকতর সংখ্যায় ছাত্র/ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য ভিড় জমাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ, অতি প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে এই ছাত্রসংখ্যার সামান্য অংশকেই মাত্র ভর্তির সুবিধা দান করতে পারছে। কমিশন মনে করে যে, ক্রমবর্ধমান এই ছাত্রসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং বিশেষ করে দেশের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম ও প্রশস্ততর করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

(ক) যে সব কলেজে বর্তমানে অনার্স পর্যায়ে শিক্ষা দান করা হচ্ছে সে সব কলেজে যোগ্য ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ এবং লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও শ্রেণীকক্ষ সুবিধাদির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করে অধিকতর সংখ্যায় ছাত্র ভর্তি করা যেতে পারে।

(খ) বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সাথে নির্বাচিত কতকগুলো সরকারি কলেজে এরূপ সুপরিকল্পিতভাবে স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের ক্লাশ খোলা যেতে পারে, যাতে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ভর্তির চাপ বহুলাংশে কমে আসে অথচ একই সাথে কোনও একটি বিশেষ এলাকার ছাত্রছাত্রীরা মোটামুটি সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐ অঞ্চলের কোনও না কোনও কলেজে মাস্টার্স শেষ পর্ব পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করতে পারে...।

(গ) 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' স্থাপন সংক্রান্ত সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত যত্নসহকারে বাস্তবায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ'গুলো যাতে ঠিক ঠিকভাবে গড়ে ওঠে সেজন্য সযত্ন পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত সমীচীন।

(ঘ) অধিভুক্ত কলেজসমূহে লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে দুটি অনুমোদনকারী (affiliating) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

(ঙ) স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী কলেজসমূহের শিক্ষক নিয়োগ ও বদলীর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে করে অধীত প্রত্যেকটি বিষয়ে এ সকল করতে হবে, সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক নিয়োজিত থাকেন।

(চ) একটি সমন্বিত প্রোগ্রামের অধীনে এ সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন। (১৯৭৪)-এর সাথে মঞ্জুরী কমিশনও একমত যে 'দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেশের সকল অংশের জনগণের নিকট সমভাবে সহজলভ্য করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়' এবং সে উদ্দেশ্যে খুলনা বিভাগে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ও বিশেষভাবে কর্মজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Open University) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার আবাসিক ও অনাবাসিক উভয়শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিষয়টি যত্নসহকারে বিবেচনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অতি প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা সৃষ্টি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

দেশের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় দু'টিতে কারিগরি বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের সাথে সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে (Allied subjects) শিক্ষাদানের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

দেশে আরেকটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বর্তমান প্রকৌশল কলেজগুলোর তত্ত্বাবধানের বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয় প্রতি বছরই সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় বাজেটের সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয় জাতীয় বাজেটের তুলনায় ক্রমশ কমে আসছে। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় এমন কি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের গড় ব্যয়ের অনেক কম। এতে করে এই উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের শিক্ষার উন্নতির পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে বাংলাদেশের সময়ের প্রয়োজন হবে।

... শিক্ষা-খাতে এ বরাদ্দ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্ধিত না করলে দেশের যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে দেশের ঈপ্সিত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সাথে এটাও সর্বজনস্বীকৃত যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা খাতে বিনিয়োগ সত্যিকার অর্থে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যই বিনিয়োগ। এ কারণে কমিশন মনে করে যে উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কারণে বর্ধিত করতে হবে এবং এ বর্ধিত বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যাতে পুরোপুরিভাবে পায় তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

.. বাৎসরিক উন্নয়ন কার্যক্রম (ADP)-তে প্রতি বছর উচ্চশিক্ষা খাতে যে হারে বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়েছি যে,দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী কালের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ এ সময়ের মধ্যে সরকার থেকে আদৌ পাওয়া যাবে কি না।

... প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোন সম্প্রসারণ কর্মসূচি হাতে না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম সুসংহত (Consolidated) করার ব্যাপারে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা অনুপাতে অর্থ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অভীষ্ট সুযোগ-সুবিধার সমন্বয়ও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি এবং অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি না হওয়ার ফলে প্রতি বছর উচ্চশিক্ষা অভিলাষী বহু সংখ্যক যোগ্যতর শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতি যথাসম্ভব শীঘ্র সমাধান করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সাথে সাথে উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে কমিশন মনে করে যে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ন্যূনতম চাহিদা নিরপেক্ষভাবে নির্ধারণ করে সেগুলো পূরণের জন্য একটি জরুরি কর্মসূচি (Crash Programme) গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

দেশে নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সেখানে ছাত্রভর্তির জন্য প্রবল চাপ আসে এবং বেশির ভাগ সময়েই ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করতে হয়। ফলে জন্মলগ্নেই প্রতিষ্ঠানটি যে সমস্যার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয় তা থেকে সহজে তার মুক্তি মেলে না। লক্ষণীয় যে ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে এখনও একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে উঠতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে আঠার বছর পূর্বে স্থাপিত সমস্যাপীড়িত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাদেশ এবং পরবর্তীকালে সরকারের ২৪ জুলাই, ১৯৮৩ তারিখের গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী কমিশনের উপর যে সব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও আইন কাঠামো তৈরি করা হয়নি বা উল্লিখিত অধ্যাদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এ্যাক্টের মধ্যে যে সব অসংগতি রয়েছে সেগুলো দূরীকরণেরও কোনও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বলা বাহুল্য যে, আইনগত সমর্থন ছাড়া কমিশনের পক্ষে তার উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ডিগ্রি কলেজে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির বেগকে ধারণ করার ক্ষমতা চিঠিপত্রের মাধ্যমে পঠন-পাঠন বা খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার করা মন্ত্রের আছে কি নেই সে বিষয়টি বিতর্কিত হলেও এই সমস্যার আংশিক সমাধানকল্পে একটি খোলা বিশ্ববিদ্যালয় (মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুলী কমিশন করেছেন। এদিকে দূর-শিক্ষণ নামে একটি শিক্ষা কার্যক্রম ১৯৮৫-র জুলাই মাস থেকে চালু হয়েছে। পরীক্ষামূলক এ কার্যসূচির মাধ্যমে দু বছরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষককে বি. এড. ডিগ্রি দেয়া হবে। এ কার্যক্রমের একাডেমিক সমর্থন দিচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নির্বাহী দায়িত্ব পালন করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স টিচিং, সহযোগিতা করছেন দেশের দশটি প্রশিক্ষণ-শিক্ষণ কলেজ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি। এ কার্যক্রমের সাফল্য বা বিফলতা যাচাই করার সময় এখনও হয়নি কিন্তু এ ব্যবস্থার সমর্থক ও বিরোধীর অভাব নেই। এ ব্যবস্থার একটি ভাল দিক হচ্ছে নিজের জায়গায় নিজের পেশায় বহাল থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ লাভ। অন্যান্য সুবিধা এবং অসুবিধাও আছে। সব ধার করা মন্ত্রের সকল রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা না থাকতে পারে, কিন্তু মন্ত্রের সাথে দেশীয় ওষুধের দ্রব্যগুণ যোগ করলে তা ফলদায়ক হতে পারে। প্রয়োজনীয় উপাদান উপকরণ সরঞ্জাম যোগান দিতে হবে। ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হবে, দেখতে হবে এ ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির চাপ কমাতে পারে কিনা, সাধারণ উচ্চশিক্ষায় এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় কিনা। দেখতে হবে প্রচলিত ও নতুন এই দুই ব্যবস্থার সন্তানেরা গুণে-মানে তুল্য-মূল্য হয় কিনা।

www.pathagar.com

ভারতের উচ্চশিক্ষা কোন্ পথে

অনিল ভট্টাচার্য

কনফুসিয়াসের কথা-শিক্ষা মানুষকে যুক্তিবাদী হ'তে শেখায়, মানুষকে সম্পূর্ণ মানুষ হ'তে শেখায়। সামাজিক দায়বদ্ধতাও উচ্চশিক্ষার অন্যতম বিষয়। মানুষকে মূল্যবোধ ও চিরায়ত বা স্থিতিশীল চাবিকাঠির হদিস উচ্চশিক্ষাই দিতে পারে। বর্তমান প্রচলিত উচ্চশিক্ষার আরও সংস্কার দরকার। উন্নতিকামী দেশগুলিতে শিক্ষার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম, কিন্তু সে জন্য উন্নত দেশগুলো থেকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রত্যেকটি ব্যবস্থা কীভাবে ভালো হতে পারে, তা আরও প্রসারিত ও উন্নত হতে পারে তা আমাদের দেখা দরকার।

এ কথাগুলি তথাকথিত কোন নামী-দামী-জ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কথা নয়। ২৩ জুলাই ২০০৯ ইউনেস্কোর 'আগামী দিনের আহ্বান' শীর্ষক আলোচনাচক্রের সমাপ্তি ভাষণে বিভিন্ন দেশের উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে থেকে চীনের লুসকি চেন এই মতামত দেন-যার সাথে একমত হতে অন্যদেশের ছাত্র-ছাত্রীদেরও কোন অসুবিধা হয় নি।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার কী অবস্থা, সে সম্পর্কিত আলোচনায় বর্তমান প্রজন্মের এ মতামত আমাদের সাহায্য করতে পারে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে- নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা এসব তো তারই নিদর্শন। ব্রিটিশ অধীন ভারতে শিক্ষার ধারা তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে অন্যভাবে বইতে শুরু করে। ১৯৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই আধুনিক মানের যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন ভাষণে ১৮৬০ সালের ৬ মার্চ উপাচার্য রিচি বলেছিলেন- 'of all the defences of a state the surest, the best and the cheapest is the education of its people,... Educate your people from Cape comor in to the Himalayas, and a second mutiny of 1857 ... will be impossible.' *(Hundred years of the University of Calcutta, p. 72).*

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে কতটা বিচলিত এবং ভবিষ্যতে কোনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে এ ধরনের দেশপ্রেমকে যে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না, তা স্পষ্ট।

'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল' প্রবন্ধে কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালেই বলতে ভোলেননি যে ব্রিটিশদের প্রয়োজন ছিল নতুন যোগ্যতাসম্পন্ন ও নতুন ভাবধারায় দীক্ষিত 'নতুন শ্রেণীর' মানুষ। সে মানুষ তৈরি করার কারিগর হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে

www.pathagar.com

ব্রিটিশেরা যে ব্যবহার করেছিল, পরবর্তীকালে তা পরিস্ফুট হয়েছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদারুন আর্থিক অসুবিধার মধ্যে ব্রিটিশরাজের মাত্র ১০ লক্ষ টাকার অনুদানের শর্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট মানে নি, বরং তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; 'Freedom first, freedom second, freedom always.'

ব্রিটিশ রাজের সময়ে ভারতে শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন আবশ্যিক তো দূরের কথা, সকলের জন্য নিশুল্কও করে নি। হান্টার কমিশনের রিপোর্টে ১৮৮২ সালে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে ভারতে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৪১ জন ও উপযুক্ত বয়সের মোট ১৬.২৮ শতাংশ ও মেয়েদের ০.৮৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে যেত। ১৮৯৩ সালে গোখেলকে তাঁর প্রস্তাবিত বিলে বলতে শোনা গিয়েছিল : "with 94 percent of the people unable to read and write how can the evil of superstition be efficiently combated and how can be the general level of life in the country be raised?"

এখনকার চিত্র অবশ্যই আলাদা। ১৯৪১-এর আদমশুমারিতে ভারতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিল ১১ শতাংশ। এখন সেটা ৭০ শতাংশের কাছাকাছি। মনে রাখতে হবে, এখনও পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের মধ্যে ভারতেই বাস করে ৩৫ শতাংশের বেশি। আমাদের দেশে ৩০ কোটি যেমন উচ্চ মধ্যবিত্ত, তেমন ৩০ কোটির উপর মানুষ রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে (যাদের দৈনিক আয় ২ ডলারের কম)। ভারত সরকারের অন্য এক সমীক্ষায়, শতকরা ৭৭ ভাগের আয় দৈনিক ২০ টাকারও কম।

আবার ২০১০-এর মধ্যেই ভারত সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ইংরেজি জানা লোকদের বাসভূমি। সারা পৃথিবীর কোটিপতিদের মধ্যে ভারত হয়তো এবার ৪র্থ স্থানে। অথচ মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে ১৩৪তম স্থান দখল করে সবার পিছের কাছাকাছি। মোটামুটি মধ্যবিত্ত ৩৫ কোটির মধ্যে ৬৫ শতাংশ ২৫ বছরের যুবকের বাস ভারতে- আগামী দিনে বিশ্বে এ বয়সী যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রথমস্থান দখল করতে চলেছে (জ্যাকসন ২০০৬)। ৯৫ শতাংশের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন প্রশংসাপত্র নেই এবং ৯৫ শতাংশ শ্রমিকেরা অসংগঠিত। গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ শহরবাসীর বাস বস্তি অঞ্চলে। এ ধরনের এক বৈপরীত্যের সমাহার আমাদের ভারতে। উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে ১৭-২৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের ১১ শতাংশ (২০০৯), যা ২০১২-র মধ্যে ১৫ শতাংশ করার সদিচ্ছা ভারতে সরকারের একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যক্ত হয়েছে- ২০১৫ এর মধ্যে তা ২১ শতাংশ ও সংখ্যায় ২.১০ কোটি, ২০১২-র মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষায় শতকরা ৮০ শতাংশ উন্নীত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৮-'৪৯ সালেই রাধাকৃষ্ণ কমিশন, ১৯৬৪-'৬৬ সালে শিক্ষা কমিশন, যা কোঠারি কমিশন নামে খ্যাত, ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি, যার রূপ ১৯৯২-এ 'প্রোগ্রাম অ্যাকশন' নামে। ১৯৯২ সালের যে শিক্ষানীতি ঘোষিত তাতে অবশ্য বলা আছে- 'Higher education provides people with an opportunity to reflect on the critical, social, economic, cultural, moral and spiritual issues facing humanity. It contributes to national development through dissemination of specialised knowledge and skills. It is, therefore, a crucial factor for Suvival.' *(Govt. of India, 1992, p. 24)*

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার অবস্থাটা এরকম : ১৯৫০-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৫,২০০৮-এ তা হয় ৪৩১। কলেজের সংখ্যা ঐ সময় ৭০০ হতে বেড়ে ২০০৮-এ ২০,৬৭৭-এ পৌঁছায়। শিক্ষকের সংখ্যা ১৫০০০ থেকে ৫.০৫ লক্ষে পৌঁছায়। ছাত্রছাত্রী ১ লক্ষ থেকে ১১৬.১২ লক্ষে। (সূত্র : ইউজিসি, নভেম্বর-২০০৮)

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। যেমন- ২৫টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩০টি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয় ১২৩টি, রাজ্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩, বেসরকারি বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ২৮-সব মিলে ৪৩১টি। ১৯৫০-'৫১ সাল থেকে ২০০৫-'০৬ সালে গড়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে বছরে ৮.০৪ শতাংশ। এর মধ্যে ১৩ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ও কলেজে ৮৭ শতাংশ।

শিক্ষকদের সংখ্যা ২৪০০০ ছিল ১৯৫০-'৫১ এ। ১৯৯০-'৯১ এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৭১,০০০ এবং ২০০৬-'০৭ তা হয় ৫,০৪,৮১২। এঁরা ১৬ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ৮৪ শতাংশ কলেজে আছেন।

জিইআর (গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও) বা 'গড় ভর্তি অনুপাত'-এ বিভিন্নতা আছে। বিহারে ৫.৮৬ শতাংশ, তামিলনাড়ু তে ১৬.৩৬ শতাংশ। ভারতের গড় ১১.৫৫ শতাংশ। ১৩টি রাজ্যে সংখ্যাটি গড়েরও কম। (সূত্র : ইউজিসি বাৎসরিক রিপোর্ট)

উচ্চশিক্ষায় ভর্তির মধ্যে প্রতি ১০-এ জন বিজ্ঞানে। ১৮.০১ শতাংশ বাণিজ্যে। বাকি ৮২ শতাংশের মধ্যে ৬৬ শতাংশ কলা ও বিজ্ঞানে ও ১৬ শতাংশ পেশামূলক শিক্ষায়। কারিগরি ও প্রযুক্তিতে ৭.২১ শতাংশ, কৃষি বিজ্ঞানে ০.৫৮ শতাংশ।

সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১১ শতাংশ ও ৪.৫ শতাংশ। ঠিক তেমনিই মেয়েদের ক্ষেত্রেও বৈষম্য আছে- বৈষম্য রয়েছে শহর ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে-ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে।

২০০৬ সালে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ছিল ১.৩০ কোটি, তা বাড়িয়ে ২০১১-তে ২.১০ কোটিতে, ২০১৬-তে ২.৮০ কোটি ও ২০১৯-এ ৩.৪ কোটিতে আনতে চায় ভারত সরকার। ১৮-২৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের মোট জনসংখ্যা ২০০৬-এ যা ছিল ১২.৯ কোটি, তা ২০১৯ এ ১৩.৮ কোটিতে দাঁড়াবে বলে ধরা হয়েছে। জাতীয় জ্ঞান কমিশন (National Knowledge Commission) গঠিত হয়েছে সাম পিত্রোদার সভাপতিত্বে। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে সুপারিশ পেশ করেছেন তাতে ১৫০০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা বলেছেন যেখানে এসব বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পাবে।

যে ছাত্রছাত্রী ভর্তির কথা বলা হলো তার মধ্যে ১৪৫টি দেশের ১৩,৬২৭ জন আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীও আছে। এটি ২০০৪-'০৫ সালের হিসাব। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ এশিয়ার ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের- ৮ শতাংশ ইউরোপ ও আমেরিকার। ২০ হাজারের কম এই আন্তর্জাতিক ছাত্রদের সংখ্যা ২০১০-এ ৩৫ হাজারেরও বেশি করানো যায় কয়েকটি ব্যবস্থা নিলে। অন্যদিকে ভারত থেকে উচ্চশিক্ষা নিতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে চীনের পরেই বৃহত্তর সংখ্যায়- ২০০৫-'০৬ সালে ১,৬০,০০০ ছেলেমেয়ে, যার প্রায় অর্ধেক আমেরিকাতেই। এ সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে ১৯৯০-২০০০ এর তুলনায়। (আগরওয়াল ২০০৮)

অবশ্য ২০০৯-এ ৯.২ শতাংশ গত বছরের তুলনায় বেড়ে শুধু আমেরিকাতেই ১ লক্ষের বেশি-চীন দ্বিতীয় স্থানে ৯৮,২৩৫। মোট বিদেশি ছাত্রছাত্রী আমেরিকায় পড়ছে ৬,৭১,৬১৬ (সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০-১১-'০৯)

www.pathagar.com

আমাদের দেশে ১৭–২৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় মাত্র ১১ শতাংশ, যা পৃথিবীর গড় ২৩ শতাংশের অনেক নিচে এবং উন্নত দেশগুলি ৫৩ শতাংশের আরও অনেক নিচে। এদের সংখ্যা না বাড়ালে চলবে না, এ বিষয়ে মতা পার্থক্যের অবকাশ নেই। কিন্তু কীভাবে তা বাড়বে তার একটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন চেয়ারম্যান, ইউজিসি, অধ্যাপক থোরাট চেম্বার অফ্ কমার্স আয়োজিত কলকাতায় এক সেমিনারে গত ২২–০৯–২০০৯। একাদশ পঞ্চদশ বার্ষিক যোজনার পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়বে ৭০ লক্ষ এবং তার অর্ধেক বেসরকারি ব্যবস্থায় হবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। অবশ্য তা মুনাফার বিনিময়ে নয়–ইউজিসি–র শর্ত সাপেক্ষেই তা হবে বলে মন্তব্য করেছেন। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্র হতেই উচ্চশিক্ষা চলবে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। তবে কী শর্তে এবং কীভাবে তা খতিয়ে দেখতে হবে বলে বলেছেন। (সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩–০৯–২০০৯)

বেসরকারি ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষা কেমন চলছে সারা ভারতে তার মধ্যে বিভিন্নতা আছে। যেমন ১৯৮৪–'৮৫ সালের তুলনায় ২০০৬–'০৭ সালে তামিলনাড়ুতেই এ ধরনের ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা ৫০ গুণ বেড়েছে। হয়েছে ২৫৪টি। সে তুলনায় সরকারি অর্থে পরিচালিত কলেজের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৬টি। এ ধরনের বেসরকারি কলেজের সংখ্যা কারিগরিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশি বেড়েছে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার অনুমোদিত।

শিক্ষায় বেসরকারিকরণ যে ভারত সরকার ও অন্য রাজ্যসরকারগুলির স্বীকৃত, সে বিষয়ে আরো বিস্তৃত তথ্য দেওয়ার আগে বলে নেওয়া দরকার, ২০০৫–এর মে মাসে ভারতের ৬৪ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যে মত ব্যক্ত করেছেন তা হলো, "শিক্ষায় বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্য যদি কেবল মুনাফার জন্য হয় তবে তা পরিত্যজ্য।"

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ ধরনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কেমন? আমেরিকায় শতকরা ২৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মুনাফাকারী প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, যদিও তা বিভিন্ন নজরদারি সংস্থার সব ধরনের নিয়ম মেনে চলে। ৭৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে পড়ে সরকারি বা বেসরকারি বা পাবলিক অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংল্যান্ডে কেবল অল্প কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যা সরকারি অর্থে পরিচালিত না হলেও সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকে। মালয়েশিয়াতেও সরকারি নিয়ম বহির্ভূত কোন বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের নিজেদের দেশের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যয় করতে হয় না–আমাদের দেশে তার উল্টোটা। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শতকরা ৮৫ ভাগ 'সেল্‌ফ ফিন্যান্সিং' এ দেশে। ফলে শিক্ষায় সমতা রাজ্যে রাজ্যে মার খাচ্ছে।

ক্যাবে কমিটি 'অন ফিনান্সিং অব হায়ার অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন রিপোর্ট : ২০০৫'–এ এ বিষয়ে বলা হয়েছে–"সমাজের ও সরকারের দ্বারা এ দেশে উচ্চশিক্ষা অবহেলিত। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও যোজনা কমিশন বহু তথ্য দিতে না পারায় বা গাফিলতির কারণে পরিকল্পনা রূপায়নে ভ্রান্তির আশংকা বহুদিন অনুভূত হবে।"

কার্যরত শিক্ষক নিয়োগ বহু রাজ্যে বন্ধ ছিল বলা চলে; যেখানে এর অভাব খুব বেশি অনুভূত হয়েছে, সেখানে চুক্তির ভিত্তিতে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য নিয়োগ হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি বহুসংখ্যক গেস্ট টিচার ও আংশিক সময়ের শিক্ষক দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ (এআইইউ) শুধু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৩.৩৩ লক্ষ শিক্ষকপদ শূন্য বলে জানিয়েছে। সংরক্ষিত আসনে শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ৪.১৫ শতাংশ থেকে বহু গুণ বেড়ে গেছে তাও বলেছে এআইইউ।

www.pathagar.com

১৯৯০-'৯১ থেকে ২০০২-'০৩, এই বারো বছরে উচ্চশিক্ষায় সরকারি অনুদান ২৮ শতাংশ কমেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট অনুদান ১৯৯০-'৯১-তে ১.৬ শতাংশ থেকে ১৯৯৬-'৯৭-এ ১.৩ শতাংশে নেমে ২০০০-২০০১-এ কিছুটা বেড়ে আবারও ১.৬ শতাংশ হয়। ২০০৩-'০৪ সালে তা আবার কমে ১.২ শতাংশ পৌঁছায়। (ক্যাবে কমিটি) সমতা আনতে গেলে সরকারি অনুদান ছাড়া কীভাবে তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতি গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা সমান সুযোগ ভোগ করবে? কীভাবে এদের কাছে 'অ্যাকসেস ও ইক্যুয়িটি', সমান সুযোগ ও সমতা, পৌঁছবে?

কারিগরি শিক্ষাতে গড় জাতীয় সম্পদের মাত্র ০.১৩ শতাংশ ব্যয় হয়, যা সরকারি ব্যয়ের মাত্র ০.৫ শতাংশ- ১৯৯০-'৯১-তেও যা ছিল ০.৫ শতাংশ। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ০.৫ শতাংশ থেকে অষ্টম পরিকল্পনায় ০.৩ শতাংশে নামে, নবম পঞ্চবার্ষিকীতে যা ০.৩ শতাংশে পৌঁছায়। (তিলক ২০০৩)

ইউজিসি-র তথ্য অনুযায়ী রিসার্চ ফেলোশিপ ছিল ২০০২-'০৩ এ নবম প্ল্যানের মাত্র ১.৮ শতাংশ যা '৯৫-'৯৬ সালেও ৫.৭ শতাংশ ছিল। এ বছরও তার খুব বেশি হেরফের হয়নি।

এর পরেও কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চশিক্ষার 'বিস্তার ও উন্নয়নের' জন্য বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বিল আনতে চলেছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাধ চারণভূমি হয়ে উঠলে কী হবে তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় 'নিপা'র (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট) ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত 'ক্যাবে' কমিটির রিপোর্টে। "প্রাথমিক শিক্ষায় যদি শিক্ষার মোট বাজেটের ৫০ শতাংশ ব্যয় করা হয়, বাকি অংশের মধ্যে ২৫ শতাংশ মাধ্যমিক ও ২৫ শতাংশ উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় ব্যয় হবে। বর্তমানে শেষোক্ত দুটি মিলে ব্যয় হয় মাত্র ১৫ শতাংশ (মোট শিক্ষা বাজেটের)।" আরো স্পষ্টভাবে ঐ কমিটি সুপারিশ করে (সরকার পরবর্তীকালে লোকসভায় তা অনুমোদন করে) "জিএনপি-র ৪ শতাংশ শিক্ষা বাজেটে, ১ শতাংশ উচ্চশিক্ষায় ও ০.৫ শতাংশ টেকনিক্যাল কারিগরি) শিক্ষায় ব্যয় ধরা হবে।" ১৯৯৩ সালে পুন্নায়া কমিটিও উচ্চশিক্ষার ব্যয় ভারের সিংহভাগ বহন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের বলে সুপারিশ করে- "Government funding must continue to be an essential and mandatory requirement for support of higher education. The Government and State must continue to accept the major responsibilities for funding..."

অধ্যাপক অন্নদাকৃষ্ণণ ভারত সরকারের বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন (ইপিডব্লিউ, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭) : "What is needed at this stage is to reflect on the causes for the disappointing results on this similar suggestions by several eminent commissions and committees during the past decades, if these reports may not see same fate.'

ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশের প্রসঙ্গে মন্তব্য শুধু অধ্যাপক এ. কৃষ্ণণেরই নয়, আরও বহু শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞের। যেমন, অধ্যাপক কৌশিক বসু তাঁর 'Oxford Companion to Economy India 2007' এ বলেছেন '১৯৬০ এ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরিতে ১৫ শতাংশ (মোট কারিগরি ছাত্রের) আসন থাকত, ২০০৩ এ তা ৮৭ শতাংশে পৌঁছায়-চিকিৎসা শাস্ত্রে ৬.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪১ শতাংশ হয়, ঐ একই সময়ে।'

www.pathagar.com

বিস্তৃত পরিসংখ্যানে না গিয়েও বলা যায়, পেশাদারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গত দশ বছরে বৃদ্ধি ৭৫ শতাংশ–সরকারি বৃদ্ধি মাত্র ৫ শতাংশ ২০০৭ এর হিসেবে। এখন তার চেহারা আরও করুণ। সে সময় একটি সমীক্ষায় ধরা পড়ে, বিদেশি যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে টুইনিং পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছে, এমন ১৫০টির মধ্যে ৪৪টিরই কোন স্বীকৃতি তাদের নিজেদের দেশেই নেই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক এ. কৃষ্ণাণ বলেছেন, 'If the proposal for FDI (Foreign Direct Investment) in higher education sector to anybody and everybody with no nomination and control mechanism, it will be a great mistake.' EPW 17.02.07)

এমন একটি দেশ, উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদনক্ষম, কারখানায় ভর্তি, এখনও সেখানে ৪০ কোটি নিরক্ষর ও বহুসংখ্যক বেকার, তার প্রেক্ষিতে "ভারতের নীতি নির্ধারকেরা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষায়, খুব কম বিনিয়োগ করেছে।"– এ মত এডোয়ার্ড শুস তাঁর *Inspite of Gods, Strange Rise of Modern India (2008)'* এ ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে জেবিজে তিলক ২৪–২–০৭–এর EPW-এর লেখা, যা NKC-র সুপারিশ প্রসঙ্গে বলেছেন তা প্রাসঙ্গিক : 'while some of the recommendations made by the commission are important and less controversial, many are not supported by any evidence theoretical and empirical, nor are their strength and weakness even discussed' (EPW : 17.02.07)

"১৩১টি বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থাপক এদেশে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করেছে। তার মধ্যে ৬৬টি আমেরিকার ও ৫৯টি ইংল্যান্ডের সাহচর্যে চলেছে। এগুলি পেশাদারি বৃত্তিমূলক বিষয়েই মূলত শিক্ষা দেয়। ৮০ শতাংশই বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায়ই মূল লক্ষ্য। এদের শিক্ষাদান ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট স্তর পর্যন্ত।"

বেসরকারি ব্যবস্থাপনাও এ দেশে শিক্ষা এখন রমরমিয়ে চলছে। এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও 'স্বোপার্জিত পদ্ধতি' তে উচ্চশিক্ষা চালু হয়েছে। কারিগরিতে মোট বিনিয়াগ বেড়েছে ২০০৬–'০৭ সালে ১৪২ শতাংশ, যার বেসরকারি অংশ ৯০ শতাংশ বা তারও বেশি। ফার্মেসিতে মোট ২৬১ শতাংশ বিনিয়োগের মধ্যে বেসরকারি অংশ ৯০ শতাংশের বেশি। এমবিএ–তে ৬৯ শতাংশ মোট বিনিয়োগের বেসরকারি পরিমাণ ৬০ শতাংশের বেশি; বি. এড শিক্ষায় ৩৯৫ শতাংশ বিনিয়োগের মধ্যে বেসরকারি ভাগ ৫০। (আগরওয়াল ২০০৮, সারণী ৪ দ্রষ্টব্য)

সরকারি কোন রকম সাহায্য না পেয়ে ২০০১–এ যে সব বেসরকারি সংস্থা বেড়েছিল ৪২.৬ শতাংশ, ২০০৬–'০৭–এ তা দাঁড়ায় ৬৩.২ শতাংশে। শিক্ষার্থীরা সংখ্যা ৩২.৮৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ঐ সময়কালে ৫১.৫৩ শতাংশে পৌঁছেছে। ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিল ৩০টি, ২০০৮ এ তা হলো ১১৪, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যেই তা সীমাবদ্ধ।

এনডিএ আমলে বিদেশি ৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা এদেশে শিক্ষা ব্যবসায়ে যুক্ত ছিল, তাদের ৩৬টির কোন স্বীকৃতি তাদের দেশে ছিল না বলে জানা যায়। এখনতো ভারত সরকার 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বিল' পেশ করতে চলেছে পার্লামেন্টে। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের রেগুলেশন ও পরিচালনা নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে চলেছে।

দেখা যাক্ বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর কোন দেশে কীভাবে চলে।

www.pathagar.com

চীনের ১৭০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের যোগানদাতা প্রাদেশিক ও মিউনিসিপ্যাল সরকার। সে দেশ জিডিপির ০.৬ শতাংশ উচ্চশিক্ষায় ব্যয় করে। ফিলিপস্ জি অ্যাল্টাবাখ (EPW-6-60-09 বলেছেন, অতীতে চীন বহু পরিবর্তন এনেছে শিক্ষাব্যবস্থায়, যা নাটকীয় বললেও কম বলা হয়। এখন পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার পরেই সে দেশ শিক্ষার আসন পাকা করতে চলেছে। ১৯৯০-এর ৫ মিলিয়ন থেকে এখন ২৭ মিলিয়ন ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষায় পড়ছে। চীনে ২০০৩-এ বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থাপক (এফইপি) আইনে যা আছে তাতে বিদেশে প্রতিষ্ঠানে চীনের প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগী হতে পারে। এসব সহযোগী সংস্থা কোন লাভজনক সংস্থা হতে পারবে না, অর্ধেকের বেশি এসব সংস্থায় চীনের প্রতিনিধি থাকবে এবং যার চেয়ারম্যান চীনের নাগরিক অবশ্যই হবেন এবং তিনি চীনেই বাস করবেন। চাইনিজ ভাষায় শিক্ষাদান চলবে। ছেলেমেয়েদের ফি সরকারি অনুমোদন ছাড়া বাড়ানো চলবে না। উৎপাদনেও বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত নয়।

আমেরিকায় কি বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশ অবাধ? উত্তর-না। ২০০৫ সালে বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকার অর্থনীতিতে যোগান দেয় ১৩.৫ বিলিয়ন ডলার, এখন তা আরও বেশি। বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন যাতে না পড়ে তার জন্য বিজ্ঞানের গবেষণায়, বিশ্বের মোট বিনিয়োগের মধ্যে ৪০ শতাংশ আমেরিকা করে। উচ্চশিক্ষার মোট জিডিপি-র ২.৬ শতাংশ ব্যয় করে। বেসরকারি অনুদান উচ্চশিক্ষায় আমেরিকায় ৫০ লক্ষ পাউন্ড বছরে। ১৩৪ বিলিয়ণ ডলার আগামী ১০ বছরে আমেরিকা উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ করবে-২০০৭-এর ঘোষণা। উচ্চশিক্ষায় নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা আমেরিকার আছে বলে ধরা হয়, যেহেতু ৭০ শতাংশ নোবেল প্রাপক ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আছে, পেটেন্টের সিংহভাগ ওই দেশে দাবি করতে পারে। ১০০টি সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ওই দেশ ৩০টির মতো দাবি করতে পেরেও ওখানকার শিক্ষা কমিশন উচ্চশিক্ষার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে, 'ন্যাশনাল সেন্টার এডুকেশন এন্ড দি ইকোনোমি : টাফ চয়েস অর টাফ টাইম্স) শীর্ষক রিপোর্টে।

এতে বলা হয়েছে-গত ৩০ বছর আগে বিশ্বের ৩০ শতাংশ কলেজের ছাত্র ওই দেশে শিক্ষা নিতো- তা এখন ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্য দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপ্তি যা ঘটেছে তার ফলে গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ সাহিত্য এসব বিষয়ে আমেরিকান ছাত্ররা অন্য দেশের ছাত্রদের তুলনায় গুণমানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে।... ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার বছরে যেখানে ৭,৫০০ ডলার আয় করে, আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার সেখানে ৪৫,০০০ ডলার আয় করে, যদিও আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার গণিত, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের সমকক্ষ নন। কেন এসব ইঞ্জিনিয়ারকে কর্পোরেট সংস্থা চাকরিতে নিয়োগ করবে বেশি মাইনে দিয়ে? এমন প্রশ্নও তুলেছে এই কমিশন।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি স্বয়ংশাসিত হবে এমন সুপারিশ রাধাকৃষ্ণণ, কোঠারিসহ ১৯৮৬ সালের নয়া শিক্ষানীতি ও '৯২ এর অ্যাকশন প্ল্যান, এমন কি পিত্রোদা কমিশনের ও যশপাল কমিটির সুপারিশে বার বার বলা হয়েছে। যশপাল কমিটির রিপোর্টে আরও বেশ কিছু তথ্য সংকলিত হয়েছে, যার সাথে সংবাদমাধ্যমেরও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতারও সাযুজ্য আছে। বিশেষ করে ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাদারি শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এআইসিটিই, এমসিএ-র আর্থিক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ চিহ্নিত করা। এ সময়কালে এ সংস্থার চেয়ারম্যান ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত থেকে তাঁদের কারো বাড়ি থেকে কালো টাকা উদ্ধার, এসবও হয়েছে। (১৭/১১/২০০৯-TOI-১৮/৭/২০০৯)।

www.pathagar.com

ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা যে অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন তা সাম্প্রতিক ন্যাশনাল নলেজ কমিশন ও যশপাল কমিটির রিপোর্টেও বিস্তৃতভাবে বলা আছে।

তারও আগে ২০০৬ এর এপ্রিলে মুকেশ আম্বানি ও কুমারমঙ্গলম বিড়লা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে 'এ পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফর রিফর্মস ইন এডুকেশন', রিপোর্টেও 'শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন কোন সংস্কারের কাজ হবে না– চাই বিপ্লব' বলে বেসরকারিকরণের ঢালাও প্রস্তাব দিয়েছে। এনকেসি–র বিদ্যালয় শিক্ষার সুপারিশ, যা ফেব্রুয়ারি, ২০০৭–এ জমা দিয়েছেন চেয়ারম্যান সাম পিত্রোদো, সেখানেও বলা হয়েছে 'NKC recognises that our country is too large, too complex and too divese for 'one size fits all' solutions. Decentralisation, community participation and collborative models at the local level are crucial for devising effective programmes for implementation. It is also evident from the recommendations that there is need for more convergence and coordination, as well as greater flexibility in Primary and Secondary school education.'

বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রস্তাবে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের উপর যেমন জোর দেওয়া হয়েছে তেমন সমন্বয় ও সংযুক্তির কথাও আছে, আরও আছে শিক্ষায়–নমনীয়তার প্রকাশ। ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন স্তরেরই শিক্ষানীতিতে এসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেই নি; বরং বার বার কমিশনের সুপারিশে যা বলা হয়েছে তাতে ভারতের বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখেই কী সরকারি আদেশে, কী কাজের পদ্ধতিতে শিক্ষানীতি প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এর ছিটেফোঁটাও বাস্তবায়িত হতে দেখছি না। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত থেকে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হয় এবং বেশ কিছু বছর থেকেই কার্যত তা কেন্দ্রীয় তালিকায় আনা হয়েছে। ব্রিটিশেরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাকে গণ্য করতো এখন আর কিছুটা হেরফের হলেও মোটামুটি একই ধাঁচের ব্যবস্থা বিদ্যমান।

কার্ল মার্কসের বিখ্যাত উক্তি : 'আধিপত্যকারী শক্তি চিরদিনই রাষ্ট্রকে শ্রেণী শোষণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।'– এক্ষেত্রে কিছুটা মেলে–নইলে 'শিশুশিক্ষার অধিকার আইন' আইন আকারে আসতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ক বছর লাগলো? এ আইনের ধারা নিয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্র এ পরিসরে না হলেও বলা চলে, ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা হারিয়ে গেল, তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়েছে এ আইনে। প্রতি শিশুকে স্কুলে পাঠানোর দায়িত্ব তার মা/বাবার। যদি কেউ না যায় তাহলে মা–বাবাই দোষী এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। সর্বোপরি এ বিশাল অর্থের দায়িত্ব নেবে রাজ্য–তদারকির ভার কেন্দ্রের। একই নিয়ম সর্বত্র–বৈচিত্র্যের কথা, নমনীয়তার কথা, বিশাল অংশের নিরন্ন, নিরক্ষর, আদিবাসী শিশুদের কথা মাথায় রেখেই কি এ আইন প্রণয়ন? না কি, লক্ষ লক্ষ উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তদের প্রয়োজনানুগ ব্যবস্থা। পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে ১৩৪ তম স্থানে থেকেও (যা ক্রমশ নিম্নমুখী) কবে 'পরিবর্তন না, চাই বিপ্লব' রূপায়িত হবে? এনকেসি–ও স্বীকার করেছে 'that there is, in fact, a quite crisis in higher education in India that sense deep', 'the basic structure remained more or less similar to the colonial system inherited from the British' (Philip G. Altbach : EPW-6-6-2009)

অ্যাল্টবেখের লেখায় চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেল– '৯৫ শতাংশ বেসরকারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় বেসরকারি সংস্থার দ্বারা– যেমন ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন,

www.pathagar.com

ারে নিযুক্ত সংগঠন। এদের অধিকাংশই সরকার থেকে মোটা টাকা আদায় করে, খুব কম সংখ্যকই সরকার (কেন্দ্র বা রাজ্য) অনুমোদিত।' ছত্রিশগড়ের ১১৯টি ্যালয়কে বাতিল করতে হলো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে-অধ্যাপক যশপাল এদের দ্ধে মামলা না করলে রাজ্য সরকার অনুমোদিত এ বিরাট সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, যাদের কেরই কোন ঠিকানা পর্যন্ত নেই-বাতিল হতো না। বিপদ কমে নি-পদ্ধতির ত্রুটির জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে-এদের সংস্থা তো এখনও দেশে সক্রিয়-একটু-আধটু হেরফের করে রাই যে আরো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে না-কে বলতে পারে? কী করে কারিগরিসহ মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেবে যারা-তাদের ঘরে লক্ষ কোটি কালো টাকার হদিশ পাওয়া গেল?

তবুও ভারতে ৮টি আই আই টি, ৭টি আই আই এম, ৩০টি গবেষণার সুযোগসহ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১০টি এন আই টি, ২টি আই আই এস, ১০০০টি পলিটেকনিক খোলা হবে এমন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে ২০০৮-এ। এটি ইতিবাচক প্রয়াস, নিঃসন্দেহে।

একদিকে শিক্ষার চাহিদা, অন্যদিকে উচ্চমানের শিক্ষাব্যবস্থা, যা বিভিন্ন দেশ করছে এবং যা শিক্ষার নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে-এবং এখন আমাদের দেশে তার ঢালাও অনুমতি দানের ক্ষেত্রে-ক্রমশ সরকারি ব্যবস্থাপনা সংকুচিত ও ক্রমবর্ধমান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি-সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর অনমনীয় অবস্থান, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুক্ত আবহাওয়ার পরিপন্থী-সবটা মিলে অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব তো হয়েছেই। একদিকে স্বচ্ছতার অভাব, অন্যদিকে বিনিয়োগ, যা সরকারি অনুদানের মাধ্যমে তার হিসেব পেশের নিয়ম রক্ষা, সবে মিলেই একশ্রেণীর আমলাতন্ত্র ও একশ্রেণীর অশুভ শক্তির মিলন যে ঘটেছে তা প্রায় পুরো একটা পরিচ্ছেদ জুড়েই যশপাল কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত-যা সরকার অনুমোদিতও। অনুদানের ১ টাকার ১৩ পয়সাও কি যাদের জন্য ব্যয় হওয়া উচিত, তাদের হাতে পৌঁছুচ্ছে?

আইন-কানুনের প্রয়োজনীয়তা মানুষ তখনই বুঝবে যখন দেখবে তা সমানভাবে সকলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সংখ্যক শিক্ষক দরকার তা থেকে কম ছিল ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার-এআইইউ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বীকৃত সমীক্ষার ফসল এটি ২০০৩-'০৪ এর। বহু আংশিক সময়ের শিক্ষকও সংখ্যা পূরণের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ ইউজিসি অনুদান পাওয়ার উপযুক্ত মোট সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ অংশের (তারও কম) কাছাকাছি। শতকরা ৮০ ভাগ অনুদান যায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে-বাকি ২০ ভাগ বণ্টন হয় বিপুল সংখ্যার মাত্র ১/৪ অংশের মধ্যে 'কালনেমির লংকা ভাগ' কথাটার সঠিক প্রয়োগে। যে সব নিয়ম মেনে মান যাচাই করা হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার অন্যতম জাতীয় মান নির্ণায়ক সংস্থা 'ন্যাক'-এর মূল্যায়ন। যতগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যায়ন হয়েছে তার সিংহভাগ সারাদেশে উৎকৃষ্টতম তো নয়ই-মাঝারি মাপের সংখ্যা বেশি।

যশপাল কমিটির রিপোর্টে যে তিনটি বিষয় স্থান পেয়েছে তার অন্যতম উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ। সংক্ষেপে বলতে গেলে তার মধ্যে উল্লিখিত কয়েকটি হচ্ছে পরিকাঠামো, বিস্তার ও সুযোগ; রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও তা সংশ্লিষ্ট কলেজ, বাণিজ্যিক ও বেসরকারিকরণের রমরমা, ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়বাড়ন্ত ইত্যাদিসহ পরিচালন ব্যবস্থার সাথে অদক্ষতা ও বিতর্ক থেকে ধ্বংসও বাদ যায় নি। শিক্ষকদের যথেচ্ছভাবে নিয়োগ ও তাদের বাধ্য করা হচ্ছে পরিচালন সংস্থার মনোনীত ছাত্রদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণে বেশি নম্বর দিতে যাতে

www.pathagar.com

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ না হয়। 'compelling them tc pass marks in the internal examination to the 'favourites' and fail mar students who protest illegal collection and so on,' p. 33) যেমন এ রিপোর্টে ধরনের নেওয়া যাবে না বললেও বেসরকারি সংস্থা দিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর বলা আছে। বেসরকারি পেশাদারি সংস্থা যা লাভজনকভাবে গড়ে উঠেছে, যা আ আলোচিত হয়েছে, তা সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু ডিপ্লোমা বা প্রশংসাপত্র দিতেই-ডিগ্রিতে এ কথাও বলা আছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন কমিটি সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন- 'only an autonomous institution, free from regimentation of ideas and pressure of party or power politics, can persue truth fearlessly and build up in its teachers and students' habits of independent thinking and a spirit of inquiry unfettered by the limitations and prejudices of the near and the immediate which is so essential for the development of a free country.' NKC-ও বলেছে, 'the autonomy of universities is eroded by interventions from Government and instrusions from political process.' শিক্ষকের দায়বদ্ধতা নিয়েও এ দুটি রিপোর্টে যথার্থই বলা হয়েছে- বহু প্রতিষ্ঠানে তা যে মানা হয় না; উদাহরণ সহযোগে তাও বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "এ কথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে উঠে, ওটাকে একবার সুযোগ মতো পেলে হয়। কিন্তু ও-টাকে পায় কি, ও-ই আমাদের পেয়ে বসেছে; সুযোগ এ পর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।" (শিক্ষার হেরফের)

শিক্ষা ব্যবস্থায় যে গলদ তা ১৭৭৬ সালের অ্যাডামস স্মিথের রিপোর্টে আছে তা তখনও যদি মান্য করা হতো হয়তো এখন এভাবে ঘটতো না : 'খুবই কম খরচে সরকার প্রায় সমগ্র জনসাধারণকে শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলি অর্জন করার সুযোগ দিতে পারে, উৎসাহিত করতে পারে এবং তাদের ওপর এটা আরোপ করতে পারে।'

অ্যাডামস স্মিথের এ রিপোর্ট ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর যেমন তদানীন্তন ব্রিটিশেরা তাতে যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেনি-তেমনি বহু কমিটি/কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় সুপারিশ এখনও অবহেলিত। শিক্ষা যে অবহেলিত তা অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর *'দি কানট্রি অফ ফার্স্ট বয়েজ'* লেখায় বলেছেন : 'শ্রেণী, লিঙ্গ, ভৌগোলিক অবস্থান ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যগুলির দ্বারা পরিচালিত বিভেদের মধ্য দিয়েই এমনটা ঘটে যাবে।'

২০০১ এর জনগণের ভারতের এক-চতুর্থাংশ পুরুষ ও প্রায় অর্ধেক নারীকে নিরক্ষর বলে চিহ্নিত করেছে। নিরক্ষরতাকে শুধু অভিশাপ হিসাবেই নয়-বিপুল সংখ্যক মানুষকে অস্বাধীনতার মধ্যে ফেলে রাখা-দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, আইনি অধিকার ঠিকভাবে প্রয়োগের অসুবিধা, সাধারণভাবে স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়িয়ে তোলা, নারীদের ক্ষেত্রে শিশুদের বেঁচে থাকা ও সুস্থভাবে থাকার বিষয়েও ছোটো পরিবারের গুরুত্ব, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত-এ মত অধ্যাপক সেনের।

www.pathagar.com

জিডিপি'র কত অংশ কয়েকটি দেশ ব্যয় করে তার একটা হিসবে (আগরওয়াল ২০০৯(তুলে ধরা যাক– ব্রাজিল ০.৯২, রাশিয়া ০.৬২, চীন ০.৫, অস্ট্রেলিয়া ১.১৯, ইউ কে ১.০৭, ইউ এস ১.৮১ শতাংশ। সব দেশগুলির গড় হিসাব ১.৩৯ শতাংশ। ভারত এ বছর উচ্চশিক্ষায় বেশি ব্যয় করা হবে বলেও মাত্র ০.৩৭ শতাংশ ব্যয় ধরেছে।

প্রতি বছরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা কারিগরিতে ডিগ্রি পাচ্ছেন তার সংখ্যা ৩,৫০,০০০। এ সংখ্যা আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার গ্রাজুয়েটদের ৫ থেকে ৬ গুণ। সাধারণ ডিগ্রি নিয়ে যারা পাশ করছে ভারতে, তাদের সংখ্যাও আমেরিকার দ্বিগুণ ও চীনের দেড় গুণ। ভারতের পিএইচডি প্রাপকের সংখ্যা আমেরিকার এক–দশমাংশ, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে পিএইচডি প্রাপকের সংখ্যা বছরে ২৫, যা আমেরিকায় আট শতাধিক। এ হিসেব দিয়েছেন নারায়ণমূর্তি–তাঁর *'এ বেটার ইন্ডিয়া, এ বেটার ওয়ার্ল্ড'* বইতে (২০০৯)।

গবেষকদের সংখ্যা ভারতে প্রতি ১০ লাখ মানুষ পিছু ১১ জন, যা আমেরিকায় ৪৬০৫, চীনে ৭০৮, জাপানে ৫২৮৭ বছরে। এ হিসেব ভারত সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত ১৯৯২ রিপোর্টের। যার অন্যতম ফল প্রত্যক্ষ করা যায় পেটেন্টে, যার সংখ্যা ভারতে নগণ্য।

ভারতবাসীর ৪৪ শতাংশ শিক্ষায় অনগ্রসর। নীতি নির্ধারকদের ভ্রান্ত নীতির ফল হিসেবে একদিকে যেমন ৩১৮ মিলিয়ন মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসম্মত জল অধরা, ২৫০ মিলিয়ন মানুষ স্বাস্থ্য পরিবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ৬৩০ মিলিয়ন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের সুযোগ পান না ৫১ শতাংশ শিশুরা অপুষ্টির শিকার–তেমনি আবার অর্ধেক প্রাথমিক স্কুলে প্রতি দুটি শ্রেণীর জন্য ১ জন মাত্র শিক্ষক। (নারায়ণমূর্তির বই)।

কেন্দ্রীয় অনুদান উচ্চশিক্ষায় যা দেওয়া হয় তার মোট অনুদানের ৮৫ শতাংশ চলে যায় আইআইটি ইত্যাদি সংস্থা। এমন সংস্থার সংখ্যা ১৩০। শতকরা ৩ ভাগ ছাত্রছাত্রী এইসব সংস্থায় পড়াশুনা করে।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় দক্ষতাবৃদ্ধি পর্ষদ লক্ষ স্থির করেছে, ৫৩ কোটি ভারতবাসীকে ২০২০ সালের মধ্যে বর্তমান ৫ শতাংশ প্রশংসাপত্রধারীদের অনুপাত ৫০ শতাংশে নিয়ে আসবে উপযুক্ত দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়েই, যারা হবে সমগ্র বিশ্বের এক–চতুর্থাংশ। এরাই টেকনিশিয়ান হিসাবে গণ্য হবে। বর্তমানে বিশ্বের ৩৯.৭ কোটি কর্মক্ষম শ্রমিকের মধ্যে ৬৭ শতাংশ হয় নিরক্ষর, নয় অল্প সাক্ষর। আগামী দিনের দক্ষতানির্ভর প্রযুক্তির প্রধান কর্ণধার এই কুশীলবরাই হবেন এমন আশা এবং তার জন্য ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী তৈরি করেছে, যার মধ্যে যেমন সামনাসামনি ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া যাবে, একই সাথে দূর–শিক্ষার মাধ্যমে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তা হবে। এটি 'কনভারজেন্স কোর্স' হিসাবে গণ্য, এভাবে কমিউনিটি কলেজও চলছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এটি বেশ সমাদরে চলছে– জনপ্রিয়ও বটে। একমুখী শিক্ষার পরিবর্তে বহুমুখী শিক্ষা প্রচলন এখন বহু দেশেই ঘটছে। অবশ্যই তা হবে অলাভজনক পদ্ধতিতে। ইতিমধ্যে তিন শতাধিক এসব কলেজে বৃত্তিমূলক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় পাঠদান কমিউনিটি কলেজের মধ্যেমে চলছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ কী পরিমাণে তা এবার দেখা যাক। কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত শিশুশিক্ষার অধিকার, মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ৬০০০ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন (প্রতিটি ব্লকে ১টি করে) এবং এসব মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার লক্ষ্যে ঘোষিত।

গত বাজেটের তুলনায় শিক্ষায় বরাদ্দ বেড়েছে এবার ১৫ শতাংশ (৩৬,৪০০ কোটি থেকে ৪২০০০ কোটি) প্রারম্ভিক শিক্ষায় ১৫ শতাংশ (২১,৭০০ থেকে ২৫০০০ কোটি টাকা)

www.pathagar.com

বৃদ্ধি, তার মধ্যে সর্বশিক্ষা অভিযানে ১৫০০০ কোটি টাকা ও দুপুরের খাবারের জন্য ৯,৩০০ কোটি বরাদ্দ। ১লা এপ্রিল ২০১০ থেকে শিশু শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে খুব কম করেও (বি জি তিলকের মতো শিক্ষাবিদেরাও বলছেন) ১,৭১,০০ কোটি টাকা দরকার। দু বছরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩২,০০০ কোটি টাকা- (১৫,০০০ এসএসএ-তে ও ৯,৩০০ কোটি দুপুরের খাবার সরবরাহে)। ন্যূনতম প্রয়োজন এতে মিটবে না তা বোঝা যায়। পরিকল্পনা কমিশনের ৩৫,০০০ কোটি টাকার সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে। মাধ্যমিক ৪,৬০০ কোটি টাকা গত বছরে ছিল, এবার প্রস্তাব ৪,৭০০ কোটি টাকা। ৬০০০ মডেল স্কুলের মধ্যে ৩৫০০ পিপিসি মডেল (পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারিত্ব) হবে বলে আছে। ২০০৮-'০৯-এ ঘোষণা ছিল : দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক লেখাপড়া চালানোর জন্য বছরে প্রত্যেককে ৬০০০ টাকা দেওয়া হবে। তার জন্য ২০০৯-'১০-এ বরাদ্দ ছিল ৭৫০ কোটি। এবার তা হয়েছে ৯০ কোটি। ঘোষিত লক্ষ্যের বাস্তবায়ন এর পরেও ঘটবে? উচ্চশিক্ষায় ৯৬০০ কোটি টাকা (২০০৯-'১০) বরাদ্দের বদলে ১১,০০ কোটি বরাদ্দ হয়েছে ২০১০-'১১-তে। টেকনিক্যাল শিক্ষায় বরাদ্দ বেড়েছে গতবারের তুলনায় ৬০০ কোটি, (বেড়ে হয়েছে ৬০০০ কোটি টাকা বছরে)। এর মধ্যে আইআইটি'র জন্য বরাদ্দ ৪০০ কোটি।

এনসিএইচইআর (জাতীয় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কাউন্সিল) ইউজিসি ও আরও ১৩টি সংস্থা এআইসিটিই, এমসিআই, ইত্যাদির পরিবর্ত হিসাবে গঠিত হয়েছে। ইউজিসি'র জন্য ৭৩০০ কোটি ও এআইসিটিই ইত্যাদির জন্য ২০০ কোটি বরাদ্দ হয়েছে এ বাজেটে। (সূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট ও হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত এর প্রবন্ধ)

১৯৯৮ সালের UNESCO-র ঘোষণা : 'Public funding of higher education reflects the support that society provides to higher education and must be further strengthened to ensure the development of higher education, increase its efficiency and maintain its quality and relevance.' এর ঠিক বিপরীত চিত্রই বাজেটে প্রতিফলিত। বর্তমানের মুদ্রাস্ফীতির হার ধরলে প্রকৃত কত বরাদ্দ বাড়ল তারও সঠিক হিসাব কে করবে? প্রতিশ্রুতি সরকারের শিক্ষার অভিমুখ যা ছিল, এখনও, স্বাধীনতার ৬৩ বছর পরেও, সেই রজতরেখার সন্ধান ৯০ শতাংশ বা তার কাছাকাছি অবস্থিত ভারতবাসীরা কোথায় পাবে?

শিক্ষায় বেসরকারিকরণ ও উদারিকরণ ছাড়াও স্বাবলম্বী যে হওয়া যায়, তার বহু নিদর্শন আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা, সাহিত্যিক, বিশেষজ্ঞরা রেখেছেন ও রাখছেন। তার বিবরণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবুও কেরালা রাজ্যে 'কান্নুর জেলা'য় ১৫-৫০ বছর বয়সী ৯০ শতাংশ মানষে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভারতের এ ধরনের প্রথম জেলার শিরোপা পেতে চলেছে- নিজেদের প্রচেষ্টায়; এটা নিশ্চয়ই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। পশ্চিমী দুনিয়ার নকল তো নয়ই, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ তাঁরা রাখতে পেরেছেন। তাহলে? কোন্ বিদেশ-নির্ভর মরীচিকার পথে ছুটে চলেছে সরকার তার শিক্ষানীতির মাধ্যমে?

১৯৩৭ সালে কবিগুরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁর দীক্ষান্ত ভাষণে যে কথা বলেছেন তা দিয়ে শেষ করছি : "নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের।"

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র :

১. Hundred years of the University of Calcutta (1857-1957) C. U. Publication.

২. University Grants Commission Report.

৩. National Knowledge Commission-website.

৪. Trade in Education Services A consultation paper on Higher Education in India & GATS, an opportunity prepared by : Trade Policy Division, Dept. of Commerce, Govt. of India.

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৩-০৯-'০৯।

৬. CABE Committee Report.

৭. J B G Tilak.

৮. Edward Luce : Strange Rise of Modern India, 2008.

৯. J B G Tilak - Economic & Political Weekly, dt. 24-02-2007.

১০. Anandakrishnan.

১১. 'The Giants Awake : Higher Education Systems in China & India', Philips G Altbach, *EPW,* 17.02.07.

১২. Philip G Altabach, *EPW,* 06.06.09.

১৩. Tough choices or Tough Times - The Report of the New Commssion on the skill of American workforce, www.skillscommissioning.org.

১৪. *Facing Global & local challenges, Country Report - India.* Dept. of Commerce, GOI 2000.

১৫. The Times of India - 17.07.09/ 18.07.09.

১৬. Mukesh Ambani & Kumarmanagalam Birla - A Policy Framework for Reforms in Education, 2000.

১৭. Yaspal Commission Report.

১৮. *National Knowledge Commission Report - website.*

১৯. *Indian Higher Education : Envisioning The Future,* Pwan Agarwal, Sage Publication - 2009

২০. *NR Narayan Murthy, A Better India - A Better World,* Penguin, Allen Lane - 2009

২১. *Higher Education & Collaboration in Global Context : Building a Global Civil Society,* UK/US Study Group. July - 2009.

২২. The National Commission For Higher Education & Research Bill, 2010.

২৩. *Pakistan's Madrassas : The need for internal reform and the role of international Assistance,* Saleen H. Ali, Visiting Fellow, Brookings Doha Centre, Associate Professor, University of Vermont.

www.pathagar.com

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ

নজরুল ইসলাম

বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সরকার দেশ পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, সুতরাং নতুন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন ১৯৭৪ ও ড. মুহম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭-এর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করাই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রাসঙ্গিক সুপারিশসমূহের মূল্যায়নও বাঞ্ছনীয় হবে। উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন চিন্তায় বহু বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে, তবে আমি শুধু কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করবো। এগুলোকে আমি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। বলা বাহুল্য, এগুলোর বাইরেও বেশ কিছু বিষয় রয়েছে, যাদের গুরুত্বও কম নয়। অথবা আমার চিহ্নিত সকল চ্যালেঞ্জ সবার কাছে অগ্রাহ্য নাও হতে পারে। আমার চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরূপ :

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;
উচ্চশিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণ;
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক বিস্তারণ ও বৈষম্য;
বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান ধারা : সাধারণ বনাম বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বনাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়;
উচ্চশিক্ষার ভাষা-মাধ্যমে: বাংলা বনাম ইংরেজি;
উচ্চশিক্ষায় গবেষণার গুরুত্ব;
উচ্চশিক্ষায় অর্থায়ন;
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন/গভর্ন্যান্স: স্বায়ত্তশাসন ও সুশাসন;
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

উপরোক্ত প্রতিটি চ্যালেঞ্জ বা বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় আমি ড. কুদরাত-এ -খুদা কমিশন ১৯৭৪, জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭ ও ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদি (২০০৬-২০২৬) কৌশলপত্রের সুপারিশসমূহকে বিশেষভাবে বিবেচনা করেছি।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল: "... আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র

www.pathagar.com

ও ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ... দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান দ্বারা
জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।"

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ প্রতিবেদনে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে- "ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।"

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের মতামত অন্যান্য কমিশনও গ্রহণ করেন। যদিও কোনো কোনো মধ্যবর্তী কমিশন জাতীয়তাবাদ কথাটি সুকৌশলে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গটি সরাসরি বর্জন করেছেন। মূলত উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যকে কমিশনগুলো সুনিপুণ, জ্ঞানদক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি, যাদের মাঝে কর্মানুরাগ, জ্ঞানস্পৃহা, জ্ঞানের উদ্ভাবন, চিন্তার স্বাধীনতা, দক্ষ জনসম্পদ, ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধকেই উল্লেখ করেছেন। ইউজিসি কৌশলপত্রে উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ধরা হয়েছে রপ্তানিযোগ্য সুদক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা, যারা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণ করবে। বর্তমান সরকারের ঘোষিত 'ভিশন ২০২১' হচ্ছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন, অর্থাৎ সমৃদ্ধ, আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্ন। আমরাও মনে করি শিক্ষার লক্ষ্য অবশ্যই হবে বৈষম্যহীন, দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। সে ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষা ও মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার বিকল্প নেই।

উচ্চশিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণ

আমরা জানি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আধুনিক উচ্চশিক্ষার গোড়াপত্তন ঘটে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যদিও উচ্চশিক্ষার একটি আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহুকাল আগে রচিত হয়েছিল। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বলতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ের সকল শিক্ষাকে বোঝায়। আমাদের দেশে মূলত দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা দেয়া হয়, যথা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নিয়মে পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। আমি মূলত ক্যাম্পাসভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করবো অর্থাৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমার আলোচনায় তেমন থাকবে না।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য দুই ধরনের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশে এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে।

বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণের বিষয়টি বিতর্কের ঊর্ধ্বে, এমনকি উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষারও সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। তবে তা বিদ্যার সকল শাখা বা বিষয়ে একই পরিমাণে হতে হবে তা নয়। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধির পক্ষে কুদরাত-এ-খুদা কমিশনসহ সকল কমিশনই স্পষ্ট সুপারিশ করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ৩৮ বছরে এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুল হারে বেড়েছে। ১০৭৪-'৭৫ সালে দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল

www.pathagar.com

৩০ হাজারেরও কম। ২০০৭ সালে শুধু ক্যাম্পাসভিত্তিক ২৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১,৬৩,০০৪। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজের (১৭০৯টি) ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯,৯০,৪৩৮ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,৪৬,৪০১ জন। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুল হারে বাড়ছে। পাশাপাশি দেশের ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ১,৭০,৫০৫–এর মতো। উল্লেখযোগ্য যে, তুলনামূলকভাবে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। এ তথ্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়া সত্ত্বেও এ হার সামগ্রিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণযোগ্য বয়ঃক্রমের (১৭–২৪ বছর) তরুণদের মাত্র ৪%, যা দেশ ও জাতীয় জীবনের চাহিদার সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অথচ আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই হার ১৩%–এরও বেশি, থাইল্যান্ডে প্রায় ৪০%।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বাড়ার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্রে ২০২৬ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ২৮টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছে। ১৯৯৬–২০০১–এর আওয়ামী লীগ সরকার ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিল, যার কয়েকটি পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রস্তাবিত ১ নং বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়ন সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় রহিত করা হয়েছিল।

সরকারি খাতে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অর্থসংস্থান একটি বড় সমস্যা। অন্যদিকে বেসরকারি খাতে সহজেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সংখ্যা ও মানের সমন্বয় সাধন সমস্যাই বটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক বিস্তারণ ও বৈষম্য

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন দর্শনে যেখানে সংবিধানে শুরু থেকেই সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল, সেখানে সকল রকম বৈষম্য দূর বা হ্রাস করার অঙ্গীকার থাকার কথা। আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস প্রয়াসের দর্শনের বিবেচনায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ–সুবিধা প্রতিষ্ঠায় ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক ভারসাম্যের কথা ভাবতে হবে।

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ তথা পূর্ব–পাকিস্তানে ১৯৫৩ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় (১টি কৃষি ও ১টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে কুদরাত–এ–খুদা কমিশন ১০৭৪ সালে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা চারটি প্রশাসনিক বিভাগের একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। খুলনা বিভাগে যেহেতু কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তখন পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি তাই বাংলাদেশে জনসংখ্যার এক–পঞ্চমাংশের কথা বিবেচনা করে এখানে ভবিষ্যতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। এছাড়া ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে ঢাকা বিভাগে অধিকসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। তারই প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৯২ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৯২ এর পূর্ব পর্যন্ত পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সে বছর থেকে আবার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নামে নতুন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে।

www.pathagar.com

বর্তমানে দেশের ৩১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১৬টি জেলায় অবস্থিত। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চলেই ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। এ ছাড়া দেশের মোট ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২টি ঢাকায়, ৬টি চট্টগ্রামে এবং ৩টি সিলেটে অবস্থিত। অতএব দেখা যাচ্ছে, দেশের সর্বমোট ৮২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯টি ঢাকা মহানগর অঞ্চলে অবস্থিত, যা আঞ্চলিক বিবেচনায় অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বগুড়া ও বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে এখন পর্যন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে গড়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক রচিত কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০০৬–২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২৬ সালের মধ্যে যে আরো ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ৮,০০৯ জন শিক্ষক ও ২৬,৬৯৫ জন কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে। একই সঙ্গে প্রয়োজন হবে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের।

আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে দেশের প্রত্যেকটি বৃহত্তর জেলায় অন্তত একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় বা সে পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় এবং ক্রমান্বয়ে ৬৪টি জেলার অধিকাংশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা যেতে পারে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা উচিত, অবশ্য তাদের জন্য অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা গুরুত্ব পাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ধারা : সাধারণ বনাম বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বনাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

কুদরাত–এ–খুদা কমিশন ১৯৭৪–এ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মসূচি বা শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য আগাগোড়া সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এছাড়া কমিশন প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাক্রমে কলা ও মানবিক বিষয়সমূহ সংযোজন করা বাঞ্ছনীয় বলে মত দেয়। ওই কমিশন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়'রূপে গড়ে ওঠার মত প্রকাশ করে। কমিশন প্রকৌশল ও ফলিত বিজ্ঞান প্রসারের জন্য প্রতিটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েই কৃষি, কারিগরি ও চিকিৎসা বিষয়ক ফ্যাকাল্টি রাখার প্রস্তাব করে।

অনুরূপভাবে প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টির সুপারিশ করে। অবশ্য কমিশন মনে করে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা থাকতে পারে। কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও তাদের পূর্ণাঙ্গ হতে হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন শাখার ছাত্র ও শিক্ষকদের সান্নিধ্যে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়।

কুদরাত–এ–খুদা কমিশন ১৯৭৪ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়' সুপারিশ করলেও যুগের চাহিদার কারণে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ; বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ঢাকা টেক্সটাইল কলেজকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার প্রস্তাব এসেছে। টেক্সটাইল খাতের গুরুত্ব অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য কিন্তু এরকম বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বায়ন ও বিশেষায়নের যুগেও সর্বাঙ্গীণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতেই হবে।

www.pathagar.com

বিকল্প চিন্তা হতে পারে এরকম একটি কলেজকে কোনো প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন একটি অনুষদ হিসেবে যুক্ত করা। যেমনটি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা কলেজ তথা ইন্সটিটিউট থেকে চারুকলা অনুষদ। অন্যদিকে দেখা যায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠিত বড় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক কোনো বিভাগ নেই। একইভাবে দেখা যায়, দেশের ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর আগেও বাংলা ভাষা-সাহিত্য শেখাবার কোনো বিভাগ ছিল না। অনেকটা আমার ব্যক্তিগত তদবির বা চাপে সম্প্রতি ৪/৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা নিয়েছে।

যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ দেশের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে অনুমোদিত ও প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের নির্ধারণের কথা বলেছে। বর্তমানে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১,৭০,৫০৫ শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই মান সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে, যে কারণে একটি নতুন অধ্যাদেশও বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অনুমোদন পেয়েছে। অবশ্য বর্তমান সংসদে এটি আইনে পরিণত না হলে পুরানো অধ্যাদেশই বহাল থাকবে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষার মান নিশ্চিত করার বিষয়টি নতুন করে ভাবতে হবে।

উচ্চশিক্ষার ভাষা-মাধ্যম : বাংলা বনাম ইংরেজি

শিক্ষার মাধ্যম আমাদের দেশে একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে সর্বস্তরের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমান বাস্তবতা হলো এরকম যে প্রায় সকল সরকারি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় (প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, ভেটেরিনারি, মেডিকেল) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একমাত্র ইংরেজিকে ব্যবহার করছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে ব্যবসা-প্রশাসনে, এমনকি অন্যান্য অনেক বিষয়েও ইংরেজির ব্যবহার প্রচলন করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো শুধু ইংরেজিকে মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষার ভাষা ইংরেজি না বাংলা হবে সে বিতর্ক স্পর্শকাতর হবেই। তাছাড়া বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক বাজারের প্রসঙ্গটি এসে যায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে বলেছে যে, শিক্ষার মান হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের কোনো বিকল্প নেই এবং সেই কারণেই কমিশন ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলাভাষায় ভাষান্তরের জন্য মত দেয়। তবে কমিশন এটিও মনে করেছিল যে, বাংলা ভাষায় বই, সাময়িকী অনুবাদ করা এখনো পর্যাপ্তভাবে হয়নি। তাই কমিশন 'সাময়িকভাবে হলেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজি মাধ্যম চালু রাখা যেতে পারে' বলে মত দেয়। এছাড়াও কমিটি চার ও তিন বছর স্নাতক কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা বিষয় হিসেবে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে, যা পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০০৬-২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ইংরেজিকে প্রাধান্য দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। 'প্রাধান্য' বলতে কী বোঝানো হয়, তা পরিষ্কার নয়। আমাদের

www.pathagar.com

শিক্ষাবিদদের একটি নৈতিক দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম ভাষা সম্পর্কে আরো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা।

উচ্চশিক্ষায় গবেষণার গুরুত্ব

একথা স্বীকৃত যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা, শুধু প্রচলিত জ্ঞান বিতরণ নয়। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি বা উদ্ভাবন সম্ভব একমাত্র গবেষণা ও মৌলিক চিন্তার মাধ্যমে। কুতরাত-এ-খুদা কমিশন ১৯৭৪ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণাকর্মের ওপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে মতামত দেয়। এর পাশাপাশি কলেজসমূহেও গবেষণার জন্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া প্রয়োজন বলে মতামত দেয়। কিন্তু ওই সুপারিশ অদ্যাবধি তেমনভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বরং বরাবরই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা একটি গৌণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণের সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের গবেষণার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চমূল্যের গবেষণা ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে হলে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ গবেষক দল গড়ে তোলার সুপারিশ প্রতিটি কমিশনই করেছে। সেই সঙ্গে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার সুপারিশ করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কৌশলপত্রেও গবেষণার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, নানামুখী প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং এ খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়াবারও প্রস্তাব রেখেছে। সার্বিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপির অতি স্বল্প পমিাণ অর্থ বরাদ্দ থাকে (সর্বোচ্চ ২.০ শতাংশ)। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এর আনুপাতিক পরিমাণ মাত্র ০.১২ শতাংশ। অচিরেই এই হার অন্তত ০.৩০ শতাংশ করা আবশ্যক। যেহেতু রাষ্ট্রীয় খাত থেকে গবেষণার জন্য স্বাভাবিক বরাদ্দ নিকট ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়, সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বস্তুত উচ্চশিক্ষায় গবেষণার উন্নতিকল্পে নানামুখী উদ্যোগের কথা ভাবতে হবে। তাছাড়া দেশেই যেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমএস/এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রির জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যায় সে রকম পরিকল্পনা নিতে হবে। বিশেষ করে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তিসুবিধা বৃদ্ধির প্রয়াস রাখা। গবেষণায় অর্থ ও অবকাঠামো ব্যবস্থার পাশাপাশি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন আমরা দেশের জন্য জরুরি বিষয়গুলোতে গবেষণায় অধিক মনোযোগ দিই, খাদ্য উৎপাদন, জ্বালানি, বিশুদ্ধ পানি, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ প্রতিরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্যসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মেধা ও শ্রম ব্যয় করি।

একটি বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, শত প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, প্রকৌশল, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে বহু নিবেদিতপ্রাণ মেধাবী গবেষক আছেন যারা যথার্থই বিশ্বমানের। সৃজনশীল লেখক, শিল্পীও আছেন যাঁদের নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। এরকম শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক, এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষায় অর্থায়ন

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য পর্যাপ্ত বা প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের সুপারিশ করেছে। সরকারি অনুদান ছাড়াও শিক্ষার্থীদের বেতন, ব্যাংকঋণ বা ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ব্যয়নির্বাহের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক স্বচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা হবে বলে মত প্রকাশ করে। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণ করার জন্য বলা হয়। কিন্তু এদের যৎসামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে।

ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্রে ২০১৬ সালের মধ্যে বিশ্বমানের একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ বিলিয়ন টাকা।

এছাড়া কৌশলপত্রে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যয়ভার মেটাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারের বরাদ্দ কমিয়ে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় বাড়াতে ছাত্রবেতন বৃদ্ধির যেমনি সুপারিশ করা হয়েছে, তেমনি সামর্থ্যবানদের বেতন বৃদ্ধি এবং যাদের সামর্থ্য নেই তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ বিনামূল্যে প্রদানেরও সুপারিশ করা হয়। কৌশলপত্রে বেসরকারি ও শিল্প খাতের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো, অ্যালামনাই গ্র্যাজুয়েট ট্যাক্স, সনসালট্যান্সি, ক্যাফেটেরিয়া, সাইবার ক্যাফে, প্রকাশনা, পেশাগত সান্ধ্যকালীন কোর্স পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এন্ডাউমেন্ট ফান্ড গঠন ইত্যাদি উপায়ে আয় বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য এনজিও কিংবা বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক ঋণ কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নেয়ার প্রতিও জোর দেয়া হয়।

বলা বাহুল্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় বৃদ্ধি করা বা আত্মনির্ভর হওয়ার সুপারিশ আর সেগুলোর বাস্তবায়ন এক কথা নয়।

অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শুধু স্বনির্ভর হচ্ছে তাই নয়, বরং সঞ্চয় সম্ভব করছে এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে। শিক্ষার পরিবেশ ও মান সম্পর্কে তাদের অধিকাংশেরই অবশ্য তেমন মাথাব্যথা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন/গভর্ন্যান্স: স্বায়ত্তশাসন ও সুশাসন

বিশ্ববিদ্যালয় মূলত মুক্তিচিন্তার কেন্দ্র। সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ধরন স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক, বিশেষ করে তাদের একাডেমিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়েছিল। ১৯৭৩-এর বিধিবিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কলুষিত হচ্ছে এমন অভিযোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন, ডিন নির্বাচন এবং ভাইস চ্যান্সেলর

www.pathagar.com

নির্বাচন সংক্রান্ত আইনে সংশ্লিষ্ট ধারা কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছিল। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০০৬–২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন পুনর্নির্ধারণ করে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

১৯৭৩–এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংস্কারের স্বার্থে যে কোনো প্রস্তাব বা আলোচনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় মনে করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান বহুবার সংশোধিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ বাস্তবে সম্ভব হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতার বিষয়টি যেমন স্বীকৃত, পাশাপাশি সমাজ তাদের কাছে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতা আশা করে। সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, এমনকি দুর্নীতির এতো ব্যাপক প্রসার ঘটেছে যে, সম্প্রদায়গতভাবে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছি। সম্প্রতি প্রকাশিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের 'শিক্ষানীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনের একাধিক রচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি আলোচিত হয়েছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে দুর্নীতি দূরীভূত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার সময়ের দাবি। এটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জও বটে।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

গত বছর জানুয়ারিতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি সরকার চিন্তাভাবনা করেছে, বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলির পরিমার্জন এবং পরিবর্তনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়াস নিয়েছে। কিন্তু বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলির বাইরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি বা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেয়ার আগ্রহ বা সক্ষমতা সরকারগুলি দেখাতে পারেনি। প্রায় প্রতিটি সরকারই অবশ্য একটি জাতীয় শিক্ষা নীতি নির্ধারণের জন্য কমিশন করেছে। সর্বশেষ প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন ২০০৩ সালে তার প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রতিবেদনের আলোকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিগত জোট সরকার একমুখী শিক্ষার নামে একটি পশ্চাৎপদ ব্যবস্থা জাতির ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বর্তমান সরকার তা বাতিল না করলেও এর বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছে। আমরা আশা করি এটি শিগগির বাতিল হবে।

বিগত সরকারের আমলে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান সরকার তা সংশোধন করেছে, ফলে শিক্ষার্থীরা এখন প্রকৃত ইতিহাসটি সম্পর্কে জানতে পারছে। এজন্য সরকার সাধুবাদ পাবে। কিন্তু একই সঙ্গে বছরের শুরুতেই যাতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠ্যবই হাতে পায়, এবং পাঠ্যবইগুলি ত্রুটিমুক্ত এবং আকর্ষণীয় হয়, সে ব্যবস্থাও করতে হবে। স্কুল-কলেজের পরিচালন-সভাগুলিতে এখন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপস্থিতি নেই বলে তাদের কাজেকর্মে গতিশীলতা এসেছে। কিন্তু এ বছরের শেষে যে নির্বাচন হবে, তাতে একটি নির্বাচিত সরকারই দেশ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব পাবে। তখন যাতে আবার পুরনো অবস্থায় ফিরে যেতে না হয়, সে লক্ষ্যে এখনি বেশকিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করে ফেলতে হবে। শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির টিকে থাকার অবলম্বন, তার এগিয়ে যাবার শক্তি। শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করার কোনো অধিকার কোনো সরকার, দল বা ব্যক্তির নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কথাটি যত সহজে বলা হলো, তা কাজে ফলানো ততটাই কঠিন। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক/প্রশাসনিক সদিচ্ছা; যারা সংস্কার করবেন, তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা; অর্থ ও মানবসম্পদের সমাবেশ: সমাজের সমর্থন এবং সংস্কারের সুফল টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজের অঙ্গীকার। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার

www.pathagar.com

অগ্রহণযোগ্যভাবে কম হলেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ মোটেও কম নয়। কাজেই সদিচ্ছা ও সম্পদের অভাবই হচ্ছে সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এই সরকার যদি শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করে যেতে পারে তাহলে আগামীর রাজনৈতিক সরকারগুলি তা স্থগিত বা বাতিল করতে পারবে না, সমাজ তা হতে দেবে না। আর এই সরকার যদি সম্পদের সমাবেশ কিছুটা হলেও ঘটাতে পারে, তাহলে আগামীতে এর পরিমাণ বাড়বে। এই ব্যাপারে সমাজে একটি ঐকমত্যও তৈরি হয়েছে।

একটি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সম্ভাবনা ইতোমধ্যেই দেখা গেছে এবং এ লক্ষ্যে কিছু ধারণাগত বা তাত্ত্বিক কাজও হয়েছে এবং তা হচ্ছে, উচ্চশিক্ষা। উচ্চশিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে আগ্রহটা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা থেকে একটু বেশি বললে ভুল বলা হবে না। এর কারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ না করলে সরকারি বেসরকারি চাকরি হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়তে হয়। এরকম একটি ধারণা প্রায় সকলের মধ্যেই আছে। দেশ পরিচালনার জন্য সুশিক্ষিত নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকেই আসবে, মানুষ এরকম একটি বিশ্বাসও পোষণ করে। তাছাড়া, দেশের ক্রান্তিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশকে নেতৃত্ব দেয়, এ সত্যটিও আমাদের ইতিহাসের অংশ। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু মান তেমন বাড়েনি; এই অভিজ্ঞতা থেকেও দেশের মানুষ উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। এর ফলে এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে যেমন সম্যক একটি ধারণা তৈরি হয়েছে, তেমনি এগুলোর সমাধান কি হতে পারে, সে বিষয়েও মানুষের ধারণা রয়েছে। বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক-সভা উচ্চশিক্ষা নিয়ে আলোচনা ও গোলটেবিল সংলাপ আয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করেছে। পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ প্রাক্তন, বর্তমান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরও এ বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। এগুলোর প্রকাশ ঘটে লেখালেখি, অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ইত্যাদিতে। যদি এসবের একটি সারসংক্ষেপ করা হয়, দেখা যাবে উভয় শ্রেণীর চিন্তায় নিচের সমস্যাগুলিই প্রধান :

ক. উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব;

খ. শিক্ষার ঈপ্সিত মানের অভাব; শিক্ষা-উপকরণ, বইপত্র, গবেষণাগার ইত্যাদির অভাব;

গ. শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি, এবং রাজনীতির কারণে সংঘাতের পরিবেশ, শিক্ষা-সময় দীর্ঘায়িত হওয়া, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ইত্যাদি;

ঘ. শিক্ষা ক্ষেত্রে অপ্রতুল বরাদ্দ;

ঙ. শিক্ষার সঙ্গে সময়ের চাহিদার সম্পর্ক না থাকা (অনেক ক্ষেত্রে সময়ের চাহিদার পরিবর্তে 'বাজারের চাহিদা' কথাগুলো গুরুত্ব পায়; পাঠ্যক্রমে নতুন নতুন বিষয়ের সংযুক্তি না হওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে সেকেলে পাঠ্যক্রম চালু থাকা;

চ. শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রযুক্তির সমাবেশ না ঘটানো;

ছ. শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য তথা ধনী-গরীব, গ্রাম-শহর বিভাজন স্পষ্ট হওয়া। গত দশ পনেরো বছরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আত্মপ্রকাশ ও বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই বৈষম্যের সমস্যাটি একটি অভিযোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জ. প্রাইভেট পাবলিক বিভাজনে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় একটি দ্বৈত নীতির প্রকাশ যা শিক্ষার মূল আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এবং

ঝ. জীবনমুখী শিক্ষার পরিবর্তে সনদমুখী শিক্ষার প্রাধান্য।

www.pathagar.com

এর বাইরেও আরো সমস্যা রয়েছে, যেমন বইপত্রের চড়া দাম, গবেষণাপত্র, জার্নাল ইত্যাদির অভাব, সহশিক্ষা কার্যক্রমের অপ্রতুলতা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের–যা ছাত্রসংখ্যার হিসেবে দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় তার দীনদশা, ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটির পেছনে সত্য রয়েছে এবং এদের সমাধানও রাতারাতি সম্ভব নয়। বরং বলা যায়, যত দিন যাবে, সমস্যার তালিকা আরো দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে, এসব সমস্যা নিয়ে আমাদের উচ্চশিক্ষা একুশ শতকের পথ পাড়ি দিতে পারবে না এবং এগুলোর সুষ্ঠু এবং যথাশীঘ্র সমাধান প্রয়োজন, যতই কঠিন বা ব্যয়বহুল তা হোক। উপরোল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব যদি সরকার, নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্টরা ছাত্র–শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই এ ব্যাপারে সমন্বিত একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য উদ্যোগটি আসতে হবে সরকার থেকে। একই সঙ্গে, বেসরকারি খাতেরও অংশগ্রহণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় হবে। তবে একটি দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার মূল ভিত্তিটি হতে হবে জনমুখী এবং সর্বজনীন, অর্থাৎ পাবলিক এবং তা সকল শিক্ষার্থীর সাধ্যের মধ্যে থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি, সেগুলো হলো :

–অর্থায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। সরকারের উচ্চ শিক্ষাসহ সার্বিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে তাদের গবেষণা, উন্নয়ন কার্যক্রম ও অন্যান্য উপায়ে নিজস্ব কার্যক্রমের কিছুটা হলেও অর্থায়ন করতে পারে, তার উদ্যোগ নিতে হবে।

–বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতিতে সরকার বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের জড়িত হওয়ার বিষয়টি বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাঙ্গনে নগ্ন দলীয় রাজনীতি চর্চা, বিশেষ করে শিক্ষকদের, একেবারেই নিরুৎসাহিত করতে হবে। কোনোক্রমেই শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও সংঘর্ষের পরিবেশ চলতে দেয়া উচিত হবে না। যদি দলীয় রাজনীতির অশুভ প্রভাব না থাকে, শিক্ষাঙ্গনগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি, ছাত্রভর্তিতে স্বচ্ছতা ও নিয়মানুবর্তিতা ফিরে আসবে। একই সঙ্গে উপাচার্যসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদে নিয়োগও স্বচ্ছ করতে হবে।

–শিক্ষার মান উন্নয়নে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষকদের প্রশ্নাতীত যোগ্যতা থাকতে হবে। পাঠ্যক্রম ও পাঠদানের উন্নত মান নিশ্চিত করতে হবে এবং গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার সর্বশেষ প্রযুক্তি ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক অ্যাক্রেডিটেশন প্রথা চালু করতে হবে।

–শিক্ষকদের জন্য বৃত্তি ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

–বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যবস্থাগ্রহণের অঞ্চলগুলি এতই ব্যাপক যে, এগুলোর সংক্ষিপ্ত কোনো তালিকা করা সম্ভব নয়। তারপরও ওপরের ক্ষেত্রগুলিতে কাজ শুরু হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে এবং উচ্চশিক্ষার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

বর্তমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে পুনর্গঠন করে চেয়ারম্যানসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছে। পুনর্গঠিত কমিশন ইতোমধ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

উচ্চশিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সংস্কারের জন্য দেশে একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই রয়েছে, যদিও এর শুরুর উদ্দেশ্য তা তেমন একটা পূরণ করতে পারেনি এবং

www.pathagar.com

তা হলো বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। ১৯৭২ সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সম্পদের সমাবেশ ঘটানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠানটির শক্তি সীমিত; এর আর্থিক সংগতিও সরকারের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজে সমন্বয় দূরে থাক, এগুলোর ভালোমন্দ সম্পর্কেও প্রতিষ্ঠানটি সবসময় ওয়াকিবহাল নয়। বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নানা অনিয়ম এবং স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এর কোনো ফলপ্রসূ ভূমিকা চোখে পড়েনি। অথচ এ প্রতিষ্ঠানটি হতে পারে দেশের উচ্চশিক্ষার মান অর্জন ও বৃদ্ধিতে এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টিতে একটি প্রধান মাধ্যম।

এছাড়া মঞ্জুরি কমিশনকে যদি নিচের প্রস্তাবনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা যায়,তাহলে এটি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আরো ভালোভাবে পালন করতে পারবে :

– আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি সত্যিকার স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠিত করা। এজন্য এর চেয়ারম্যানকে কোনোরকম দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়োগ না করে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়াটা উচিত হবে। একই সঙ্গে তার মর্যাদা একজন কেবিনেট মন্ত্রীর সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখোমুখি বা এর একটি অঙ্গসংগঠন হিসেবে নিয়ন্ত্রিত না হয়;

– এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের নিয়োগে স্বচ্ছতা ও তাদের কর্মপরিধি বাড়াতে হবে;

– এর লোকবল প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে যৌক্তিকীকরণ করতে হবে;

– মঞ্জুরি কমিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে:

– পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা;

– পাঠক্রমের মান নিশ্চিত করা;

– শিক্ষকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা এবং যোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

– ভর্তি পরীক্ষা স্বচ্ছ ও সুসমন্বিত করা;

– নতুন বিভাগ চালু, নতুন বিষয় নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেয়া;

– গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে সহায়তা দেয়া;

– সুশাসন নিশ্চিত করা;

– একটি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল তৈরি করে প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক মান নির্দিষ্ট করা এবং এর ক্রমাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

–প্রতি দশ বছরের জন্য একটি 'ভিশন–পেপার' তৈরি করে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরিসহ অন্যান্য সকল পরিকল্পনার রূপরেখা বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া;

–প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখা, যেহেতু এটি এখন একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা এবং মানের ক্ষেত্রে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে। একই সঙ্গে পাবলিক প্রাইভেট বৈষম্য ঘুচিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একটি সমতলে নিয়ে আসা।

স্বল্প পরিসরে উচ্চশিক্ষার সংস্কারের মতো একটি ব্যাপক ও জটিল বিষয়ের সুচারু বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তারপরও, যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হলো, সেগুলির দিকে আশু নজর দিলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উচ্চশিক্ষায় আমাদের অগ্রযাত্রা অনেকটাই নিশ্চিত হবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় খুন হয়ে যাচ্ছে!

মহীউদ্দীন খান আলমগীর

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হালফিল কথকতা : বিশ্ববিদ্যালয় খুন হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক অসন্তোষ ও সরকারী অব্যবস্থাপনার নতিজা হিসাবে সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বন্ধ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একই কারণে শ্রেণীকক্ষসমূহ ছাত্রশিক্ষকবিহীন নিরবতা নিয়ে শুনসান। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলো বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এখানেও নাকি বেকসুর খালাস পাওয়ার কাবেলিয়াত রক্ষা করতে পারেনি। বেসরকারী পর্যায়ে ভিকারুননিসা বিশ্বদ্যিালয়ের দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির পর তা সরকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমোদন বা মঞ্জুরি বেফায়দা বেকামীন হয়ে গেছে। মামলা উঠে এসেছে সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত। যেখানে সকল দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ-প্রচেষ্টা আগুয়ান ও সফলতার দাবিদার সেখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নিয়মের নিগড়ে উচ্চশিক্ষা প্রসারণের সদিচ্ছাকে পিষে মেরে উচ্চশিক্ষা প্রসারে সম্ভাব্য সমাজপ্রচেষ্টা পূর্ণাঙ্গভাবে নিরুৎসাহিত করার পাকাপোক্ত বুনিয়াদ কায়েম করতে মুলকের কায়েদান সুবাশামতকলীফে মুজবর হয়ে রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় খুন করার তালিকায় সর্বশেষ স্থান পেয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সুনির্দিষ্ট আইনের আওতায় ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্প।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ স্থাপনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গৃহীত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় (পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২ পরিকল্পনা কমিশন, পৃ. ৪২৪)। এই লক্ষ্যের প্রথম পর্যায়ে ৬টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৬টি যেসব জেলা সদরে বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেখানে স্থাপন করা হবে বলে স্থিরীকৃত হয়। প্রথম পর্যায়ের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ব্যয়াঙ্ক প্রায় ১০৬ কোটি টাকায় প্রাক্কলিত হয়। এসব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিকভাবে ৫টি বিভাগ, যথা-প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, কৃষি বা খনিজ বিজ্ঞান (স্থান বিশেষে), ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে যাত্রা শুরু করবে বলে স্থিরীকৃত হয়। ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় কম্পিউটার বিজ্ঞানের ওপর। পৃথিবীব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তিকে দেশের কল্যাণে আয়ের আধার হিসাবে ব্যবহার করার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে সর্বসম্মতভাবে কম্পিউটার বিজ্ঞানে বিশাল লোকবল গড়ার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। বলা হয়, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা আনার জন্য বিভিন্ন জেলা সদরে তাদের অবস্থান নির্ধারিত হবে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত এই লক্ষ্য অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দেশের ১২টি পুরনো জেলা সদরে (যেখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই) একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১ম পর্যায়ে ৬টি) প্রকল্পটি অনুমোদিত অবয়বে বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে নির্মিতব্য এই ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটিতে স্থাপিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর মধ্যে পটুয়াখালীতে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় দুমকীতে বিদ্যমান কৃষি কলেজ এবং দিনাজপুরে স্থাপনীয় বিশ্ববিদ্যালয় হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজকে ভিত ও কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে মূলত কৃষি বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ-কেন্দ্র (centre of excellence) হিসাবে গড়ে তোলা হবে বলে স্থিরীকৃত হয়। রংপুরে স্থাপনীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র ও বন-সম্পদ বিজ্ঞানে বিশেষায়িত উৎকর্ষকেন্দ্র হবে বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মেধাভিত্তিক প্রয়োজন-অন্ধ (need blind) ভর্তির সূত্র ও সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসরণ এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ দেয়া হয় ৮ কোটি টাকা (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ১৯৯৯-২০০০, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের তরফ থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। এই গুরুত্বের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০০০-২০০১-এ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয় ১০ কোটি টাকা।

১৯৯৯ সালের ৯ নভেম্বর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৬টি নির্মিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে ৬ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিযুক্তি দেয়া হয়। এঁরা হলেন, সর্বঅধ্যাপক মুঃ খায়রুল আলম খান (গোপালগঞ্জ), মুঃ আনিসুর রহমান (দিনাজপুর), মুঃ খালেকুজ্জামান (রংপুর), আমিনুল হক (টাঙ্গাইল), এইচকে ইউসুফ (পটুয়াখালী) ও মুঃ সেকান্দার খান (রাঙ্গামাটি)। সপ্তম সংসদের শেষ অধিবেশনে প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিতব্য ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাস করা হয়। পাসকৃত আইনে বলা হয় যে,সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই আইনসমূহ যথাসময়ে কার্যকর করবে। গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার এই আমলাতান্ত্রিক সহজতম কাজটি তৎকালীন শিক্ষা সচিব ড. সাদত হোসেন সময়মতো করতে অপারগ হন। এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০১-এর জুলাই মাসের ১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে ইতোমধ্যে নিযুক্ত ও কর্মরত প্রকল্প পরিচালকদের নিয়োগের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের কাছে পাঠান এবং রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী একই মাসের ১৯ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর তা অনুমোদন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট সচিব ও উপদেষ্টাদের কারসাজিতে শুরু হয় এই ক্ষেত্রে ভানুমতির অপরিশীলিত খেলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় খুন করার ষড়যন্ত্র।

সংবিধানের ৫৮ খ (১) অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দু'টি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী তিন মাসকালে অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে দায়িত্ব পালন করবে এবং

www.pathagar.com

প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্ত রূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করবে এবং এই রূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। এই অনুচ্ছেদের ২ উপঅনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনকে যথাপ্রয়োজন ও সম্ভব সাহায্য ও সহায়তা দেবে। অন্য কথায়, সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগের সরকারের আমলে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি হিসাবে গৃহীত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণের প্রকল্প বাতিল কিংবা সংশোধন করতে পারে না। একই সূত্র অনুযায়ী সপ্তম সংসদে পাসকৃত আইনের প্রয়োগ স্থগিত কিংবা বাতিল করার কোন এখতিয়ার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছিল না।

এতদসত্ত্বেও ১৮-৭-২০০১ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত উপ-কমিটির প্রথম সভায় তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা এস এম শাহজাহান আওয়ামী লীগ আমলে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও বিশেষজ্ঞ সদস্য নিযুক্তির বিষয়টি উত্থাপন করেন। সুস্পষ্টত এইসব বিষয় 'শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তথাপিও এই উপকমিটিতে আলোচনার ভিত্তিতে নবনিযুক্ত শিক্ষা-সচিব শহীদুল আলম প্রধান উপদেষ্টার সিদ্ধান্তের জন্য পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এসব সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী এই সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্থগিত ঘোষণা করে। শোনা যায়, এই ক্ষেত্রে উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার দরোজা বন্ধ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই শিক্ষা উপদেষ্টা পরবর্তী সময়ে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হতে কুণ্ঠবোধ করেননি। আর সচিব শহীদুল আলম তেমনি নাকি তাঁর ঠিকায় প্রসারিত চাকরিকালের শেষে আর একটি বেসরকারি জামিয়া মিল্লিয়া ধরনের বা নামের দারুণ এলমে আমীরে আযম হিসাবে গদ্দীনসীন হওয়ার এরাদা পোষণ করে ইন্তেজার করে আসছেন। এই সচিব অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময়ে তাঁর পাবন্দী প্রমাণিত করার এরাদায় দেশব্যাপী সকল বেসরকারী কলেজ ও স্কুলের শাসক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে আইনসঙ্গতভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত চেয়ারম্যানদিগকে অপসারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নাকি এই অপকর্মটি করা হয়েছিল। নির্বাচনের পরে আবার একই ব্যক্তি ৩৬০ ঘুরে এ সকল শাসক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কমিটিতে, সংসদ সদস্য বা তাদের প্রতিনিধিকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্তির অপব্যবস্থা করেছিলেন। ফলত এই সকল ক্ষেত্রে দলবাজিকে প্রাধান্য দিয়ে বেসরকারি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা রাজনৈতিক শরিকানা বিস্তারের কায়দাকানুনের সমহারে পর্যবসিত হয়েছে। নষ্ট আমলার ভিন্নতর রূপ বা রূপান্তর আর কি হতে পারে?

সংবিধানের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপরোক্ত পদক্ষেপ ইচ্ছাকৃতভাবে (১) সংবিধানের নির্লজ্জ লঙ্ঘন, (২) পক্ষপাতদুষ্ট এবং (৩) উচ্চশিক্ষার প্রসারের পথে প্রতিবন্ধকমূলক সিদ্ধান্ত। নষ্ট আমলাদের ভূমিকা যাই হোক না কেন, এই দুষ্কর্মের পূর্ণ দায় তত্ত্বাধায়ক সরকারে উপদেষ্টাসভা, বিশেষত প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমানের। যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী [অনুচ্ছেদ ৫৮ খ (১)] এবং পূর্ববর্তী নির্বাচিত সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বের আওতায় অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু এ দুষ্কর্মের দায় রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের

www.pathagar.com

ওপরও বর্তায়। ভাবতে আশ্চর্য যে, সাহাবুদ্দীন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আইনীভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। এ সকল উপাচার্য নিয়োগের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পর্ষদে ১০ জন সদস্য, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ জন বিশেষজ্ঞ, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্ষদে ১০ জন সদস্যের নিয়োগ অনুমোদন করেন। তিনি তাঁদের সকলের নিযুক্তি যোগদানের পরপরই প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে বেআইনীভাবে মেনে বাতিল করলেন, আর কেমনেই বা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের স্থগিত বা ব্যয়িকরণ প্রকারান্তরে অনুমোদন করলেন বা মেনে নিলেন? নিঃসন্দেহে তাঁর কাজ পক্ষপাত ও দুরভিসন্ধিমূলক ছিল। বন্ধনীতে বলা ভাল, তাঁর সময় কতিপয় ব্যক্তি এই অপকর্মের বিষয়ে তাঁর সাফাই হিসাবে বলেন যে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে এ ক্ষেত্রে সাহাবুদ্দীনের ভিন্নতর কিছু করণীয় ছিল না। কেননা তিনি এক সময়ে প্রধান বিচারপতি হলেও তার আনুষ্ঠানিক আইনের শিক্ষা বা ডিগ্রী ছিল না। তিনি কোন প্রবীণ আইনজীবীর অধীনে শিক্ষানবিশী করেননি। আর এ ক্ষেত্রে তাকে যে আরেক সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফ পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর আনুষ্ঠানিক আইনের শিক্ষা ও ডিগ্রী দুই-ই ছিল এবং তিনি যশোরের নামজাদা আইনজীবী মশিউর রহমানের অধীনে শিক্ষানবিশী শেষ করেছিলেন লতিফের আইনী সবক বা পরামর্শ তিনি তাই অবজ্ঞা করতে পারেননি নিজ মুখ উৎসারিত সিদ্ধান্ত নিজেরই থুতু গেলার মতো প্রত্যাহার করে নিঃশব্দে লেজ গুটিয়ে সাহাবুদ্দীন এই রকমই আইনী সাহস দেখালেন। আসলে দুরভিসন্ধিমূলক পক্ষপাতিত্ব আইনের মোড়কে যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ডিগ্রীনিরপেক্ষ হতে পারে তা হয়ত এই দুই সাবেক বিচারপতি সকল সন্দেহের উর্ধে এই বিষয়ে প্রমাণ করে গেছেন। গত সংসদ নির্বাচনের আগে সারা দেশে প্রায় সকল পর্যায়ে গণসেবকদের কারণে-অকারণে বদলি করে আগের সরকারের সিদ্ধান্তের খারাপ দিক প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় পছন্দের শক্তিধরদের অনুকূলে প্রশাসনের সমর্থন দৃশ্যমান করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে সাবেক প্রধান বিচারপতি ও উপদেষ্টার তৎপরতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই তো প্রতীয়মান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প স্থগিতকরণ ও তাদের জন্য নিযুক্ত উপাচার্যের নিযুক্তি বাতিল বা স্থগিতকরণ। প্রধান বিচারপতির লেবাস বইয়ের মোড়কে অন্যায়ভাবে ধারণ করে তিনি যে আত্মশুদ্ধির খতিয়ান প্রকাশ করেছেন তাতে এই অপকর্মের সাফাই তিনি দিতে পারেননি।

শোনা যাচ্ছে, স্থগিত ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জোট সরকার (১) হাজী মোহাম্মদ দনেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, (২) টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও (৩) পটুয়াখালীর দুমকীতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত স্থাপনের বিষয়ে দেরিতে হলেও এবং স্থগিতাদেশপ্রসূত বাস্তবায়নে শ্লথতা তথা অধিকতর ব্যয়-দায় সত্ত্বেও অনুকূল পদক্ষেপ নেবে, কিন্তু (১) রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, (২) রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (গোপালগঞ্জ) কোন মতেই হতে দেবে না। ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শেখ হাসিনা কর্তৃক অর্জিত শান্তিকে ভিত করে সেখানে প্রগতি আসুক এ জোট সরকার তা চায় না। রংপুরে এখনও এরশাদের সমর্থন বিস্তৃত। তাই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া তাদের জন্য অভিপ্রেত নয়। আর বঙ্গবন্ধুর নামে বিশ্ববিদ্যালয়, এ তো জোট সরকারের পাকজনাবেষুদের জন্য পানের আগায় মরিচ বাঁটার শামিল।

www.pathagar.com

এই প্রসঙ্গে আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে সপ্তম সংসদ সুনির্দিষ্ট আইন পাস করেছিল। এই আইন অমান্য করে এসব বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পরিচালনার কাজ স্থগিত করা নিঃসন্দেহে বেআইনী কাজ। আগের সরকারের সময়ে গৃহীত আইন না মেনে জোট সরকার যে পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপন করল তা কি জাতির জন্য সুখকর হবে? এইসব বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে যে ব্যয় ইতোমধ্যে করা হয়েছে তাও জনসাধারণের সম্পদ। এ সম্পদ কি এভাবেই বিনষ্ট হবে? উদাহরণত গোপালগঞ্জে স্থাপিতব্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খুন হওয়ার বিবরণ দেখা যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্প প্রত্যয়নপত্র (project concept paper) ১৯-৫-১৯৯৭ সালে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করে। ৯-১১-'৯৯ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত অর্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্সের অধ্যাপক মুঃ খায়রুল আলম খান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত হন। আজকের মন্ত্রিপরিষদ সচিব, তৎকালীন শিক্ষা সচিব ড. সাদত হোসেন বলতে পারবেন এই নিযুক্তি দিতে দু'বছরেরও বেশি সময় কেন লাগল। প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৫৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। ১৩-৭-২০০১ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯-৭-২০০১ সালে প্রকল্প পরিচালককে সপ্তম সংসদ কর্তৃক পাসকৃত এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত আইন অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। এই সকল উপাচার্য নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুপারিশ করেছিলেন ১৪-৭-২০০১ সালে, শিক্ষা সচিব প্রস্তাব করেছিলেন ৭-৭-২০০১-এ। কিন্তু যেহেতু আইনের বিধান অনুযায়ী আইন বলবতকরণের তারিখ গেজেটকৃত হয়নি (এর জন্য দায়ী তৎকালীন সচিব ড. সাদত হোসেন) সেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রায় সাথে সাথে নব্যসচিব শহীদুল আলমের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮-৭-২০০১ সালে এই নিয়োগ স্থগিত করে। এইভাবে আগের নির্বাচিত সরকারের অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন স্থগিত করার কোন সাংবিধানিক এখতিয়ার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই।

আইন অনুযায়ী আইনটি বলবতকরণের বিজ্ঞপ্তি গেজেটে তৎকালীন সচিব ড. সাদত যথাসময়ে করলে পরবর্তী সচিব শহীদুল আলম গং তড়িৎ গতিতে এই দুষ্কর্মটি করতে পারতেন না। দুষ্কর্মের পরম্পরায় ১৯-৩-২০০২ সালে জোট সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অফিস আদেশবলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত উপাচার্যকে তাঁর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ববর্তী পদে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। অন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরিও শেষ করা হয়। অধিগৃহীত প্রায় ৫৩ একর জমির ৭০% উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আজকের এই সময়ে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় খাঁ খাঁ প্রান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় খুনের প্রতীক হয়ে অপেক্ষাকৃত এই পশ্চাৎপদ এলাকার মানবিক উন্নয়নে জোট সরকারের ঘৃণার্হ বিরোধিতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গত ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সমাবেশে যাওয়ার পথে তাই দেখলাম। মনে এলো ১৯৯০-'৯৫ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তৎকালীন বিএনপি সরকার ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বপর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার এই ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল (দ্রষ্টব্য, Fourth Five Year Plan, Planning Commission. p-xv-II)। বঙ্গবন্ধুর নামে বিশ্ববিদ্যালয় আর শেখ হাসিনা কর্তৃক শিলান্যাস তাদেরকে তাদের ঘোষিত লক্ষ্য থেকে আশঙ্কিতভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ এই ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৮ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এভাবে খুন করার সাথে বিনষ্ট হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা ও গবেষণা প্রসারণে ১৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ। স্থবির হয়ে গেছে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই বিনষ্ট সম্পদ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানবিনাশী অপচেষ্টার জন্য জবাবদিহি করবে কে? বিশ্ববিদ্যালয় খুনের সাথে যোগ হয়েছে সম্ভাব্য শিক্ষিত মানব সম্পদ খুনের অনুপতিত দায় (vicarious liability)। এই দায়ের মাত্রা ১৮ কোটি টাকার অনেক বেশি। এ ক্ষতির জন্য কোন না কোন দিন জনতার মঞ্চের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সংশ্লিষ্ট সচিব, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কুশীলববৃন্দ ও জোট সরকারের এলেম হাসিল ও প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত কায়েদানদের। বলতে হবে, সাহাবুদ্দীন, লতিফুর রহমান গংকে-কোন সূত্র অনুযায়ী কোন নৈতিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে তাঁরা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুন করলেন? তাঁদের আমলনামায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া খুনের সাথে যোগ হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে প্রযোজিত বিশ্ববিদ্যালয় খুনের ঘৃণিত দায়।

আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিতব্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্প স্থগিত করে জোট সরকার কি কারণে ও কোন স্পর্ধায় আইন লঙ্ঘন করলেন? সংবিধান ও আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ ও নির্ভীকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার জন্য সাংবিধানিকভাবে তারাও তো শপথাবদ্ধ। আর যেসব রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বা আমলা ইচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অন্তবর্তীকালীন সরকারকে এই খুনের জন্য প্ররোচনা দিয়েছেন, জোট সরকারের পাবন্দীতে জানপহসান কোশেশের তহ্‌রা ঢেলেছেন তাঁরাও কি আইনের উর্ধ্বে, জবাহদিহিত্বের বাইরে থাকবেন? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অপসারিত এবং ফলত অপমানিত জনৈক অধ্যাপক বলেছেন, আবহাওয়ার হালফিল পরিবর্তন সত্ত্বেও শীতের মাঘের চক্রাকারে আগমন এদেশে এখনও প্রকৃতি বন্ধ করেনি। দেশবাসীও তা ভোলেনি।

www.pathagar.com

ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় : যা হবে উন্নয়নের সহযোগী

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

পৃথিবীর স্থলভাগের মাত্র এক সহস্রাংশ বাংলাদেশে হলেও তার জনসংখ্যার ২৪ সহস্রাংশ ধারণ করে আছে আমাদের দেশটি। প্রাকৃতিক সম্পদেরও দারুণ কোনো ছড়াছড়ি নেই। যাও বা আছে, দক্ষতার অভাবে মাগুরছড়া ও টেংরাটিলায় তা বিদেশিদের কারিগরি অদক্ষতায় কিংবা গাফিলতিতে অনিষ্ট হচ্ছে, যার যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবির ক্ষমতাও আমাদের নেই। এই ক্ষুদ্র দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার জন্য চাই প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যপ্রযুক্তির থেকে অধিকতর কার্যকর ও সর্বজনীন প্রযুক্তি আর নেই। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ধারণা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সেহেতু কার্যকর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই।

জাতীয় উন্নয়নে চাই আত্মবিশ্বাস, আর আত্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠায় চাই সফল উদাহরণ। ভারতবাসী আইআইটি, আইআইএসসি কিংবা টিআইএফআরের মতো বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান নিয়ে গর্ববোধ করে আত্মবিশ্বাসী হয়, জাতীয় অগ্রগতিতে কার্যকর অবদান রাখে। আমাদের এই ভূখণ্ডে আমরা একসময় আদমজী জুটমিল নিয়ে গর্ববোধ করতাম। কিন্তু এই গর্বের প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিয়েছি। এখন কেবল প্রকৃতিপ্রদত্ত কক্সবাজারের দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত আর সুন্দরবন ছাড়া নিজেদের তৈরি গর্বের কিছু দেখানোর নেই। পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম জনবহুল দেশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই মানসম্পন্ন কোনো বৈশ্বিক তালিকায় স্থান পাচ্ছে না, যদিও আমাদের দেশে পড়তে আসা ছাত্রদের দেশ মালয়েশিয়া কিংবা কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থান করে নিচ্ছে। থাইল্যান্ডও এই উন্নতিক্রমে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে, এমনকি পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও।

পাকিস্তান হায়ার অ্যাডুকেশন কমিশন পাঁচ বছর ধরে প্রতিবছর তিন শ জন বিদেশি অধ্যাপক এনে তাদের গবেষণা ভিত্তিতে সমৃদ্ধ করছে, ভারতের আইআইটিগুলোতে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনি যে আমেরিকার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে তারা দেশে চলে আসে। আর আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে এমন কোনো পদক্ষেপ নেই।

কোরিয়া অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির একটি লক্ষ্য নোবেল বিজয়ী তৈরি করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোরিয় ভাষা না জানা, কোরিয় সংস্কৃতি না জানা মার্কিন এক নোবেল বিজয়ীকে নিয়ে এসেছিল, যাতে করে কোরিয় বিজ্ঞানীরা এই

www.pathagar.com

নোবেল বিজয়ীর সান্নিধ্য পায়, উদ্বুদ্ধ হতে পারে। ১৯৭১ সালে স্থাপিত কাইস্ট এ পর্যন্ত নয় হাজার ১৬৮টি বিএসসি, ১৮ হাজার ৮৪৪টি এমএসসি এবং সাত হাজার ২২৩টি পিএইচডি ডিগ্রি দিয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কাইস্টের থেকে বয়সে বড় হলেও পিএইচডি দেওয়ার সংখ্যায় শতভাগ পিছিয়ে। স্বভাবতই ২০০৮ সালের এশিয়া উইকের তালিকায় কোরিয় কাইস্টের অবস্থান এক নম্বরে। একসময় আমাদের থেকে পিছিয়ে থাকা কোরিয় দুর্দান্ত গতিতে যে উন্নয়নের সোপান বেয়ে উঠছে, তা কিন্তু শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েই। জনসংখ্যাসর্বস্ব আমাদের দেশের উন্নয়নও নির্ভর করছে শিক্ষাকে আমাদের কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি তার ওপর।

এবার ফিরে আসি ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের বিষয়ে।

ইন্টারনেট ঘেঁটে সবচেয়ে কাছাকাছি নামে যা পেলাম, তা হলো হল্যান্ডের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় জোট করে একটি ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছে, যার খরচ তার নিজেদের আকারের অনুপাতে বহন করে এবং প্রতিবছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নয় মিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, নিজের জনবল সামান্যই। অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও গবেষক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার মানোন্নয়নের কোনো প্রকল্প গ্রহণ করলে এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে অর্থনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিসংখ্যানের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কোর্স তৈরি সম্পন্ন হয়েছে, ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য সিডি/ডিভিডি তৈরি করা হয়েছে।

মালয়েশিয়াতে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি সাইবারজায়া এবং মেলাকা নামের দুটি ক্যাম্পাসের মাধ্যমে শিক্ষাদান করে। ছাত্রদের সম্ভাবনাময় প্রকল্পসমূহ বাণিজ্যিকীকরণের জন্য এখানে একটি ইনকিউবেটরও রয়েছে। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্রিয়েটিভ মাল্টিমিডিয়া, ম্যানেজমেন্ট, 'বিজনেস অ্যান্ড ল' নামক অনুষদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া হয়। কোরিয়াতে ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স ইউনিভার্সিটি, যা ২০০৯ সাল থেকে কাইস্টের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে।

আমাদের দেশ যে অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত, তার কার্যকর সমাধান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দিতে পারছে না। যানজট সমস্যা, কয়লা-তেল উত্তোলনের সমস্যা, বন্যা ও খরার সমস্যা, উপকূল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সমস্যা, নদীর নাব্যতার সমস্যা কোনোটিরই কার্যকর সমাধান এখনো দিতে পারিনি। এমতাবস্থায় অবশ্যই আমাদের এমন একটি বিশ্বমানের শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত, যা আমাদের জাতীয় সমস্যাসমূহের কার্যকর সমাধান বের করার প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। ভারতের আইআইটিগুলো প্রতিষ্ঠায় যে প্রয়োজনীয় অ্যাক্ট, স্ট্যাটিউট ও অর্ডিন্যান্স পাস হয়েছিল, আমরা সেগুলোকে বিবেচনায় এনে আইন প্রণয়ন করতে পারি। এই ইনস্টিটিউটগুলোকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তাতে শিক্ষক-গবেষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাও আলাদাভাবে দেওয়ার বিধান ছিল।

আমরা যদি এ রকম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়তে চাই, যা আমাদের দেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, তা নিশ্চয়ই বর্তমান ৮৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হবে না। আমাদের দেশের সমস্যা কার্যকরভাবে সমাধান করতে পারে, এমন অভিজ্ঞ ও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা-গবেষকদের নিয়েই তৈরি করতে হবে এমন বিশ্ববিদ্যালয়। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যেহেতু নানা ক্ষেত্রে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশেষায়িত হলো নানা

www.pathagar.com

বিভাগ থাকতে হবে। আমরা জেনেছি, অতি সম্প্রতি প্রবাসী বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র ও গবেষকেরা পাটের জেনোমে সিকোয়েন্সিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং অ্যাডভান্সড গবেষণা করছে। এই গবেষণায় তথ্য যুক্তির ব্যবহার অপরিসীম। বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আরও বেশ কয়েকটি বিষয় তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং সে বিষয়গুলোর যৌক্তিক মাত্রায় উপস্থিতি প্রয়োজন।

এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে, তার কিছু নিচে উপস্থাপন করা হলো। ১. এই প্রতিষ্ঠানের বাজেট ভারতের আইআইটিসমূহের তুলনীয় হতে হবে। ২. এর কর্ণধার হবেন একজন প্রোথিতযশা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। আমরা এ রকম মানের প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষক–গবেষকদেরও বিবেচনা করতে পারি। ৩. উপদেষ্টা বোর্ডে থাকবেন বিভিন্ন দেশের নামকরা বিজ্ঞানী এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের গবেষক পর্যায়ের নীতিনির্ধারকেরাও এ বোর্ডে থাকবেন। ৪. এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক এর শর্তাবলি হবে আইআইটি, আইআইএসসি কিংবা কাইস্টের অনুরূপ। কোনোক্রমেই এই শর্তাবলি শিথিল করা যাবে না। বিদেশি শিক্ষক ও গবেষকদের চাকরি করার সুবিধা থাকতে হবে। ৫. বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা যেন এমন উচ্চমানের হয়, যাতে করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য তা অত্যন্ত লোভনীয় হয়। যেমন– পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যা বেতন, এখানে তার পাঁচগুণ করা যেতে পারে। গবেষণা করার সুযোগও পর্যাপ্ত থাকতে হবে। ৬. বিদেশি কিংবা প্রবাসী বিশেষজ্ঞরা যাতে করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পকালীন সময় থেকে গবেষণা ও শিক্ষাদান করতে পারে, তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ৭. শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণীয় আবাসন থাকতে হবে। ৮. সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি যাতে মডেল হয়। যাতে করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এই বিশ্ববিদ্যালয়কে মডেল ধরে নিজেদের ডিজিটাল রূপান্তর করতে পারে। ৯. ছাত্র–গবেষকদের সম্ভাবনাময় প্রকল্পসমূহ বাণিজ্যিকীকরণ করার জন্য ইনকিউবেশনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। ১০. শিক্ষক ও গবেষকদের নিয়োগের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে তাঁদের উৎপাদনশীলতার ওপর, যাতে করে স্থায়ী চাকরি উদ্ভূত জড়তা ও কাজের প্রতি অনীহা তাঁদের পেয়ে না বসে। ১১. প্রবাসী বিদেশি শিক্ষক, গবেষকদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসন গড়ে তোলা। ১২. বিশ্বখ্যাত প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষক, গবেষকদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এই পথে বাংলাদেশেও হতে পারে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ অথবা বাংলাদেশ অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, যা হবে আমাদের মর্যাদার প্রতীক, আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসন

শহিদুল ইসলাম

১৯৯২ সালে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হওয়ার পর মাত্র তের বছরে অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এটা এ দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ। তাই এতে আনন্দিত না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের ধারণা ভালো না। তারপর আমাদের রাষ্ট্রপতি, মঞ্জুরি কমিশন এসব বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করে থাকেন, তাতে সাধারণ মানুষের ওই ধারণা সত্য বলেই মনে হয়। আমাদের মনে হয় যারা এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন বা করছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাদের ধারণায় কোথাও গলতি আছে। যেহেতু শিক্ষা নিয়ে সামান্য লেখালেখি করি, তাই আমার বন্ধু-বান্ধব, ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে আমার ওপর একটা চাপ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা (concept) নিয়ে কিছু লেখার। বিশ্ববিদ্যালয় কি? কি তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য? সমাজ ও সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বলতে কি বোঝায়? সে স্বায়ত্তশাসন কি সমাজ ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন কেন দরকার? কারা এর বিপক্ষে? কারাইবা পক্ষে? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এসব প্রশ্নের উত্তরে নানা জনের নানা মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে একটি বিষয়ে মোটামুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য। তবে সে স্বায়ত্তশাসন সমাজ, রাষ্ট্র বা রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয়, আপেক্ষিক। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের চেহারা যেমন পাল্টে যায়, তেমনি পাল্টে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যেমন তারতম্য ঘটে, তেমনি স্বায়ত্তশাসনের ধারণাও পাল্টে যায়। পাল্টে যেতে বাধ্য হয়।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা অপরিহার্য, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হলে মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সমাজে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা জানা আবশ্যক। প্রশ্ন উঠতে পরে, কেন? তার প্রথম কারণ ইংরেজরাই তাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এ দেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এবং আজো পশ্চিমা সভ্যতার শরীর থেকে সার সংগ্রহ করে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ইদানীং অবশ্য মার্কিনি সভ্যতার অভিঘাতে এ দেশে মার্কিনি ধাঁচের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কারণ আমরা আজ যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির মধ্যে বাস করছি, তার প্রায় সবই ইংল্যান্ড থেকেই আমদানিকৃত। যেমন গণতন্ত্র, পার্লামেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতি-রাষ্ট্র, মৌলিক অধিকার, গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক ইত্যাদি। তৃতীয়ত, ১৯০ বছর ইংরেজের অধীনে থাকার কারণে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগাযোগ অনেক দৃঢ়।

রেনেসাঁ, সংস্কার-আন্দোলন (Reformation) ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুরো ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সমাজের যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে, বিশ্ববিদ্যালয় তার বাইরে থাকেনি। ক্রমান্বয়ে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা হারানো ও রাজতন্ত্র এবং অ্যাঙ্গলিকান চার্চের ক্ষমতারোহণ, তারপর রাজতন্ত্র ও অ্যাঙ্গলিকান চার্চের ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি ও পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাকার পরিবর্তনগুলো সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রও পাল্টে দেয়। তাই দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ডে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে, বিশেষ করে চৌদ্দ ও পনের শতকের রেনেসাঁ, ১৬ শতকের রিফর্মেশন, ১৭ শতকের গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লব এবং ১৯ শতকের শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের সমাজে যে মৌল পরিবর্তন সূচিত হয়, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে এক করে না দেখলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি ভালোভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। তাই প্রবন্ধটিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞা, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য কেন, এ বিষয়ে আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে আছে রাজনীতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এক প্রগাঢ়, নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বরাবরই ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা। এ পর্বে মূলত ইংল্যান্ডের সমাজ পরিবর্তন ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চারিত্রিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অংশে আছে বাংলাদেশের কথা। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও তার স্বায়ত্তশাসনের একটি প্রতিবেদন।

এক

ক. কর্নিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জেমস এ পারকিনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন এবং মনে করেন এই তিনটি লক্ষ্য একত্রিত হলেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে তার প্রকৃত ভূমিকা রাখতে পারে। সে তিনটি লক্ষ্য হলো :

১. গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন,

২. শিক্ষাদানের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ এবং

৩. জনস্বার্থে বা সমাজ উন্নয়নে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ।[১]

তার মতে এই তিনটি বর্তমান বিশ্বের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শুধু মূল উদ্দেশ্যই নয়, এগুলোই তার প্রচণ্ড শক্তির ও কঠিন সমস্যারও উৎস। বিশ্ববিদ্যালয় যে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানের একটি কেন্দ্র, এ ধারণা খুব পুরনো। অতীতে এ দুটিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনে করা হতো। তৃতীয় উদ্দেশ্যটি অর্থাৎ সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্ঞানের প্রয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভূমিকা থাকবে, এটি সাম্প্রতিক উপলব্ধি। জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে থাকে। এ ধারণা সেখান থেকেই উদ্ভূত। তবে এ ধারণা যখন থেকেই উদ্ভূত হোক না কেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের কোনো না কোনো অংশের কল্যাণসাধন করে এসেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আরো একটি পুরনো তর্ক অনেক দিন ধরেই চলছে। তা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ কোনটি? গবেষণা না শিক্ষাদান? আমি এখানে উভয় পক্ষের

www.pathagar.com

সমর্থকদের অনেক উক্তি দিয়ে প্রবন্ধটির কলেবর আরো বাড়িয়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু আমি তার কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না এজন্য যে, আমার কাছে এ তর্কের কোনো অর্থ বহন করে না। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ লক্ষ্য যদি সমাজ উন্নয়ন হয়, তাহলে গবেষণা ও শিক্ষাদান উভয়ের অথবা এর যে কোনো একটির মাধ্যমে তা অর্জিত হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। সেটি নির্ভর করে সমাজের মূল কাঠামোর ওপর।

গবেষণা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সমাজ যা আশা করে তা হলো :

ক. শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সযত্নে রক্ষা করা: তার বিস্তৃতি ঘটানো এবং নতুন প্রজন্মের কাছে সেই জ্ঞানভাণ্ডার হস্তান্তর করা।

খ. শিক্ষার্থীর মননশীলতা বাড়িয়ে তোলা এবং তাকে একজন সচেতন ও সংস্কৃতিবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

গ. নিরাসক্তভাবে সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত হওয়া,

ঘ. স্বাধীন চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা এবং

ঙ. উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তোলা যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে মেধা ও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এ সবই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী চিন্তা। এসব বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে গবেষণা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে আরো যেসব দায়িত্ব ক. থেকে ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বর্তায়, সেগুলো যখন পারকিনসের তৃতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তখন বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয় তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সমাজে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কতটুকু–এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কখনো কোথাও সরাসরি দেশ পরিচালনা করেনি। শাসকশ্রেণী শাসন–শোষণ ও প্রভাব–প্রতিপত্তি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ সরবরাহ করে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে কিভাবে এবং কতটুকু ভূমিকা রাখবে, তা নির্ভর করে প্রধানত শাসকশ্রেণীর চরিত্রের ওপর, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল কাঠামোর ওপর।

তৃতীয় বিষয়ে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। যারা 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বে বিশ্বাসী, প্রধানত তারাই এ দলে। তবে এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা আজ অনেক হ্রাস পেয়েছে। কেননা, আজ এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষা আজ অন্যতম প্রধান উৎপাদনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এর অর্থ, শিল্পকলকারখানায় অর্থ বিনিয়োগ যেমন লাভজনক, শিক্ষা ও গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগও তেমনি লাভজনক। অবশ্য কিছু পার্থক্য আছে। ব্যবসায় কিংবা শিল্পকারখানায় অর্থ বিনিয়োগ করলে লোকসানের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু শিক্ষা ও গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করলে লোকসানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ২০০৬ সালের বাজেট বক্তৃতায় বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ J. Maurice Clark-এর একটি উক্তি ব্যবহার করে এ মতকে সমর্থন করেছেন। Clark বলেছেন, 'Knowledge is the only instrument of product that is not subject to dimininishing return'. শিক্ষার এই অর্থনৈতিক মূল্যের কথা এডাম স্মিথ, আলফ্রেড মার্শালের মতো অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করেছেন। সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিক্ষার অর্থনীতির ওপর গবেষণা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সম্পর্কে আমি সাম্প্রতিককালের দু'জন গবেষকের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উল্লেখ করব। একজন নোবেল

www.pathagar.com

পুরস্কারে ভূষিত মার্কিন অর্থনীতিবিদ থিওডোর শুলট্জ এবং অপরজন সোভিয়েত শিক্ষাবিদ এস.জি. স্ট্রুমিলিন। শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণে শুলট্জ একজন পথিকৃৎ। তার গবেষণার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো :

ক. গত দশকে (১৯২৯–১৯৫৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার জন্য যন্ত্রপাতি বা দালানকোঠা ইত্যাদির তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান অধিকতর;

খ. ১৯০৯–১৯২৯ সাল সময়কালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিক্ষা যে ভূমিকা পালন করে, সে তুলনায় শিক্ষার ভূমিকা অনেক বেশি;

গ. ১৯০৯–১৯২৯ সালে উন্নয়নে শিক্ষার চেয়ে বিনিয়োজিত দ্রব্য সামগ্রীর অবদান ছিল দ্বিগুণ; কিন্তু ১৯২৯–১৯৫৭ সালে শিক্ষার অবদান দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিকতর ছিল।'[২] অপর একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড ডেনিসনের গবেষণার ফলাফল শুলট্জের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

স্ট্রুমিলিন লেনিনগ্রাদের ধাতুশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের ওপর গবেষণা চালান। তার মতে, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার ভূমিকা আছে। তার গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো :

ক. 'মাত্র এক বছরের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সাধারণ সাক্ষরতা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৩০% বৃদ্ধি করে। অপরদিকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর একজন বেঞ্চ বা লেদ মেশিন চালকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সে এক বছরের কর্মকালীন শিক্ষা তার কর্মক্ষমতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে মাত্র বছরে ১২ থেকে ১৬%।

খ. সম্পূর্ণ নিরক্ষর শ্রমিকদের চেয়ে চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের উৎপাদিত ক্ষমতা ৪৩%, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের ১০৮৫ এবং উচ্চশিক্ষিাপ্রাপ্তদের ৩০০% বেশি।[৩]

শিক্ষার প্রভাব শুধু সমাজের সম্পদ সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সে প্রভাব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। তাই উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান পৃথিবীতে সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালক, আমলা, প্রশাসক, ব্যবসা–এক্সিকিউটিভ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ প্রশাসনের এক বিরাট অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরা দখল করে আছে। ইদানীং বিভিন্ন বিষয়ে যদিও কিছু উচ্চ মানসম্পন্ন গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তবুও রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি স্তরে দক্ষ জনশক্তির সরবরাহকারী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান আজও একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

অতি ক্ষুদ্র যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন সামাজিক ভূমিকা বলতে কিছু ছিল না। প্রায় হাজার বছরের সমাজ পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জাতি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো আশা করে যে ধরনের প্রশাসন ক্রিয়াশীল থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সহজতর হয়। সেই ধরনের প্রশাসনের নামই স্বায়ত্তশাসন; যার অর্থ বাইরের হস্তক্ষেপমুক্ত একটি সুষ্ঠু পরিবেশ, যেখানে গবেষণা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমাজের ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। দালানকোঠা, আচার্য, উপাচার্য, সিনেট, সিন্ডিকেট ও শিক্ষা পর্ষদের সদস্যরা, শিক্ষক–ছাত্র–কর্মচারী মিলে যে একটি 'সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব' (Body corporate) গড়ে ওঠে, যেখানে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হয়, তাকেই বলে বিশ্ববিদ্যালয়। আর দালানকোঠা, আচার্য, উপাচার্য, সিনেট, সিণ্ডিকেট ও শিক্ষা পর্ষদের

www.pathagar.com

সদস্যরা, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবই থাকল, থাকল না শুধু স্বায়ত্তশাসন, সে ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম আর যাই হোক না কেন বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

খ. ১৯৬৫ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর জাপানের টোকিওতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন (IAU) কর্তৃক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর ৬৫টি দেশের প্রায় ৩০০ প্রতিনিধিসহ ৫০০ জন সদস্য সেখানে একত্র হয়েছিলেন। সম্মেলনের তিনটি আলোচ্য বিষয়ের একটি ছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন'। ১৯৬২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত IAU-এর প্রশাসনিক বোর্ডের সভা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের' ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার দায়িত্ব স্যার হেক্টর হেথারিংটনের ওপর ন্যস্ত করে। তার তৈরি প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রশাসনিক বোর্ড কেমব্রিজ ও মস্কোতে দীর্ঘ আলোচনায় বসে এবং সেটি টোকিওর সম্মেলনে পেশ করার জন্য চূড়ান্ত করে।

প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও ম্যাগগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল এমেরিটাস এবং মেরিল জেমস তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 'The problem of autonomy was as old as university institutions themselves. It had however, changed its nature gradually over the years, from the really autarchic independence of the university of Paris in the 12th and 13th centuries, with its own courts of justice, to an eventual recognition that there was a fluid relationship between the university and the community that it served a relationship which was vital to the university itself, which required a degree of independence to do its work for the community justly and properly and vital also to the community.'[৪]

সেরিল জেম্‌সের উদ্বোধনী ভাষণে যে জায়গায় জোর পড়েছে, তা হলো মানুষ ও সমাজের জন্য কাজ করাই হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের কোনো বিকল্প নেই। ওই সম্মেলনে আলোচনার জন্য তৃতীয় যে বিষয়টি নির্বাচিত করা হয়েছিল তা হলো 'The contribution of Higher Education to Economic and Cultural Development.' এটা পরিষ্কার যে সম্মেলনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ভূমিকার ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। জেমস পরিষ্কার বলেন যে, যে সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত সঠিকভাবে সেই সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়, সমাজের জন্যও প্রয়োজনীয়। তবে সমাজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কেমন হবে, তা নির্ভর করে কোন ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত তার ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আলোচনার সময় এটা স্পষ্ট হবে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার সীমানা বেঁধে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় সেই সীমানা অতিক্রম করে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করতে চাইলেই নেমে আসে 'স্বায়ত্তশাসনের' ওপর আঘাত।

সম্মেলনে তত্ত্বগতভাবে স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা নিয়ে কমই কথা হয়েছে। কেননা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বায়ত্তশাসনের ধারণা আলাদা করা যায় না। তা আজ সর্বজনস্বীকৃতি স্বতঃসিদ্ধ একটি প্রত্যয়। স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়েই আলোচনা হয় বেশি। যেমন সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়। এছাড়া প্রশাসনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ, স্বায়ত্তশাসনের আপেক্ষিকতা,

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের অভাবিত আগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভূতপূর্ব বিস্তৃতিজনিত উদ্ভূত সমস্যা, সমাজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ইত্যাদি।

সম্মেলনে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি জানানোর আগে সেখানে উপস্থিত দু-চারজন প্রতিনিধির বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করছি। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. এম ও গনির কথা। আমরা সবাই জানি ১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুনের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়েছিল ড. গনির ওপর। সেদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সন্ত্রাস আমদানি করেছিলেন, সে কথা আজও কেউ ভোলেনি। তাই টোকিও সম্মেলনে ড. গনি কি বলেছিলেন, তা জানার আগ্রহ সবার থাকাই স্বাভাবিক। প্রশাসনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সম্মেলনে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তবুও অনেকেই নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এর বিরোধিতা বা সমর্থন করেন। ছাত্রদের অংশগ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মারাত্মক পরিণতি বহন করে আনবে এই মত প্রকাশ করে ড. গনি বলেন :

'Suggestions which tended to admit students into the councils of university administration should therefore be vigorously opposed.' [৫]

তবে আশ্চর্যের হলেও সত্যি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সম্মেলনে যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তিনি তা সমর্থন করেছিলেন এবং বলেছিলেন,

'Unquestionably each university should try to safeguard its independence to the best of its ability on each of the five points mentioned by Sir Hector.'[৬] ড. গনির স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন সত্যিই খুব কৌতূহলোদ্দীপক। নিজের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ধ্বংস করা এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমর্থন করার দ্বিমুখী নীতি আমাদের দেশে খুব বিরল নয়।

নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জি বোসা স্বায়ত্তশাসন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর বা উপাচার্যের নিয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন,

'He should be elected by the college of Professors, and that the State should not intervene in any way whatever. Moreover, it was important that the council which administered the University ... should be composed mainly of teachers even if representatives of the government or of the community were also members.'[৭] ফিলিপিনসের ফাউন্ডেশন কলেজের ড. ভি জি সিনকো বলেন, 'The University could only accomplish its full mission in society if it and its teachers enjoyed the widest autonomy.'[৮] রাবাতের মুহম্মদ ভি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এম আল ফাসি স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'Such a wide agreement should not fail to carry weight will some government which were still inexperienced in university matters and had not sufficiently realized that it was in the name of efficiency itself that autonomy should be respected.'[৯]

রাষ্ট্রের বা সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের বিষয়ে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের কথা বলেন। আমাদের দেশের সমাজ বাস্তবতায় আমরা লক্ষ্য করেছি, স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার ও

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা বৈরী সম্পর্ক চলে আসছে। এরা পরস্পর পরস্পরকে শত্রু মনে করে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশের মানুষের এই একই অভিজ্ঞতা। তাই স্বায়ত্তশাসন বলতে এসব দেশের মানুষ সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই প্রধানত মনে করে। কিন্তু টোকিও সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিদের মুখে যখন অন্য কথা শুনি তখন যেন ঠিক বোধগম্য হয় না। পূর্ব জার্মানির বোস্টক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ও রুমানিয়ার ক্লাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেক্টর যখন বলেন, "The state should not in principle be considered the 'enemy' of the University" তখন হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে শোষণহীন রাষ্ট্র ও পৃথিবীর প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

'It is the duty of the universities to contribute to the highest development both of the national community to which they belong and the cause of international scholarship. Experience makes it clear, however, that they fulfill these functions most effectively when they enjoy a high degree of autonomy and are in a position to maintain academic standards by having a decisive voice in respect to the following matters :

1. Whatever the formalities of appointment may be, the university should have the right to select its own staff.

2. The university should be responsible for the selection of its students.

3. Universities should be responsible for the formation of curricula for each degree and for the setting of academic standards. In those countries where degrees, or the license to practice a profession are regulated by law, universities should participate effectively in the formulation of curricula and the setting of academic standards.

4. Each University should have the final decisions as to the research programme carried on within its wall.

5. The university should be responsible, withtin wide limits, for the alocation among its various activities of the financial resources available i.e. space and equipment, capital funds; recurrent operating revenue.'[১০]

এভাবে সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তার সীমানা বেঁধে দেয়া হয়। অর্থাৎ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যরা মনে করেন যখন বিশ্ববিদ্যালয় এই পাঁচটি বিষয়ে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারে, তখনই কেবল বলা যাবে যে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে।

প্রথম চারটি বিষয়ে সাধারণত কোনো মতবিরোধ দেখা যায় না। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিন্নতা ও সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সত্ত্বেও প্রত্যেক সভ্য দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বাধীনতা স্বীকৃত। পাঁচ নম্বর বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। বিরোধীদের যুক্তি হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ অর্থ যখন সরকারি কোষাগার থেকে আসে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। এ কেমন কথা? অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের প্রশ্নটি জড়িত। টোকিও সম্মেলনে বিষয়টি

www.pathagar.com

যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। বিভিন্ন বক্তা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, সরকারের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করতে পারে। সরকার অনেক সময় কম বরাদ্দ দিয়ে অথবা বরাদ্দকৃত অর্থ কমিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অনেক দেশে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হয় এবং অনেকাংশে সফল হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন যেন বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য অনেকে কতকগুলো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেন। যেমন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কোনো মতেই কম অর্থ পরবর্তী বছরে বরাদ্দ করা যাবে না বা প্রতি বছর জাতীয় বাজেটের একটি স্থির শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ করতে হবে এবং আর্থিক অসুবিধার অজুহাতে কোনোমতেই তা হ্রাস করা যাবে না। এসব আলোচনায় এটিই প্রমাণ হয় যে, উক্ত সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সংরক্ষণের বিষয়টি প্রতিনিধিদের যথেষ্ট চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের আলোচনায় আরো একটি প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তা হলো, স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করে কে বা কারা? কারা এর শত্রু? এক বাক্যে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে শত্রু-মিত্র নতুন করে নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। এ কথা সবাই স্বীকার করেন, পুঁজিবাদ এক সময় প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। তা স্থবির সামন্তবাদী সমাজ ধ্বংস করে বুর্জোয়া সভ্যতার দরজা উন্মুক্ত করেছিল। সে সময় গির্জা ও রাজার সুদৃঢ় কব্জায় ইংল্যান্ডের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো (কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড ইত্যাদি) মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছেছিল। সফল শিল্পবিপ্লবের পরে ১৮৫০ সালে পার্লামেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর থেকে সামন্তবাদী আইন-কানুন ধ্বংস করে একগুচ্ছ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আইন-কানুন চালু করে। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ কোমর বেঁধে সে পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিল। তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের বর্তমান ধারণা চালু হয়। আবার ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পাল্টে যায়। বুর্জোয়া স্বায়ত্তশাসন বা গণতন্ত্র ভোগ করছে, সেখানকার এমন বিশ্ববিদ্যালয় সে রূপান্তরণের বিরোধিতা করেছিল। তবে স্বায়ত্তশাসনের ওপর হামলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকেও আসতে পারে, আবার ভেতর থেকেও আসতে পারে। কখনো দেখা যায়, বাইরের সমাজ, রাষ্ট্র ও ঐতিহ্যিক চিন্তাভাবনাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আবার কখনো বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই নিজের স্বায়ত্তশাসনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয় নামক 'সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব', সত্যানুসন্ধান ও সমাজ প্রগতির জন্য কাজ করে। অতীতে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে, নানা অসুবিধা ও প্রতিকূলতা এবং নানা চাপের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে তার এ কাজ করে এসেছে। দেখা গেছে, বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শোষণভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মাঝে শক্তিহীন বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষীণকণ্ঠে তার সত্যানুসন্ধানের কাজ অব্যাহত রেখেছে। কপারনিকাস, কেপলার, ব্রুনো, গ্যালিলিওর কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় যে কখনো প্রতিক্রিয়াশীলতার কাছে নতজানু হয়নি, তা নয়। তবে তার 'সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব'কে যে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায়নি, তার প্রমাণ মেলে যখন দেখি প্রথম সুযোগেই বিশ্ববিদ্যালয় তার ঐতিহ্যিক সত্যানুসন্ধানের পথে ফিরে এসেছে। আবার এমনও দেখা গেছে যে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যখন বাইরের সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে গেছে রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় তখন প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে আছে এবং প্রগতিমুখী পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে পারছে না। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বলব যে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই

www.pathagar.com

লক্ষ্যচ্যুত হয়ে তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হারিয়েছে। যেমনটা বুর্জোয়া বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে রুমানিয়ার ক্লাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেক্টর ড. আলেকজান্ডার রসকা'র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি টোকিও সম্মেলনে বলেন, 'It goes without saying that the significance and the function of university autonomy also vary-in terms of general guidelines of the state. When the orientation of the state constitutes an obstacle to the general evaluation of society or to the interests of the people, the exercise of university autonomy, from a progressive standpoint, has a particularly important practical value. But when the state itself is the promoter of progressive social development, state direction does not clash with the advanced spirit of university autonomy.'[১১]

অর্থাৎ একটি প্রগতিশীল, কল্যাণকামী, শোষণহীন রাষ্ট্রের যেখানে জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ জীবনের সব চাহিদা পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সেখানে সরকার বা রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য একই বিন্দুতে মিলিত হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বের নিরসন হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তথ্য নির্দেশ

১. James A. Perkins : The University in Transition, Princeton University Press, 1966 P. 9-10
২. মুহম্মদ শামস-উল-হক : শিক্ষা, সমাজ ও উন্নয়ন, উত্তরাধিকার, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা-৪৯।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৫১-৫২
৪. Report of the Fourth General Conference of the International Association of University, Tokyo, 1965, LAU Press, 1966, P 74.
৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৯২
৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৯১
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৯০
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৯
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৫
১০. ঐ, পৃষ্ঠা ১০৯
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮

www.pathagar.com

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা পরিস্থিতি

বিশ্বজিৎ ঘোষ

পরিবর্তিত পৃথিবীর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়েছে সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা। পরীক্ষার ফল নির্ধারণেরও সনাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নেয়া হয়েছে গ্রেডিং পদ্ধতি। এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতি চালু থাকলেও, অদূর ভবিষ্যতে যে সর্বত্র নতুন পদ্ধতি চালু হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে কোনো পদ্ধতিরই ভালো-মন্দ দু'টো দিকই থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। বহির্বিশ্বে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশিত হয়। তাই এ ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিকল্প ছিল না আমাদের। কিন্তু সেমিস্টার পদ্ধতি নিয়ে ভিন্নমত পোষণের সুযোগ আছে।

সন্দেহ নেই, সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এখন বিশ্বপ্রবণতা। কিন্তু আমাদের দেশে এ পদ্ধতির সুফল নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর নানামাত্রিক নেতিবাচক কর্মসূচি সেমিস্টার পদ্ধতির কার্যকরিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। অবকাঠামো, পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠদান পদ্ধতি- কোনো কিছুই আমাদের দেশে সেমিস্টার উপযোগী বলে মনে হয় না। সেমিস্টার পদ্ধতিতে শ্রেণী-শিক্ষকই সর্বেসর্বা। তিনিই পাঠদান করেন, প্রশ্ন করেন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। প্রশ্নপত্র সমন্বয়ের কোনো বালাই নেই কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরপত্র মুল্যায়ন করেন কেবল শ্রেণীশিক্ষক। শিক্ষক যা পড়াননি, তা যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দেবেন না, তা লেখাই বাহুল্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ফল আশানুরূপ না হয়ে শ্রেণী-শিক্ষকের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে; অতএব, উত্তরপত্র মূল্যায়নে এক ধরনের পূর্ব-সিদ্ধান্ত কাজ করে বলে আমার মনে হয়। সামগ্রিক এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের সততার ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ওই সততার জায়গাটা যে ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে-একথা কে অস্বীকার করবে?

কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতির নামে প্রচলিত হয়েছে জগাখিচুড়ি পদ্ধতি। সেখানে প্রশ্নপত্র সমন্বয়ের ব্যবস্থা আছে, উত্তরপত্র দু'জনকে দিয়ে মূল্যায়নের বিধান আছে, এমনকি মান উন্নয়ন পরীক্ষারও বিধান আছে। সেমিস্টার পদ্ধতির পরীক্ষার সঙ্গে মান-উন্নয়ন পরীক্ষা বেমানান। অথচ সেটাই চালু করা হয়েছে। মান উন্নয়ন পদ্ধতি চালু থাকলে পরীক্ষার ফল প্রকাশ বিলম্বিত হবে, দেখা দেবে বহুমাত্রিক জটিলতা, ব্যাহত হবে এই পদ্ধতি প্রবর্তনের মৌল উদ্দেশ্য।

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষকই সর্বেসর্বা। তিনি যেটুকু পড়াবেন, তার মধ্য দিয়েই প্রশ্ন করবেন-এটাই স্বাভাবিক। ফলে প্রশ্ন সম্পর্কে শিক্ষার্থী

www.pathagar.com

অনেকটা নিশ্চিত থাকতে পারে। এর ফলে জ্ঞানার্জনের পথে একটা ভাসা-ভাসা অবস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয়। সনাতন পদ্ধতিতে ক্লাসে পাঠদানকারী শিক্ষক, প্রশ্নকর্তা, উত্তরপত্র পরীক্ষক-ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হতেন। ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কোনো পূর্ব ধারণায় উপনীত হওয়া ছিল দুরূহ। তাই তাকে জানতে হতো অনেক কিছু, পড়তে হতো ব্যাপকভাবে। এক্ষেত্রে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে জ্ঞানের শূন্যতা। সেমিস্টার পদ্ধতি আমাদের দেশে ক্রমশ হয়ে উঠছে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল-প্রকাশের পদ্ধতি। কী পড়ানো হলো, শিক্ষার্থী কী পড়লো-এসবের পরিবর্তে যেন-তেন ভাবে পরীক্ষা নেয়াটাই এ পদ্ধতির প্রধান প্রবণতা হয়ে উঠছে আমাদের দেশে। এই প্রবণতাই শঙ্কার কারণ হয়ে উঠছে ক্রমশ।

জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষার মূল কাজ শিক্ষার্থীর চেতনায় জ্ঞান সৃষ্টি করা। জ্ঞান সৃষ্টি যদি না-ই হলো, তাহলে তো ব্যর্থ হলো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ সত্য আজ স্বীকৃত যে, কোনো দেশের উচ্চশিক্ষার হাল-চাল সে দেশের উন্নতি অবনতির সবচেয়ে বড় সূচক। মনে করতে পারি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর এই উক্তি-'বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু যথারীতি সুষ্ঠু হলে জাতির সব কিছু সুষ্ঠু হয়।' লেখাই বাহুল্য যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা এখন মোটেই সুষ্ঠু নয়। সর্বত্রই চলছে একটা জগাখিচুড়ি, একটা দায়সারা ভাব।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দু'টি বিষয় খুবই জরুরি। বিষয় দু'টো হচ্ছে-স্বায়ত্তশাসন (Autonomy) এবং জবাবদিহি (Accountability)। এই দুটো ক্ষেত্রেই আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। স্বশাসন এবং জবাবদিহির অভাব আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও জবাবদিহির প্রশ্নটি কঠিনভাবে অনুকরণ করা প্রয়োজন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বশাসনের নামে যাতে স্বেচ্ছাচারের চর্চা না করে সেদিকেও দৃষ্টিপাত জরুরি। শিক্ষাকে পণ্য বানানোর ফলে তার মূল উদ্দেশ্যই আজ ব্যাহত। সেক্ষেত্রে অবশ্যই রাষ্ট্রের একটা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। তাই যথার্থ জ্ঞানার্জনের পথ সৃষ্টি করতে হলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো জরুরি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এজন্য সময়ক্ষেপণেরও আর সময় নেই। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন সরকারি-বেসরকারি কলেজে। কলেজগুলোও বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বহুমাত্রিক ও দূরদর্শী উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা

অনুপম সেন

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় বর্তমানে সবচেয়ে বড় বাধা হল–উচ্চশিক্ষায় যারা আসছে তাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভিত খুবই দুর্বল। অনেকেরই মোটামুটি মানসম্মত ভাষা জ্ঞানও থাকে না। বিজ্ঞানের যেসব শিক্ষার্থী আসছে তাদের গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানও সন্তোষজনক নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। গত তিন দশকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের অনেকের মানের ক্ষেত্রেও দুর্বলতার বড় কারণ যথাযথ প্রক্রিয়ায় তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় ও আনুগত্য মুখ্য বিবেচনার বিষয় হিসেবে কাজ করেছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের দুর্বলতার বড় কারণ সেখানেও মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশেষত ১৯৭৫–এর পরবর্তী দুই দশকে জীবনমানের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি বড় প্রভাব ফেলে। এ দু'দশকে একটি নব্য ধনিক শ্রেণী গড়ে ওঠে মুখ্যত খেলাপি ঋণের সংস্কৃতির মাধ্যমে। এ সংস্কৃতি সাধারণ জনজীবনকেও প্রভাবিত করে। এ দুই দশকে মধ্যবিত্তের আকার অনেক বড় হয়েছে। বাংলাদেশে কিন্তু স্বাধীনতা–পূর্বকালে বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত যে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল তা তারা হারিয়ে ফেলে। এ স্থানটি নিয়ে নেয় নতুন ধনিক শ্রেণী। যাদের শিক্ষার ভিত তেমন দৃঢ় ছিল না এবং মূল্যবোধেও ঋদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব ছিল না। এর ফলে পুরো সমাজব্যবস্থায় মূল্যবোধের বড় অবক্ষয় দেখা দেয়। যেখানে শিক্ষকদের স্থান হয় অতি নিম্নে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষকরা আগে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে গভীর সম্মান পেতেন–তা থেকে তারা নির্বাসিত হন।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের অনেক শিক্ষকের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এমনকি গৃহকর্মচারীর মতো আচরণ করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন অফিসে শিক্ষকদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়,তা শিক্ষকদের মর্যাদাকে যে কোথায় নামিয়ে এনেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি শিক্ষকদের ন্যায্য বেতনভাতা ও পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসব অফিসে ঘুষ প্রদানেও বাধ্য হন। এসব বঞ্চনা ও অপমান দরিদ্র শিক্ষকদের চারিত্রিক

www.pathagar.com

অবনতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর ফলে অতি সামান্য বেতনের মর্যাদাহীন শিক্ষকের চাকরিতে মেধাবীরা আগ্রহ হারানোই তো স্বাভাবিক। সেখান নিম্ন মেধাবী ও যোগ্যতাহীন শিক্ষকদের দ্বারাই চলতে থাকে শিক্ষার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান এতই নিচে নেমে যায় যে শিক্ষার্থীরা অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে। এর ফলে হয়েছে এই উচ্চশিক্ষার জন্য যেসব শিক্ষার্থীরা আসে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি একেবারেই থাকে না বললেই চলে।

একসময় গ্রাম থেকে খুব মেধাবীরাও আসত। ৫০, ৬০ এমনকি ৭০ দশকে যারা সমাজ রাষ্ট্রজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অনেকেই গ্রাম থেকে সদ্য উন্মেষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। বর্তমানে গ্রাম থেকে আসা এ ধরনের মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য বলা চলে। আমাদের উচ্চশিক্ষাকে যদি প্রকৃত অর্থে উচ্চমানসম্পন্ন করতে হয় তাহলে আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জীবনমানে যথার্থ উন্নতি ঘটানো ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। একই সঙ্গে শিক্ষকদের হৃত সম্মানকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলেই আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক পাব। যারা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য যথাযথ ভিত তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারবেন। মনে রাখতে হবে, উন্নত দেশগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চেয়ে খুব কম বেতন পান না।

আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থী ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতেন গত কয়েক দশকে তাতেও একটা বিরাট ধস নেমেছে। এখন আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শুনলে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা সেভাবে অভিভূত হন না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আগে উল্লেখ করেছি- পেশায় আসতে সক্ষম হচ্ছেন তাদের মেধা, যোগ্যতা বা প্রকাশনার জোরে নয়,রাজনৈতিক বিবেচনায়। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিভাগেই এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন যাদের ভাষার ওপর অধিকার তাদের বিষয়ের ওপর অধিকার খুবই দুর্বল। প্রায়ই এই আক্ষেপ শোনা যায় যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের দক্ষতা ও যোগ্যতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন যোগ্য শিক্ষকের চেয়েও কম।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান বাড়ানোর যে পদক্ষেপ বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং তা অনেক আগেই নেয়া দরকার ছিল। উচ্চশিক্ষার মান বাড়াতে হলে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তা করতে হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা তিনটি শিক্ষাব্যবস্থাই একে অন্যের সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্কে বা একসূত্রে যুক্ত, উচ্চশিক্ষা অবশ্যই বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা। এখানে এ শিক্ষার একই সঙ্গে দুটো দিক রয়েছে। একটি হল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং আরেকটি হল জ্ঞানের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্ট দক্ষ জনশক্তি আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্পদ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে। আমরা যদি বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী অর্থনীতির দেশ জাপানের দিকে তাকাই তাহলে দেখব জাপান কোন খনিজ বা কৃষি সম্পদে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদে মোটেই ধনী নয়। উন্নতির স্থলে রয়েছে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান, জ্ঞানে সমৃদ্ধ জনশক্তি। চীনও একই পথে দ্রুত এগুচ্ছে। পণ্ডিতরা ধারণা করেন আগামী দুই তিন দশকের মধ্যে চীন পৃথিবীর প্রথম অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫ থেকে ৩০ বছরের লোকসংখ্যাই বেশি। অর্থাৎ এমন একটি প্রজন্ম আমাদের রয়েছে যারা সমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলে দ্রুত

www.pathagar.com

দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তার জন্য আমাদের অনেক মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি দরকার।

অধুনা দেশে অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে দেশের উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও এটা সত্য যে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলোতে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা দেয়া হচ্ছে না অর্থাৎ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার কোনো মান নেই বললেই চলে। কতিপয় ব্যক্তি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে একটা রমরমা শিক্ষা বাণিজ্য গড়ে তুলেছেন, যেখানে বস্তুত উচ্চশিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অনেক সরকারি ও প্রাইভেট কলেজে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সের ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। যেখানে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা মানসম্মত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিষয়ে অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রি দেয়ার জন্য ৫০০–৬০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য ন্যূনতম পক্ষে ১৫–২০ জন শিক্ষক রয়েছেন সেখানে এসব কলেজ মাত্র ৩–৪ জন শিক্ষক একাদশ–দ্বাদশসহ অনার্স ও মাস্টার্সের শিক্ষা দানের দায়িত্বে রয়েছেন। ফল হচ্ছে এই,তারা প্রায়ই ক্লাসে যান না এবং নিয়মিত সব ক্লাসে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার নামে উচ্চশিক্ষা একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আসলে জাতির উচ্চশিক্ষাকে ধুলায় মিলিয়ে দেয়ার দায়িত্বই পালন করছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিবর্তনের জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন দরকার। কারণ তাছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিরাট অংশ তথাকথিত উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট বিক্রিতে মগ্ন থাকবে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসবেন যেহেতু তারা বিষয়গুলো শিখবেন না তাদের পক্ষে জাতীয় সামাজিক অর্থনীতিতে বড় কোন অবদান রাখা প্রায় অসাধ্য হবে। তারা সার্টিফিকেটের ভার বহন করবেন কিন্তু সেই শিক্ষাকে জীবনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন না। আমি উন্নয়ন কথাটার ওপর জোর দিলেও জাপান, চীন, আমেরিকা, ইউরোপের সার্বিক অনুকরণে তৈরি একটি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা চাই না। আমাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, আইন, সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির যে বিশাল সমৃদ্ধি রয়েছে তাকে প্রথিত থাকতে হবে। আমাদের শিক্ষাকে কেবল উৎপাদনমুখী করলে চলবে না, একে মানবিকও করতে হবে। মনে রাখতে হবে, উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষকে কেবল উৎপাদনক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত করলেই হবে না, তার অন্তর্লোককে জ্ঞানের এবং মানবিক ভিত্তিতে আলোকিত করতে হবে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, ইউজিসি যদি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রগুলোতে সুন্দরভাবে দিকনির্দেশনা দিতে পারে তাহলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক দশকের মধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আগ্রহী ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমলাতন্ত্র না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি চলিষ্ণু। বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ভিত্তিগুলো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশ বড় ভূমিকাই রাখতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যথার্থ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকেও ভূমিকা রাখতে হবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন কেবল সার্টিফিকেট বিক্রির কেন্দ্র না হয় তার জন্য অবিলম্বে প্রস্তাবিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি পাস করতে হবে। প্রয়োজনে

www.pathagar.com

সরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্যও দিতে পারে যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কোন একটি অতি প্রয়োজনীয় ডিসিপ্লিন বা বিষয় খোলায় এবং তা এগিয়ে নেয়ায় ভূমিকা রাখে। উদাহরণ হিসেবে কম্পিউটার সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, এটমিক ফিজিক্স ইত্যাদি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কম্পিউটার প্রযুক্তির মতো একটি বিশেষ বিষয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত করে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার–দুটোতেই দ্রুত উন্নয়ন করতে, সমাধা করতে পারে। দেশকে ডিজিটাল করতে এ প্রক্রিয়ায় বড় অবদান রাখতে পারে। মাইক্রোবায়োলজি, এটমিক ফিজিক্স বা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্ব দানের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত যেসব পদক্ষেপ নিতে পারে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তা সময়সাপেক্ষ হতে পারে। বস্তুত ইতিমধ্যে বেশক'টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নতুন বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষাদানেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের একটি দেশ ও জাতিভিত্তিক দর্শন গড়ে তুলতে হবে। এই দর্শনের কেন্দ্রে থাকবে–একটি দারিদ্রমুক্ত, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষা ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল খালেক

দেশের অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালরে শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়, পত্রপত্রিকায় এমন কথা প্রায়ই প্রচারিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন তথ্য থেকে ধারণা করা যায় অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন নয়। জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনকালে দেশে অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ঢাকার বড় বড় বাজার এলাকায়। কোন্‌টি দোকানঘর আর কোনটি বিশ্ববিদ্যালয় বুঝতেও বেশ কষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মানুষের যে উচ্চ ধারণা ছিল, দোকানঘরের সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতির বিশ্ববিদ্যালয় দেখে তাদের সে ধ্যান-ধারণা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। একটি প্রাইভেট কলেজের যে পরিমাণ জায়গা জমি এবং অবকাঠামো আছে, অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তাও নেই। কোচিং সেন্টারের অবকাঠামো নিয়ে চালানো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। তবে, এ কথাও সত্য, উন্নতমানের কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় দেশে আছে।

কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট কলেজ ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট দেয়ার মাধ্যমে বোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট ডিগ্রী পেয়ে থাকে, কাজেই তাদের সার্টিফিকেট বা ডিগ্রীর মান নিয়ে প্রশ্ন তুলবার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু অনুমোদিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেরাই ডিগ্রী প্রদান করতে পারে বিধায় শিক্ষার মান যদি ভাল না হয় সে ক্ষেত্রে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দেশের অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে পারছে কিনা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কিছু দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। উক্ত সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান শিক্ষার মান নিয়ে যে সব কথা বললেন, তাতে মনে হলো ৮/১০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অবশিষ্ট প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ভাল নয়। প্রসঙ্গক্রমে আমার নিজের অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখ করতে পারি।

২০০৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর আমেরিকা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশাহী শাখায় যোগদানের জন্য আমাকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। প্রশাসনে নয় শিক্ষকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে আমি সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু খুব বেশিদিন তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারিনি। শিক্ষা প্রদান সেখানে মূল লক্ষ্য নয়।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থের বিনিময়ে ডিগ্রী প্রদান। দীর্ঘদিনের লালিত আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে আমেরিকা বাংলাদেশ নামের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়টিতে চাকরি করতে পারিনি।

দেশে যে হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, তাতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। তবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মঞ্জুরি দেয়ার আগে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই বাছাই করে দেখা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, চারদলীয় জোট সরকারের আমলে অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা মালিক, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তাঁরা প্রায় সবাই জামায়াত-বিএনপি এবং এর উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন। শিক্ষার প্রতি মমত্ববোধ থেকে তাঁরা অর্থ বিনিয়োগ করেননি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে পাঁচ কোটি টাকা রিজার্ভ ফান্ড করায় জামায়াত-বিএনপির শিল্পপতিগণ অধিক সুযোগ লাভ করেছেন। শিল্পপতিদের কবল থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করতে হলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নীতিমালার সংশোধন অত্যন্ত জরুরী।

যতদূর জানা গেছে সামনের সংসদ অধিবেশনে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি সংশোধিত নীতিমালা প্রণীত হবে। আওয়ামী লীগ যখন গত সংসদে বিরোধী দলে ছিল, সেই সময় আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ উপকমিটি দেশের নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, তার একটি রূপরেখা করে রেখেছে। উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী, আমি ছিলাম কো-চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব ছিলেন জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ (বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী)। উচ্চশিক্ষা তথা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিভিন্ন সেমিনার এবং গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ উপকমিটি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করলে উচ্চশিক্ষার মান উন্নত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জামায়াত-বিএনপি জোট সরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ফান্ডের টাকা দু'কোটি থেকে বাড়িয়ে পাঁচ কোটি টাকা করেছিল। টাকার অঙ্ক বাড়ানোর ফলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চলে গেছে দেশের বড় বড় শিল্পপতিদের হাতে। বাংলাদেশে এমন কোন শিক্ষাবিদ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি পাঁচ কোটি টাকা রিজার্ভ ফান্ডে দেবার সামর্থ্য রাখেন। যে কারণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ আর শিক্ষাবিদদের হাতে নেই। ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সে শিক্ষা অর্থ উপার্জনের কারখানা হতে পারে, অন্য কিছু নয়। যে শিল্পপতি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খাতে পাঁচ থেকে দশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন, তিনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই সে টাকা আদায় করবেন মুনাফাসহ। বাস্তবে তাই ঘটছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রক্ষা করতে হলে রিজার্ভ ফান্ডের টাকা ছেঁটে ফেলতে হবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেশের প্রাইভেট কলেজগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। প্রাইভেট কলেজগুলোতেও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রাইভেট কলেজে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা চলছে, এমন অভিযোগ খুব একটা শোনা যায় না। যত অভিযোগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ে। রিজার্ভ ফান্ডের ব্যবস্থা প্রাইভেট কলেজেও আছে, কিন্তু তার পরিমাণ কম। রিজার্ভ ফান্ডের টাকার পরিমাণ কমিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তুলে দিতে হবে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের হাতে, তবেই শিক্ষার মান উন্নত হবে, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা বন্ধ হবে।

www.pathagar.com

উন্নত মানের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশে যোগ্য শিক্ষাবিদের অভাব আছে তেমনটি মনে হয় না। যিনি ভাল শিক্ষক, তিনি সমাজের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সম্মানিত মানুষ। তিনি কিছু নীতি এবং আদর্শকে লালন করবেন। তিনি বরং আর্থিক অভাব অনটনে দিন কাটাবেন, তবু নিজের ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে শিল্পপতিদের দয়া দাক্ষিণ্যের ধারে কাছেও যেতে চাইবেন না। দেশে এ রকম অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ পাওয়া যাবে, যাঁদের মাধ্যমে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব। জামায়াত–বিএনপি জোট সরকার তাদের পাঁচ বছরের শাসনকালে দেশে যে অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিল, তার পেছনে রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এমন কথা বলা যাবে না। অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী–মূল্যবোধ দর্শনের প্রচার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। জামায়াত–বিএনপির আদর্শ পরিপন্থী যে সমস্ত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় দেশে রয়েছে, জোট সরকার সৃষ্ট প্রতিকূলতার সঙ্গে পাঁচ বছর কঠোর যুদ্ধ করে তারা টিকে আছে।

জোট সরকারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে লালিত হয়েছে, অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির একটি শাখা ক্যাম্পাস আছে রাজশাহীতে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির রাজশাহী ক্যাম্পাসের পরিচালনায় যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সবাই আমার অতি পরিচিত সহকর্মী। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনা করেছি; উপ–উপাচর্য এবং উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছি। সে কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের রাজনৈতিক পরিচিতি আমার নখদর্পণে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত শিক্ষক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ–দর্শনের নেতৃত্বে আছেন, সেই সমস্ত মৌলবাদী শিক্ষকের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির রাজশাহী ক্যাম্পাস। তবে আওয়ামী লীগের দিন বদলের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দল বদলের পালা শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁর সুযোগসন্ধানী শিক্ষক, তাঁরা দল বদলে অতিশয় পারদর্শী। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণচোরা শিক্ষকের অভাব নেই। শোনা যাচ্ছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির রাজশাহী ক্যাম্পাসের মৌলবাদী শিক্ষকেরাও এখন আওয়ামী–বাম ঘরানার শিক্ষক হিসেবে পরিচিত লাভের চেষ্টা করছেন।

রাজশাহী মহানগর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যাবে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক যাঁরা চাকুরী থেকে অবসরে যাচ্ছেন, তাঁদের নেতৃত্বে রাজশাহীতে এক বা একাধিক পূর্ণাঙ্গ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চলতেই পারে। রাজশাহীতে কোন শাখা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোক, সেটাই এ অঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশা। শুধু রাজশাহীতে নয়, বাংলাদেশের কোন শহরেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা–প্রশাখার অনুমোদন দেয়া সমীচীন হবে না। কারণ তাতে উচ্চশিক্ষার মান নেমে যাবে। পত্রপত্রিকায় দেখেছি বর্তমান সরকার বিগতভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শাখা–প্রশাখা খোলার অনুমতি দেবে না। অথবা উচ্চশিক্ষা নিয়ে কাউকে ব্যবসা করারও সুযোগ দেবে না। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে শিক্ষামন্ত্রী যে বলিষ্ঠ এবং সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে তার কথার সঙ্গে কাজের মিল রয়েছে। যা উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

খবরটি ছোট। হয়তো অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু অর্থ বেশ ব্যাপক ও গভীর; এবং তা অত্যন্ত এ দেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য। সম্প্রতি দেশের ১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি জরুরি সিদ্ধান্ত মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে ১৭ জন উপাচার্যকে অবহিত করানো হয়েছে। সিদ্ধান্তটি হলো, আগামী দু মাসের জন্য সকল পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত থাকবে। হঠাৎ এমন একটি সিদ্ধান্তের কারণ কী? প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেল যে, নিকট অতীতে শিক্ষক নিয়োগে যে অনিয়ম হয়েছে তা এ সময়ে খতিয়ে দেখা হবে এবং এমন অনিয়মের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় তার ব্যবস্থাও করা হবে। উপরন্তু এমন একটি খবরের পাশাপাশি আরো একটি খবর ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এমন অনিয়ম করার মূলে আছে বহুল আলোচিত ও সমালোচিত '৭৩-এর অধ্যাদেশ। অবশ্য সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এ অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত নয়। তবে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত সেগুলোর বেলায় এমন অভিযোগ প্রযোজ্য। অন্যদিকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও অভিন্ন অভিযোগ আছে। কিন্তু তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও গুণ-মান ইত্যাদি বিতর্ক হলেই অনেকটা যেন আবেগপ্রসূত কারণেই '৭৩-এর অধ্যাদেশ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কর্মসূচির ফ্রন্ট দুটো-শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও '৭৩-এর অধ্যাদেশ। অভিযোগ দুটোরই ভিত্তি আছে। অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হালহকিকত যাদের জানা আছে, এবং যারা রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে বিষয় দুটো নিয়ে ভাবেন, তারা এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের যুক্তি খুঁজে পাবেন না।

অভিযোগ দুটো নিয়ে খোলামেলা কিছু বলার আগেই বলা প্রয়োজন যে, কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই এখন যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় নয়; এবং তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পরিপ্রেক্ষিত থেকেই (অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, উচ্চ ফলনশীল প্রজাতিভুক্ত সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইভেট সেক্টরেও ঘাটতি অনেক। বিষয়টি পৃথক আলোচনার দাবিদার। এমনকি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে একদা খ্যাত আমার পঠন-পাঠনের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়টিও এমন তির্যক মন্তব্যের আওতার বাইরে নয়। আপাতদৃষ্টিতে এমন মন্তব্য ঢালাও হিসাবে মনে হতে পারে। কিন্তু মন্তব্যটির সপক্ষে যে তথ্য-প্রমাণ হাজির করা যেতে পারে, তার পরিমাণ বিপন্ন বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানামাত্রিক যে ধসের কথা বলা হচ্ছে, তার সূচনা স্বাধীনতার পর থেকে। কিন্তু তা তো হওয়ার কথা ছিল না। স্বাধীনতাপূর্ব কালো আইনে স্বাধীনতাহীন বিশ্ববিদ্যালয় নানাভাবে সঙ্কুচিত থাকলেও এমন ধস ছিল না। আর তা হলে স্বাধীনতার পর সাদা আইনে স্বাধীনতাপূর্ণতায় এমন ধস কেন? প্রশ্নটির উত্তর বেশ জটিল ও বহুমাত্রিক। সহজ ও সরলীকৃত কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অবহিত যে কেউ উত্তরটি বা উত্তরসমূহ জানেন।

প্রথমে নিয়োগ-অনিয়মসংক্রান্ত অভিযোগটিই খতিয়ে দেখা যাক। শুরুতেই একটি তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পাঠকদের জানা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদক্রম নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত চারটি-প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক। নিচ থেকে সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত প্রতিটি পদে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার (Open Competition) মধ্য দিয়ে নতুন নিয়োগ পেতে হয় এবং সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদোন্নতি বলতে কিছু নেই। সহজেই বোধগম্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার পেশা অন্যান্য পেশার চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং মেধা ও মেধাভিত্তিক শ্রমনির্ভর। বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত রীতিপদ্ধতি কাগজ-কলমে এমন ধারণাই দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এসব কাগুজে রীতি-পদ্ধতির দুস্তর ব্যবধান। এ ব্যবধান সৃষ্টির উৎস কথিত অনিয়ম।

এবার আসা যাক অনিয়মটি কিভাবে সৃষ্টি হয়, সে কথায়। চারটি ভিন্ন পদে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা বিভিন্ন। যেমন-প্রভাষক পদে নিয়োগ পেতে হলে ন্যূনতম যোগ্যতা দুটো প্রথম বিভাগ/প্রথম শ্রেণী এবং শিক্ষাজীবনের কোনো পরীক্ষায়ই তৃতীয় শ্রেণী থাকলে চলবে না। এই শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত প্রযোজ্য। উচ্চতর পদগুলোতে উচ্চতর শিক্ষা/ডিগ্রি ও গবেষণা-প্রকশনাসংক্রান্ত অতিরিক্ত যোগ্যতা যুক্ত হয়। যেমন অধ্যাপক পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে : ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা/এমফিল বা পিএইচডি অথবা সমমানের গবেষণা ডিগ্রি/তিনটি গবেষণাগ্রন্থ বা স্বীকৃতমানের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত অন্তত ১৫টি গবেষণা প্রবন্ধ ইত্যাদি। আরো কিছু আনুষঙ্গিক যোগ্যতার ব্যাপারও আছে।

প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিযোগ আছে যে, শিক্ষক নিয়োগ না করে দলীয় বিবেচনায় ভোটার নিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পান। অভিযোগটি ঢালাওভাবে করা সম্ভব নয়। তবে জানা আছে যে, প্রায়ই এমন হয়। আর সে কারণে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের ঃ বর্ণবাদ কায়েম আছে। কারণ জাতীয় পর্যায়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড় হিসেবে শিক্ষকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী-বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত। সে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে তাদের শিক্ষকদের সম্বোধন করে 'হোয়াইট স্যার', 'ব্লু স্যার' ও 'পিঙ্ক স্যার' অভিধায়।

শিক্ষক নিয়োগে কতদূর অনিয়ম হয়েছে বা হয় তা খতিয়ে দেখতে হলে একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো, পদ অনুযায়ী উল্লিখিত যোগ্যতাসমূহের বিপরীতে ওই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীর যোগ্যতাসমূহ (বা অযোগ্যতাসমূহ?) তুলনা করা। আর তা হলেই সহজ সত্যটি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হবে। উল্লেখ্য, এমন অনিয়ম অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশি দৃশ্যমান। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমনও অনেক অধ্যাপক আছেন, যাদের শিক্ষা ও গবেষণাসংক্রান্ত ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। অবশ্য এটা ঠিকই যে, রাজনৈতিক বিবেচনায় বা অন্য বিবেচনায় এমন তথাকথিত অধ্যাপকদের প্রার্থিতা ছিল অপ্রতিরোধ্য।

www.pathagar.com

কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্যটি হলো, এমন অনেক অধ্যাপক সব সরকারের আমলেই বিভিন্ন উঁচু পদ অলঙ্কৃত করেছেন বা করছেন। এমন দৃষ্টান্ত বিগত সরকারের আমলেও ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে এই দৃষ্টান্তের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। কাজেই অনিয়ম খতিয়ে দেখার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা কতদূর গড়াবে?

নিয়োগের অনিয়মের একটি পদ্ধতি পদ পুনর্বিন্যাস (Restructuring or Upgrading)। পদ্ধতিটির সূচনা হয়েছিল এমন একটি উদ্দেশ্যে যে, পদ শূন্য বা থাকায় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক উচ্চতর পদে নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তখন তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ তিনি সহকারী অধ্যপক হলে পদটি হয়ে যাবে সহযোগী অধ্যাপকের। এমন বিবেচনা নিঃসন্দেহে মানবিক ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছে বা হচ্ছে তা ভিন্ন ব্যাপার। কোনো শিক্ষক প্রয়োজনীয় একাডেমিক যোগ্যতাহীন হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের কারণে পয়েন্ট অর্জন করে উচ্চতর পদে নিয়োগ পান। দায়িত্বগুলো হলো প্রক্টর, প্রভোস্ট, ওয়ার্ডেন, আবাসিক শিক্ষক ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এমন প্রতিটি দায়িত্বের কারণে একজন শিক্ষক নানা ধরনের আর্থিক ও আবাসিক সুবিধা পান। অর্থাৎ একই কাজের জন্য তিনি দুবার দু ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর দিকটি হলো, নন-একাডেমিক কাজের জন্য একাডেমিক সুবিধা দেওয়া। পদ্ধতিটির মৌলিক উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হলে আপত্তির কিছু থাকবে না।

নিয়োগ থেকে শুরু করে অন্যান্য অনিয়মের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে '৭৩-এর অধ্যাদেশ। কারণ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। আর স্বায়ত্তশাসনের বর্মের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় সব অনিয়ম। কিন্তু মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ ধারণাটি সংজ্ঞায়িত হওয়া প্রয়োজন। এ স্বায়ত্তশাসন হবে একাডেমিক ব্যাপারে, প্রশাসনিক ব্যাপারে নয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি চলছে সম্পূর্ণ উল্টোভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়েরই হোক বা দেশেরই হোক কোনো পর্যায়েই প্রশাসন দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার বাইরে থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান দুটো পূর্বশর্তই হলো দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা।

'৭৩-এর অধ্যাদেশের অন্তর্নিহিত বার্তাটিই এমন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণভিত্তিক রাজনীতি অনিবার্য। একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক পদসমূহ কোনো বিচারেই নির্বাচনভিত্তিক হতে পারে না। শিক্ষক সমিতির জন্য নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু ডিন, প্রভোস্ট ও উপাচার্য-ইত্যাদি পদ নির্বাচনের বাইরে যোগ্যতাভিত্তিক হতে হবে। উপরন্তু এমন পদের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি নির্দিষ্ট থাকা উচিত। অবশ্য এমন তিনটি পদের জন্য যোগ্যতা হিসেবে নির্ধারিত আছে অধ্যাপক মর্যাদা। কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ পদ্ধতিতে প্রশ্নসাপেক্ষ মানের অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকলে শুধু অধ্যাপক মর্যাদাটি যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে পর্যাপ্ত নয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সে বর্তমান চালচিত্র তার দুটো বৈশিষ্ট্য-অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ মানের শিক্ষক ও প্রশ্নসাপেক্ষ মানের প্রশাসন। আর সব মিলিয়ে যোগফল হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানে ও ভাবমূর্তিতে ধস।

বিশ্ববিদ্যালগুলোর খোলনলচে পাল্টানো প্রয়োজন। নইলে যে কী হবে তার ইঙ্গিত আমার প্রিয়ভাজন, অনুজপ্রতিম অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল কিছুদিন আগে এই পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আদমজী জুট মিল হতে চলেছে। মন্তব্যটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্রেও শিক্ষার সঙ্গে তার যোগ নিবিড়। কাজেই তার কাছে প্রত্যাশাও সঙ্গত। এই প্রত্যাশায় দুটো দৃষ্টি আকর্ষণমূলক বক্তব্য পরিশেষে সংযোজন করা হলো। এক, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম খতিয়ে দেখতে গেলে ঠগবাছার প্রক্রিয়ায় নিজের গাঁ উজাড় হওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই পারবেন তো? দুই, বিশ্ববিদ্যালয় বা '৭৩-এর অধ্যাদেশ সংস্কার করতে হলে ধীরেসুস্থে ও ভেবেচিন্তে করা ভালো। তবে শুরু হতে পারে এমন একটি কমিশন নিয়োগ দিয়ে, যার কর্ণধার ও সদস্যবৃন্দ হবেন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ। তবে প্রচারে প্রসারিত হওয়া তথাকথিত শিক্ষাবিদ নয়। সেই শিক্ষাবিদ যার একাডেমিক যোগ্যতা প্রশ্নাতীত ও শিক্ষাভাবনা স্বীকৃত এবং সমাদৃত প্রশ্নসাপেক্ষ তথাকথিত শিক্ষাবিদ দিয়ে কাজ হবে না। কারণ সরষের মধ্যে ভূত থাকলে সেই সরষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো যায় না।

www.pathagar.com

স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মাসতিনেক আগের ঘটনা। শাহজালাল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা–কর্মচারী সবাই মিলে একেবারে স্থবির হয়ে মুখথুবড়ে পড়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়টির ভেতরে জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন করছে। সরকার তাদের কথায় কান দেবে কি না সেটি কেউ জানে না। সবার ভেতরে এক ধরনের উদ্বেগ, ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা।

সবার মনে আশা জাগিয়ে রাখার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো একটি সেমিনার দেওয়ার জন্য। সেমিনারের বিষয় : আমরা কী ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি। সেই সেমিনারে আমি পেপারটি পড়েছিলাম। আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিলাম এটি শুধু আমার নয় এটি অনেকেরই স্বপ্ন।

১

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় অর্ধশত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, তাদের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও অনেক, তার পরেও আমি মনে করি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তার মূল কারণ দুটো। প্রথম কারণ হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানের চর্চা করা হয়, সেগুলো করা হয় শিক্ষা আর গবেষণার ভেতর দিয়ে। কোন বিষয়ের ওপর জ্ঞানের চর্চা করা, হবে তার কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই–সাধারণভাবে বলা যায় যতো বেশি বিষয় সম্ভব ততো ভালো। ব্যবহারিক জীবনে কোনো গুরুত্ব নেই এরকম জ্ঞানকেও ধরে রাখতে হয় এবং একটা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। আমাদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে ব্যাপারে এখনো ভয়াবহ দৈন্যতা দেখিয়ে আসছে। অর্ধশত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলোতেই শুধু দুটি বিষয়ের চর্চা করা হয়, সে দুটি হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় প্রশাসন। এটি ট্রেনিং সেন্টারের কাঠামো হতে পারে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো হতে পারে না। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এর ছাত্রছাত্রী। আমাদের দেশের মূল জনগোষ্ঠী হচ্ছে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত, কাজেই যে প্রতিষ্ঠানে দেশের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তরা পড়াশোনা করতে পারে না সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের মূল ধারার বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে না। সেই হিসেবে দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো দেশের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, ভবিষ্যতে কখনো হয়তো এগুলো দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারবে কিন্তু এখনো সম্পৃক্ত নয় সেটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এই মুহূর্তে শুধু পাবলিক

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই দেশের মূলধারার বিশ্ববিদ্যালয় কারণ সেখানেই দেশের মূলধারার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখতে পারে।

কাজেই আমরা যখন একটি সুন্দর এবং আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি সেটি হয় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন, যে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পাবে, যেখানে প্রয়োজনীয় এবং 'অপ্রয়োজনীয়' সকল বিষয়ই থাকবে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা দেশের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সকল ছাত্রছাত্রীই পড়াশোনা করতে পারবে।

২

আমি যেহেতু স্বপ্ন দেখার কথা বলছি তাই ইচ্ছে করলেই সেটি স্বপ্নটি একটি দিবাস্বপ্নে পরিণত করে ফেলা যায়। আমি পাশ্চাত্যের একটি ঐতিহ্যময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখতে পারি। যেটি অর্থ বিত্ত সম্পদে চোখ ধাঁধানো, যেখানে প্রতি বিভাগে বিশ্বমানের গবেষণা হয়। যেখানকার বিজ্ঞান গবেষকরা জগদ্বিখ্যাত–ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বপ্ন দেখতে আমার কখনো সমস্যা হয় না–ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃসময়গুলো কাটিয়ে এসেছি। কিন্তু তারপরেও আদর্শ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখার সময় আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখতে চাই যেটি এই দেশে এই সময়ে পূরণ করা সম্ভব। দেশের সকল নেতিবাচক অবস্থার মাঝে সকল বাস্তব সমস্যাকে মনে রেখে এই দেশে যে ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জীবদ্দশাতে তৈরি করা সম্ভব আমি সেই ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যাালয়ের স্বপ্ন দেখতে চাই। আমি যেহেতু বাংলাদেশ আমার কর্মজীবনটুকু শাহজালাল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছি আমার স্বপ্নটুকু যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছাকাছি হয় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৩

একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কল্পনা করলে সবার প্রথমে আসে একাডেমিক বা পড়াশোনার ব্যাপারটি। আজকাল অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই তার নামের সঙ্গে 'বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি' শব্দটি জুড়ে দিয়ে নতুন পৃথিবীতে এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব বোঝানো হয়। কিন্তু আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পড়ানো হবে সেই তত্ত্বে বিশ্বাস করি না। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীর একটা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ এম আই টি (ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) টেকনোলজিতে গুরুত্ব দেবে বলে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় দাবি না করে বিনয় সহকারে ইনস্টিটিউট হিসেবে দাবি করেছে–তার পরেও সেখানে প্রায় সকল বিভাগ রয়েছে। কাজেই আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি বা প্রকৌশলের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই ভৌত বিজ্ঞান বা ন্যাচারেল সায়েন্সের বিভাগগুলো (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ইত্যাদি) থাকতে হবে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় নির্বাচনগুলো অত্যন্ত আধুনিক। ভবিষ্যতে প্রাণী বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়গুলো–অর্থাৎ বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি বা জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই ধরনের কয়েকটি বিষয় খোলা হলে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। একই সঙ্গে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাশাপাশি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কমিউনিকেশন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এই বিষয়গুলো খোলার সময় চলে এসেছে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা হওয়া প্রয়োজন দশ হাজারের মতো। এর চেয়ে বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় হলে তার প্রশাসনিক কাজ

www.pathagar.com

সম্ভব একটু দুরূহ হয়ে যেতে পারে। এখানে ত্রিশ থেকে চল্লিশটি বিভাগ থাকতে পারে, দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে সেই বিভাগের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশি কিংবা কম হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শতকরা বিশ ভাগ যদি হতো স্নাতকোত্তর তাহলে সেটি হয় তো সবচেয়ে চমৎকার কিন্তু আমাদের দেশে এই মুহূর্তে সেটি হয়তো সবচেয়ে কঠিন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় নয় যতোক্ষণ পর্যন্ত সেটি শিক্ষাদানের পাশাপাশি গবেষণা না করছে এবং গবেষণার জন্য স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন। শিক্ষাদানে তারা টিচিং এসিস্টেন্ট হিসেবেও কাজ করতে পারে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের একটা ভয়াবহ সংকট রয়েছে, যে শিক্ষক পড়ান যদি তিনি তার হোমওয়ার্ক দেখার জন্য টিউটরিয়াল নেওয়ার জন্য, মিডটার্ম পরীক্ষা নেওয়ার জন্য, ল্যাবরেটরিতে সহায়তা নেওয়ার জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের টিচিং এসিস্টেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে দুটি বড়ো উপকার হয়। এক. অনেক কম নিয়মিত শিক্ষক দিয়ে অনেক বেশি কোর্স পড়ানো সম্ভব এবং দুই. টিচিং এসিস্টেন্টরা নিয়মিত শিক্ষক নয় বলে তাদের পেছনে অর্থব্যয় হয় কম এবং একটা অর্থনৈতিক সাশ্রয় হয়।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেখানে স্নাতকোত্তর বা গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম গড়ে ওঠেনি। আমি তারপরেও মনে করি প্রয়োজনে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদেরকেই টিচিং এসিস্টেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষকদের ওপরে চাপ একটু কমানো এবং একই সঙ্গে সেই ছাত্রদের খানিকটা অর্থনৈতিক সাশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। আমি জানি আমাদের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রাইভেট টিউশনির মতো পরিপূর্ণ অর্থহীন মর্যাদাহীন আনন্দহীন একটি কাজ করতে হয়।

কোর্স নেওয়ার ব্যাপারে আমি ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। একটা বিষয়ে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে কী কী কোর্স নিতে হবে তার একটা রূপরেখা বা গাইডলাইন থাকবে। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মূল বিষয় (সর্বোচ্চ ৬০%) কিছু আনুষঙ্গিক (২০%) এবং বাকিগুলো তার ইচ্ছে মতো বা সখের বিষয়। আমরা পড়াশোনার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রায় সব সময়েই একচক্ষু হরিণের মতো করে ফেলি, যেমন পদার্থবিজ্ঞানের একটা ছাত্রকে তার বিষয়ের বাইরে গণিত, ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার এই ধরনের বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয় শেখাতে আগ্রহী হই না। আমি পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিল রেখে তাকে অল্প হলেও অর্থনীতি, সাহিত্য এমন কি দর্শনের মতো কিছু বিষয়ের কোর্স দিতে আগ্রহী হবো। একজন বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রকে এই ধরনের বিষয় পড়তে বলা হলে পৃথিবীর কোনো দেশেই তারা সেটা আগ্রহ দিয়ে পড়ে না–কিন্তু এরকম জোর করে পড়তে বাধ্য করা হলেও তার ভেতরে সূক্ষ্ম এক ধরনের পরিবর্তন হয় যেটা সে নিজেই সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে। বিজ্ঞানের যুক্তিতর্ক এক ধরনের–কিন্তু তার পাশাপাশি শিল্প–সাহিত্য বা দর্শনে অন্য এক ধরনের যুক্তি রয়েছে। আমি চাই সেই বিষয়গুলোতেও তাদের একটা ধারণা থাকুক। তবে আমি সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে চাই একটি বিষয়ে–সেটি হচ্ছে তারা যেন খুব সহজে এবং স্বচ্ছন্দে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে, ভাষার ওপরে তাদের যেন একটা সহজাত দখল চলে আসে। আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতির অব্যবস্থার কারণে ছাত্রছাত্রীদের ভেতর সৃজনশীলতার খুব অভাব, আমি তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই দৈন্যতা দূর করতে আগ্রহী। আমি মনে করি তারা আন্ডারগ্রাজুয়েট পড়ার সময়ই যেন যে কোনোভাবে গবেষণার স্বাদটুকু পেয়ে যায়। তারা যেন কোনো প্রজেক্ট মনোগ্রাফ বা থিসিস রচনা না করে তার ডিগ্রি শেষ না করে।

www.pathagar.com

একই সঙ্গে আমি সকল ছাত্রছাত্রীদের নতুন পৃথিবীর হাতিয়ার কম্পিউটার বিষয়ে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক মনে করি। একজন ছাত্র বা ছাত্রী যে বিষয়েই পড়াশোনা করুক না কেন তাকে কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে। কলমও এক ধরনের হাতিয়ার কিন্তু সেটা দিয়ে লেখা ছাড়া আর কিছু করা যায় না, কম্পিউটারও সে রকম এক ধরনের 'হাতিয়ার' কিন্তু সেটা দিয়ে কী করা যায় তার তালিকা কখনই শেষ হবে না, তার কারণ একজন মানুষের সৃজনশীলতা যতো বেশি সে ততো বেশি ভাবে একটা কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে। আমি বেশ গর্ব করে বলতে পারি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এটা অর্জন করেছি–এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী কম্পিউটারের ওপর কমপক্ষে চারটি কোর্স নেয়, আমার যে অল্প কয়েকজন তরুণ সহকর্মী সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার জন্য এই পরিশ্রমটুকু করে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রমের ভেতর আমি সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় যোগ করতে আগ্রহী, সেটি হচ্ছে শারীরিক শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট বা ফুটবল টিম সারা দেশের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেটি আমার স্বপ্ন নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্র এবং ছাত্র কোনো না কোনো ধরনের খেলাধুলায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন যতো গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি সুইমিংপুল, জিমনাশিয়াম বা খেলার মাঠ ঠিক ততোটুকু গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত কোর্সের ভেতরে বাধ্যতামূলক কিছু ক্রেডিট থাকা উচিত যেটি হবে খেলাধুলা সংক্রান্ত।

এই প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্য একটি প্রসঙ্গ চলে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার মাঠ, সুইমিংপুল, বা জিমনাশিয়ামের কথা কল্পনা করলেই চোখের সামনে একটা বিশাল ক্যাম্পাসের ছবি ভেসে আসে। আমি ক্যাম্পাসবিহীন একটা বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনা করতে পারি না। আমি মনে করি একটা দালানের কয়েকটা তলাতে কয়েকটা কক্ষ নিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হলে নিশ্চিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি একটা বড়ো অবিচার করা হয়।

আমি আমার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই চারটি জনপ্রিয় বিভাগের বাইরেও অসংখ্য বিভাগের কথা কল্পনা করেছি, কিন্তু বাস্তবে কোথাও সেটা দেখতে পাচ্ছি না। পাশ্চাত্য দেশকে আমরা সবসময় উদাহরণ হিসেবে কল্পনা করতে ভালোবাসি। সেই সব দেশেও ভৌত বিজ্ঞান বিষয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমে আসছে বলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এটি একটি ভয়াবহ রকম অদূরদর্শিতা একেবারে চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় আজ থেকে এক দশক পরেই সারা পৃথিবী এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতবিক্ষত হবে। স্কুল–কলেজে পড়ানোর মতো বিজ্ঞানের ছাত্র দেশে নেই এর থেকে ভয়ংকর ব্যাপার কী হতে পারে? আমরা অদূরদর্শী হতে চাই না, আমরা সমস্যাটাকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে তার মুখোমুখি হতে চাই।

আমাদের দেশে ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার সায়েন্স বা ব্যবসা প্রশাসনের মতো দুই একটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী নয় তার মূল কারণ হচ্ছে চাকরি। অনেকেরই ধারণা ও ধরনের দু–একটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা না করলে পাস করে তারা চাকরি পাচ্ছে না এবং তার মাঝে খানিকটা সত্যতাও আছে। কিন্তু এর বাইরেও কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো সবার জানা উচিৎ। ভৌত বিজ্ঞান এমন কি সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পড়াশোনা করে তথ্যযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে কিংবা ডিপ্লোমা

www.pathagar.com

নিয়েও যে একজন ছাত্র বা ছাত্রী তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে সেই তথ্যটি সবাইকে দেওয়া হয়নি। আমার ধারণা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ডিগ্রি দেওয়ার মতো অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাহলে সব বিষয়েই সকল ছাত্রছাত্রীকে সমানভাবে উৎসাহী করা সম্ভব হবে। শুধু বাড়তি কিছু কোর্স নিয়ে একাধিক বিষয়ে ডিগ্রি নেওয়ার ব্যাপারটি চালু করেও আমরা দুই একটি হাতেগোনা বিষয়ের ওপর চাপটি কমাতে পারবো।

আমি আমার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিতে আগ্রহী। তারা প্রথমে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ভর্তি না হয়ে একটি অনুষদ বা ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হবে। প্রথম এক বছর বিভিন্ন কোর্স নিয়ে তারা নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তখন পছন্দসই একটা বিষয়কে নিজের ডিগ্রি নেওয়ার বিষয় হিসেবে বেছে নেবে। অত্যন্ত সহজ এবং কার্যকর এই পদ্ধতিটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েয় গ্রহণ করা খুব সহজ। কারণ আমরা সবাই জানি বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকেই গণিত,পরিসংখ্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ইংরেজি এবং বাংলা এ ধরনের কয়েকটি বিষয়ের ওপর প্রায় একই কোর্স নিতে হয়। সমাজবিজ্ঞান বা অন্য ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীদের জন্যও এই কথাটি সত্যি। কাজেই প্রথম এক বছর তাকে তার ভিত্তিটুকু গড়ার সুযোগ দিলে কে কোন বিষয়ে ভালো করবে সেটি আরো অনেক নিখুঁতভাবে বের করা সম্ভব।

যে বিষয়টুকু এখনো বলা হয়নি কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছে সবাই জানে সেটি হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা হবে সেমিস্টার পদ্ধতিতে। নানা কারণে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে সেমিস্টারগুলো শেষ করতে পারি না। কিন্তু আমি নিশ্চিত সেটি দুরূহ কোনো সমস্যা নয়। একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যদি স্বচ্ছন্দে সেটি করতে পারে তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটি কেন সমস্যা হবে? আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার এক বছরের জন্য নয়–চার বছরের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে এবং সেই একাডেমিক ক্যালেন্ডারটি কোনো রকম প্রশ্ন না করে মানা হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ ছুটি ভোগ করা হয় আমার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকবে তার চেয়ে অনেক কম কিন্তু দুটি সেমিস্টারের মাঝখানে যে বিরতিটুকু থাকবে সেটি সত্যিকার অর্থে ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্য সত্যিকার একটি ছুটি হবে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার সব পরীক্ষা দিয়ে, সেই পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ছুটিতে যাবে, এ ব্যাপারে কখনই কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুবিশাল লাইব্রেরির কথা কল্পনা করি। পৃথিবীর সকল সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য বই এই লাইব্রেরিতে থাকবে। দূর–দূরান্ত থেকে মানুষ আসবে শুধু এই লাইব্রেরিটিকে একনজর দেখার জন্য।

শুধু যে একটা বড়ো লাইব্রেরি থাকবে তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং গবেষকরা এই লাইব্রেরি পুরোপুরি ব্যবহার করবে। ছাত্রছাত্রীরা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা এই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্যন্ত অল্প কর্মকর্তা–কর্মচারী ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জীবনটুকু হচ্ছে তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। একজন ছাত্র এখানে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে। আমি মনে করি এই সময়টুকুতে তাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে শুরু করে নানা ধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার সময়। আমি স্বপ্ন দেখি আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে বিকশিত হওয়ার পুরোপুরি সুযোগ তৈরি করে দেবে। প্রতি সপ্তাহে

www.pathagar.com

ছাত্রছাত্রীরা কোনো না কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে–কোনো না কোনো সৃজনশীল কাজে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো অডিটরিয়াম তার ভেতরে থাকবে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাউন্ড সিস্টেম এবং লাইটিং। যে অডিটরিয়ামটি শুধু নাটক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয় এই এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বা সেমিনার সিম্পোজিয়ামে ব্যবহৃত হবে।

জাতিগতভাবে আমরা গবেষণার গুরুত্বটি সব সময় ধরতে পারি না দেশে যদি বড়ো একটি সমস্যা হয় ধরা যাক সন্ত্রাসের সমস্যা আমরা সেটি কীভাবে সমাধান করতে হয় জানি না, পত্রপত্রিকায় হাল্কা লেখালেখি হয় কিন্তু তার মূল অনুসন্ধান করা হয় না, সেটি নিয়ে গভীর কোনো গবেষণা হয় না। আমি স্বপ্ন দেখি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের গবেষণায় সম্পৃক্ত হবে। দেশের সকল সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য শর্টকার্ট পদ্ধতি বের না করে সেটি নিয়ে গবেষণা করবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে সেই গবেষণার কেন্দ্রভূমি। এখন পর্যন্ত আমরা প্রযুক্তি পাশ্চাত্য থেকে কিনে এনে ব্যবহার করি। নিজেরা কোনো প্রযুক্তি পড়ে তুলি না। আমি স্বপ্ন দেখি আমরা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগুলো গড়ে তুলতে শুরু করেছি–একজন তরুণ গবেষককে একবার গবেষণার আনন্দ পাইয়ে দিতে পারলে সে সারা জীবনের জন্য সেই গবেষণার মাঝে সম্পৃক্ত থাকবে।

আমি স্বপ্ন দেখি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবে। গবেষণায় একটা বড়ো অংশ আসবে এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে। শুধু গবেষণা নয় তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য জনবলও তারা পাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাই প্রতিবছর তাদেরকে ডেকে এনে এখানে ''uzj nir'' করা হবে যেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সম্ভাব্য চাকরিদাতাদের সঙ্গে পরিচয় করতে পারবে।

এই গবেষণা থেকে শুধু গবেষণাপত্র নয় পেটেন্ট তৈরি হবে এবং পেটেন্টের লাইসেন্স থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ধরনের আয় হতে শুরু করবে। আমি কল্পনা করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশনালয় থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপক কিংবা তরুণ গবেষকদের গবেষণা গ্রন্থ কিংবা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। একটি কনফারেন্সের উৎসাহে শত শত তরুণ বিজ্ঞানী বা গবেষকেরা নতুন গবেষণা শুরু করেন– এ ধরনের কনফারেন্স উপলক্ষে শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন গবেষণা কাজ শুরু হবে। বাইরে থেকে গবেষকরা এসে এখানকার গবেষকদের সঙ্গে একটা নতুন যোগসূত্র তৈরি করবেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত কনফারেন্স করার জন্য গণিত বিভাগ প্রশংসার দাবি রাখে। আমার বিশ্বাস অন্যান্য বিভাগগুলোও গণিত বিভাগের মতো কনফারেন্স আয়োজন করার **উৎসাহ** প্রদর্শন শুরু করতে পারে।

৪

আমি যে আধুনিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কল্পনা করি সেখানে প্রশাসনিক কাজ করার জন্য সর্বাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। পুরো প্রশাসনিক কাজকর্ম কম্পিউটারায়ন করা হবে এবং সেটি দায়সারা কম্পিউটারায়ন নয়। আমরা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্ক নিয়ে খানিকটা গর্ব করতে পারি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই নেটওয়ার্ক বাইরে ই–মেল পাঠানো কিংবা ইন্টারনেট ব্রাউজ করা ছাড়া আর কোথাও

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়নি। আমি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনা করতে চাই যেখানে অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কের সর্বোচ্চ ব্যবহার হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে। সকল ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেসে সংরক্ষিত থাকবে- যে কোনো তথ্য চোখের পলকে বের করে নিয়ে আসা যাবে। ফাইলের কাজ কমে আসবে। শুধু অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়গুলো সত্যিকার ফাইলে নোট দিয়ে উপস্থাপন করা হবে-বাকি শতকরা ৯০ ভাগ কাজ নেওয়ার্কের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রনিক ফাইল ব্যবহার করে কাজ সেরে নেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম হয়ে যাবে সহজ এবং ট্রান্সপারেন্টের ভেতরে স্বজনপ্রীতি বা কারো প্রতি বিদ্বেষ দেখানোর প্রক্রিয়াগুলো একেবারেই অতীতের ব্যাপার হয়ে যাবে। প্রায় দশ হাজার ছাত্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় হলেও তার প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানোর জন্য জনশক্তি লাগবে খুব কম; যারা থাকবেন তারা হবেন অনেক বেশি কর্মদক্ষ, সর্বশেষ প্রযুক্তিটি থাকবে তাদের পাশে।

একাডেমিক বিষয়গুলো দেখার জন্যও প্রশাসনিক কাজগুলো আরো অনেক বেশি সুসংহত করা হবে। স্কুলগুলোর যারা ডিন তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি থাকবে- একটি স্কুল বা ফ্যাকাল্টির সকল একাডেমিক দায়িত্ব পালন করবেন সেই ডিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মূল একাডেমিক ক্যালেন্ডার থাকবে কিন্তু তার বাইরে ডিন হবেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার নেতৃত্বে সেই ফ্যাকাল্টির সকল একাডেমিক কার্যক্রম চালানো হবে-পরীক্ষা থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত সবকিছু থাকবে ডিনের আওতাধীন। প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে আনা হবে-সবকিছু করা হবে অনেক দ্রুত।

আমাদের দেশের নানা পদ্ধতিতে আমরা বিভিন্ন মানুষকে অনেক দায়িত্ব দিই কিন্তু কোনো ক্ষমতা দিই না। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি সেখানে যে মানুষের দায়িত্ব যতো বেশি তার ক্ষমতাও হবে ততো বেশি। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের অধীন বিভাগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সত্যিকার অর্থে পুরো ব্যাপারটি বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। শুধু বড়ো বড়ো পরিকল্পনা এবং বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনের প্রয়োজন হবে কিন্তু বেশির ভাগ কাজ হবে তাদের কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ কিংবা হস্তক্ষেপ ছাড়া।

৫

আমরা যদি বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকাই তাহলে একটা আশঙ্কাজনক ছবি দেখতে পাই। সরকারের পদক্ষেপগুলো দেখলে মনে হয় তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর অর্থব্যয় করতে চান না। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আইএমএফের পরামর্শ বা অন্য কোনো কারণেই হোক না কেন- আমাদের দেশে শিক্ষাকে একটা পণ্য হিসেবে বিবেচনা করার জন্য সবদিক দিয়েই একটি চাপ আসছে। এই মুহূর্তে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ হয়ে আছে। অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং বলতে গেলে একেবারেই ফ্রি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনা করি যেটি এই দুই মেরুর মাঝামাঝি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারো থেকে তিরিশ টাকা টিউশন একটি হাস্যকর ব্যাপার- অনেক ক্ষেত্রে এই টিউশন তোলার প্রক্রিয়াটি টিউশন থেকে বেশি খরচ সাপেক্ষ। আমরা দেখেছি দেশের মধ্যবিত্ত এবং অনেক সময় নিম্নমধ্যবিত্ত অভিভাবকেরাও তাদের সন্তানের প্রাইভেট কিংবা কোচিং পড়ানোর জন্য একটা বড়ো অর্থ ব্যয় করেন। আমি নিশ্চিত

www.pathagar.com

তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও আরো বেশি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত। আমি এখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কল্পনা করি যেখানে অভিভাবকেরা তাদের সন্তানের জন্য একটি সম্মানজনক টিউশন ফি দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য একজন মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্র আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ করে। আমি মনে করি যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোনো রকম সেশনজট ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে ছাত্রছাত্রীদের পাস করে বের হয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে একজন অভিভাবক অত্যন্ত খুশি হয়ে মাসে এক হাজার টাকা টিউশন দিতে রাজি হবেন।

যদি একজন ছাত্রের কাছ থেকে মাসে এক হাজার টাকা টিউশন ফি নেওয়া হয় তাহলে দশ হাজার ছাত্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক আয় হবে এক কোটি টাকর মতো। একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষকের অনুপাত হওয়ার কথা ২০:১ এবং এই এক কোটি টাকা দিয়ে এই অনুপাতে শিক্ষক রেখে তাদের বেতন দেওয়া সম্ভব। আমি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের ব্যাপার ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে–সরকার বড়ো অবকাঠামোগুলো তৈরি করে দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়টি আর সরকারের মুখাপেক্ষী থাকবে না–তার নিজস্ব অর্থায়নেই সেটি চলতে থাকবে।

আমি কল্পনা করি একজন দরিদ্র ছাত্র যদি এই ফি দিতে নাও পারে তাহলেও সে যেন এখানে কোনো একটি কাজ খুঁজে পায়, যেই কাজ করে সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি এবং গবেষণাগারে ছাত্ররা সম্মানজনক কাজ করতে পারবে–অর্থাভাবে তাদের কারো যেন পড়ার ক্ষতি না হয়।

৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরা এই মুহূর্তে সামাজিকভাবে খানিকটা অসম্মানজনক অবস্থায় রয়েছি, তার বড়ো একটি কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট। দেশের সামগ্রিক অবস্থা এবং বাইরের রাজনৈতিক শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কারণ, ছাত্র রাজনীতি, ছাত্র অসন্তোষ এ ধরনের নানারকম কারণে সেশনজটগুলো জমা হওয়ার পরেও ইদানীং শিক্ষকদের এই দায়ভার নিতে হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি এর ভেতরে খানিকটা সত্যতা রয়েছে।

আমাদের খুব দুর্ভাগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার সময় ইদানীং যে বিষয়গুলো দেখা হয় সেই বিষয়গুলো আসলে একেবারেই দেখার কথা নয়। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সবার প্রথমে হওয়া উচিত একজন শিক্ষাবিদ যিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন পড়াশোনা আর গবেষণার মাঝে। একই সঙ্গে তাকে হতে হয় স্বাপ্নিক বা ভিশনারি যেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন। তাকে একজন দক্ষ প্রশাসনিক হতে হয় যেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে চালিয়ে নিতে পারেন। পৃথিবীর সব দেশে এই তিনটি গুণ থাকলেই হয় কিন্তু আমাদের দেশে আরো কিছু বাড়তি গুণ থাকতে হয়। তাকে হতে হয় সাহসী যেন রাজনীতির নোংরা ছোবল সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন কাজে কর্মে তাকে হতে হবে নিরপেক্ষ যেন দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে তিনি বুক আগলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রী শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের রক্ষা করতে পারেন।

www.pathagar.com

আমাদের খুব দুর্ভাগ্য আমাদের দেশে ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার জন্য এসব কোনো গুণাবলীর প্রয়োজন হয় না– কারণ ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব এখন মহান শিক্ষাব্রতীর দায়িত্ব নয়; এখন সেই দায়িত্ব হচ্ছে রাজনৈতিক সংগঠকের দায়িত্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনা করতে হয় একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের মতো। তাকে তার ক্ষমতা সুসংহত করতে এবং নিজের দলের মানুষকে পুনর্বাসন করে অন্য দলের মানুষদের নিপীড়ন করে ঘরছাড়া করে দিতে হয়।

আজকালকার ভাইস চ্যান্সেলররা আক্ষরিক অর্থে শুদ্ধি অভিযান চালান এবং সেখান থেকে সংঘাত শুরু হয়। যারা সাধারণ শিক্ষক বা নিরীহ কর্মচারী ছিলেন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর তারাও হঠাৎ করে বিদ্রোহী হতে শুরু করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ হঠাৎ করে বিষাক্ত হয়ে যায়।

কাজেই আমি সব সময় স্বপ্নে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সত্যিকারের শিক্ষাবিদকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া না হলে অন্য সবকিছু পুরোপুরি ঠিক থাকলেও একটা বিশ্ববিদ্যালয় কখনই সত্যিকারভাবে অগ্রসর হতে পারবে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান : আমাদের করণীয়

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্পর্কে আমি তেমন একটা অবহিত নই। তবে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। অনেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। বর্তমান দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালনকালে এ সকল মেডিকেল কলেজের অবস্থা দেখে আমি হতাশ হয়েছি, আমার কাছে মনে হয়েছে বেশকিছু মেডিকেল কলেজে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে। হাসপাতাল ছাড়া কি মেডিকেল কলেজ হতে পারে? আর হাসপাতালে হাতে-কলমে চিকিৎসার প্রশিক্ষণ ছাড়া কি ডাক্তার হওয়া যায়?

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রায় সব ঢাকাতে অবস্থিত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশ দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করেছে। এটি সার্বিক বিবেচনায় দেশের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ ও শিক্ষার মান নিয়েও আলোচনার সমালোচনার অন্ত নেই। এ কথা ঠিক যে কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষার মান সন্তোষজনক হলেও, আবার কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল মোটেও ভাল নয়। তরুণ শিক্ষকের অভাব না হলেও, প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও পূর্ণকালীন শিক্ষকের অভাব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এক বড় সমস্যা। তাছাড়া মনোরম পরিবেশে স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার শর্ত আমার জানা মতে মাত্র দু'চারটি ব্যতীত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই পূরণ করতে পারেনি। কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শর্টকাট' পদ্ধতিতে ডিগ্রী প্রদানের কথাও শুনা যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ আমরা কতটুকু করতে পেরেছি? তাছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (এমনকি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও) দেশের সংখ্যাগিরষ্ঠ অধস্তন শ্রেণীর শিক্ষালাভের সুযোগ কি অত্যন্ত সীমিত নয়? গাঁয়ের ঐ যে রাখাল বালক তারও ত' মেধা কম ছিল না। কিন্তু আমরা এমন এক সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাস করি যেখানে সে তরুণ স্কুল-কলেজের দ্বার পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারেনি। আমাদের মত শ্রেণী বিভক্ত সমাজে গরীব মেধাবী তরুণদের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে। সর্বোপরি আমাদের উচ্চশিক্ষা যদি শিক্ষার্থীকে দেশের মাটি ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, আর তার অর্জিত জ্ঞান দেশের জনমানুষের তথা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়, তাহলে সে শিক্ষা আমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়। এসব কারণেই বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত।

www.pathagar.com

তবে এতে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি মনে করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ সকল সমস্যা অতিক্রম করা সম্ভব :

প্রথমত, উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে আমাদেরকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজি শিক্ষা চালু করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশি ভাষা শিখতে (গ্রহণ করতে) পারে। তাই আমি মনে করি, প্রাথমিক শিক্ষার এই পর্যায় থেকে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান শুরু করলে এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষার পঠন-পাঠন ও চর্চা অব্যাহত রাখলে (বৃদ্ধি পেলে) ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি ভাষা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। অতএব, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ সহজতর হবে। পাশাপাশি আমাদেরকে ইংরেজি পাঠ্যবই ও সহায়ক গ্রন্থের অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় বই রচনায় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, উচ্চ শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার আছে, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসী রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, জাতীয় বা ছাত্র রাজনীতি কোনোভাবেই শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করবে না। ছাত্ররা এমন কোনো সহিংস এবং হীন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে না যা শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট ও কলুষিত করে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, তারা হীন রাজনৈতিক স্বার্থে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার করবে না। যখন-তখন রাজনৈতিক কর্মসূচী দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে অচল করে দেবে না। তাহলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসমুক্ত হবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম "অতিরিক্ত-অব্যাহত" রাখতে পারলে সেশনজট দূরীভূত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে তথা জাতীয় স্বার্থে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে সেশনজট দূর করতে হবে।

চতুর্থত, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে মেধাই হবে উচ্চশিক্ষা লাভের মূল শর্ত। কোটা সিস্টেম বা অন্য কোন কারণে যোগ্যতা শিথিল করা যাবে না। তবে মেধাবী অথচ গরীব শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

পঞ্চমত, শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যোগ্যতাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাদের একাডেমিক অর্জন, গবেষণাকর্ম, নিরলস চর্চা ও একাগ্রতার মূল্যায়ন করতে হবে। এর সাথে উচ্চশিক্ষার মান প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। শিক্ষকতার মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই গবেষণাকর্মে যুক্ত থাকতে হবে। শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অবশ্যই নিয়মিতভাবে গবেষণা কাজে লিপ্ত থাকতে হবে। কারণ গবেষণা ব্যতীত নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ষষ্ঠত, আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরিগুলোকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও সমৃদ্ধ করতে হবে।

সপ্তমত, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যসূচি (শিক্ষাক্রম) হবে আধুনিক, আন্তর্জাতিক ও সমকালীন। একদিকে যেমন দেশের ও জাতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা

www.pathagar.com

দরকার, অন্যদিকে আধুনিক, আন্তর্জাতিক–বিশ্বজনীন পাঠ্যসূচি বা শিক্ষাক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে সিলেবাস তৈরি করতে হবে। শিক্ষাক্রম এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান মানুষ ও সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়।

পাঠ্যসূচী হতে হবে এমন যেন তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে পারে, মাটি ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারে এবং শিক্ষার্থীকে সৎ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিক হলে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারে ও এর মান উন্নয়নে রয়েছে এক অমিত সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে আমাদের উল্লিখিত সুপারিশ মালা বিবেচনা করা যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত আমরা উচ্চশিক্ষার সুনির্দিষ্ট মান অর্জন করতে না পারি ততদিন দেশের সরকার এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সামর্থ্য ও সম্পদের সরবরাহ রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। আমি আশা করি, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রমের গতিবেগ সৃষ্টি করে এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধনা এবং জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার উচ্চমান অর্জন করতে সক্ষম হবো।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতার পর থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মানের ক্রমশ অবনতি হয়েছে। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রধান মাধ্যম হল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর সাধারণত একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে চার বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও কোন কোন পাবলিক বিশ্বদ্যিালয়ে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ কলেজগুলোতে ৩ বছরের ডিগ্রি পাস কোর্স, চার বছরের অনার্স কোর্স এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৮০০ কলেজে, ৩২টি সরকারি (পাবলিক) বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫৪টি বেসরকারি (প্রাইভেট) বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এই সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূলত আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং গ্রাজুয়েট কোর্স পড়ানো হয়। তবে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। আমাদের উচ্চশিক্ষার মান ও ভূমিকা নিয়ে আলাপ–আলোচনা ও প্রশ্ন মূলত এইসব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

আধুনিক বিশ্বে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞানের জগতে বহু নতুন জ্ঞানের সংযোজন হয়েছে; সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার। উন্নত দেশে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসারের কারণে জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও এর ঢেউ লেগেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষতা, উঁচু মান এবং অধুনা সৃষ্ট জ্ঞান–বিজ্ঞান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না। এ যুগ বিশ্বায়নের যুগ। সমগ্র বিশ্বকে একটি বৃহৎ পল্লীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব, এ বৃহৎ পল্লীর এক অঞ্চলের উন্নয়নের প্রভাব অন্য অঞ্চলে পড়তে বাধ্য। তাছাড়া জ্ঞানের জগতে কোন সীমারেখা নেই। জ্ঞান প্রবাহমান, এক থেকে বহুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, যদি না কেউ জ্ঞানবিমুখ হয়। আমাদের দেশে সীমিত আকারে উচ্চশিক্ষার প্রচলন বহুকাল আগেই শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়,তারপর থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পৃথিবীর এ অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি কলেজ ছিল, যেখানে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হতো। এই সীমিত সুযোগ গ্রহণ করেছিল এই অঞ্চলের এক উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমানেরা ছিল পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর। এর কারণ ছিল ঐতিহাসিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা এবং উচ্চশিক্ষার অত্যন্ত সীমিত সুযোগ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গের কারণে এ অঞ্চলের মুসলমানদেরও মধ্যে নতুন আশা-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে প্রভাবশালী হিন্দুদের বাধার মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এতে এ অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ হল উচ্চশিক্ষার অভাব। তাই উচ্চশিক্ষার প্রসারকল্পে তারা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। স্যার নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, এ . কে. ফজলুল হক প্রমুখ নেতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এই পটভূমিতে ১৯২১ সালে ঢাকা শহরের রমনার মনোরম পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই বছরের জুলাই মাস থেকে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে এ দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। ১৯৭০ সাল নাগাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠিত হয় একমাত্র কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই সময়ের মধ্যে প্রায় প্রতিটি জেলায় ১টি করে সরকারি কলেজ ও বেশ কিছু বেসরকারি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজগুলি ছিল মূলত ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। গত শতাব্দীর '৩০ থেকে '৬০-এর দশকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীর সমাগম ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় তার মানসম্মত শিক্ষার ও গবেষণাকর্মের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। বহু গুণী শিক্ষক এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কর্মের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এইচ টার্নার, জিএইচ ল্যাংগালী, হরিদাস ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন প্রখ্যাত গবেষক ও বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস। আইস্টাইন তত্ত্বের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হন এবং এর সাথে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম। এছাড়াও পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন আরও অনেক কৃতী শিক্ষক। এদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস. কৃষ্ণা, জ্ঞানচন্দ বোস, মোকাররম হোসেন খন্দকার, কাজী মোতাহার হোসেন, আহমদ হাসান দানী প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশকিছু পিএইচডি ও ডিএসসি ডিগ্রি সম্পন্ন করা হয় এ সময়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনেক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। বলা বাহুল্য, এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে ছিল ইংরেজি। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গ্রন্থাগারগুলো ছিল ইংরেজি বইতে সমৃদ্ধ। জ্ঞানচর্চার এক উন্নত পরিবেশ বিরাজ করছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে। সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করা যেত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমানের শিক্ষার প্রভাব প্রতিফলিত হয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যন্ত এদেশের শিক্ষার মান ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার এই মান আমরা ধরে রাখতে পারিনি; পারেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পর ইংরেজিসহ বাংলা ভাষাকেও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ কথা সত্য যে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করা ছিল তখনকার সময়ের দাবি। তাই এ ধরনের জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এর একটি নেতিবাচক প্রভাবও জ্ঞান

www.pathagar.com

আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে শিক্ষার মান ক্রমশ অবনতিশীল হয়। নানা কারণে গত ৩০/৪০ বছর যাবৎ এদেশের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিম্নমুখী। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সকল স্তরে শিক্ষার মানের অবনতি হয়েছে যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই উচ্চশিক্ষার স্তরেও। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সকল স্তর একই সূত্রে গাঁথা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, '৬০-এর দশক পর্যন্ত আমরা এদেশে উচ্চশিক্ষার যে মান অর্জন করেছিলাম, স্বাধীনতা উত্তরকালে সে মানের শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছি। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার অবহেলার কারণে এই সময়ে আমরা আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নিদারুণ নিম্নমান ডেকে এনেছি।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মানের অবনতির ফলে উচ্চশিক্ষার স্তরে প্রবেশ করেছে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার জ্ঞানের অভাব শিক্ষার মানকে নিম্নমুখী করেছে। স্বাধীনতার পর যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এসেছে তাদের ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান খুব কম। কিন্তু উচ্চশিক্ষার প্রায় সকল গ্রন্থ (পাঠ্য ও সহযোগী বই), জার্নাল, দলিল-দস্তবেজ ইংরেজিতে লেখা। অথচ শিক্ষার্থীরা (ছাত্র-ছাত্রীরা) ইংরেজি ভাষা জ্ঞানের অভাবে এই সকল বই পড়ে আত্মস্থ করতে পারে না। জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ায় এইভাবে বাধা পড়ে। এর ফলে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান সঞ্চারণের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। এই বাধা অতিক্রম করা যেত যদি বাংলা ভাষায় প্রচুর সংখ্যা পাঠ্য ও সহায়ক গ্রন্থ রচিত হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এ কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছি। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গ্রন্থ আমরা বাংলায় রচনা করতে পারিনি এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদও করতে পারিনি। ফলে জ্ঞান আদান-প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ আজও সৃষ্টি হয়নি। এছাড়াও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অস্থিরতা ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘ সময় বন্ধ রাখা হয়েছে। সন্ত্রাস, হরতাল ও ধর্মঘটের কারণে নির্ধারিত ছুটির চেয়ে অনির্ধারিত ছুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নিদারুণ সেশনজটের। অবশ্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপাতত এ সমস্যা থেকে মুক্ত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নমানের শিক্ষক নিয়োগ সৃষ্টি করেছে নতুন সঙ্কট। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার অপরিকল্পিত প্রসারও সৃষ্টি করেছে নতুন সমস্যার।

নব্বই-এর দশক থেকে উচ্চশিক্ষার প্রসারকল্পে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এর নিশ্চয়ই একটি ইতিবাচক দিক আছে। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য কারিগরি, কৃষি এবং মেডিকেল শিক্ষার প্রসার অতীব জরুরি। কিন্তু কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। উন্নতমানের কারিগর ও কৃষিবিদ তৈরি করতে হলে যে উন্নতমানের গবেষণাগার, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল দরকার তা বলাই বাহুল্য। একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একজন কৃতী শিক্ষক ও গবেষক আমাকে বলেছিলেন যে, সে বিভাগের ল্যাবরেটরী কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের পুরানো। তাই যদি অবস্থা হয়, তাহলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়-সে কারিগরি কিংবা কৃষি কিংবা সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যাই হোক না কেন-তাদের ল্যাবরেটরির কি হাল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। উপযুক্ত ও মানসম্মত প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বিকাশ

রংগলাল সেন

শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা শিশু ও যুবকের সমাজে পূর্ণ সদস্য হবার উপযোগী নৈতিক, দৈহিক এবং তাদের বুদ্ধি ও আবেগের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা শুধু মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশই ঘটায় না; তা সামাজিক উন্নতির হাতিয়ার হিসেবেও ক্রিয়াশীল। ইংরেজি 'Education' শব্দটি ল্যাটিন 'Educare' থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং যার অর্থ হচ্ছে শিশুর প্রতিপালন (to rear Children)। শিক্ষা কথাটি শিশুদের বিকাশের বেলায়ই অধিকতর প্রযোজ্য। সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় কিংবা নির্দেশক ধারণা হচ্ছে সামাজিক কাঠামো (Social Structure), যার অন্যতম আবশ্যিক উপাদান হল শিক্ষা তথা সামাজিকীকরণের এক বিশেষ উপায়। মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিক্ষা হচ্ছে সমাজের মৌল কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সেদিক থেকে শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া, তা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি বাহনও বটে। শেষোক্ত অর্থে কোনো মানবসমাজই শিক্ষাব্যবস্থাবর্জিত নয়। তবে সমাজকাঠামো যেমন সর্বত্র একরূপ নয়, তেমনি শিক্ষাব্যবস্থাও সব ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়। বস্তুত, মানবসমাজে শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ সমাজ প্রগতির বিভিন্ন ধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে মানবসমাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব এক তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

মানবসমাজ যখন আদিম সাম্যবাদী স্তরে অবস্থান করেছিল তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা ঘটে নি। মানব সভ্যতায় প্রথম শ্রেণীবিভক্ত দাস-সমাজেই আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। দাসত্ব প্রথাভিত্তিক প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সমাজ ব্যবস্থায় যখন এক শ্রেণীর মানুষ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রচুর অবসর পেল তখনই এ সবের আবির্ভাব ঘটে। খ্রিস্টের জন্মের তিন-চার শত বৎসর পূর্বে গ্রীসে সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বিকাশ ঘটে তা এঁদের প্রতিষ্ঠিত একাডেমীতেই সম্ভব হয়। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহ্য অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজের সকলের অধিকার স্বীকৃত ছিল না। শুধু উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই শিক্ষার অধিকার ভোগ করত। দাসত্ব প্রথার অভ্যন্তরে দ্বান্দ্বিক নিয়মে সামন্তবাদের জন্ম হয়। সামন্ত সমাজে খ্রিষ্টধর্মের ঐতিহ্য অনুসারে ঈশ্বরের চোখে সমাজের ছোটবড় সকলই সমান-একথা স্বীকৃত হলেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে যা হোক, সামন্তবাদের অভ্যন্তরে যখন ধনতন্ত্রের বীজ উপ্ত হলো তখন এক শ্রেণীর বিত্তবান ব্যবসায়ীর বিকাশ ঘটে। এরা ভূমিভিত্তিক অভিজাত ও ধর্মভিত্তিক যাজক

www.pathagar.com

শ্রেণীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। উপরোক্ত শ্রেণীর বিকাশের আগে সামন্তবাদী সমাজের কর্তৃত্ব ভূমির মালিক ও যাজকদের হাতে ন্যস্ত ছিল। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের (University) বিকাশ এই পটভূমিতেই ঘটে।

মূলত 'University' শব্দের অর্থ সম্প্রদায় (Community) অথবা 'Corporation'। শিক্ষাক্ষেত্রে যখন এ শব্দটি প্রচলিত হয় তখনই তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইংরেজি 'University' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'বিশ্ববিদ্যালয়' খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। কেননা 'If University is not Universal, it is not a University.' বিশ্ববিদ্যালয় একটি সর্বজনীন ও সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতামুক্ত সামাজিক শিক্ষামূলক সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয় একটি উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠার পূর্বে ইউরোপে 'Studium generale' নামে এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। 'University' হচ্ছে রোমান 'Collegium' এর মতো, যার অর্থ হচ্ছে 'a group or association of persons.' আর 'Studium generale' হল একটি অভিন্ন সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্র যেখানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ছাত্র ও শিক্ষকরা এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। ইউরোপে চতুর্দশ শতকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আইনানুগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় (University) সাধারণ শিক্ষা কেন্দ্রের (Studium generale) স্থলাভিষিক্ত হয়। ইউরোপে Reformation Movement -এর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাজকশ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু সংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপীয় সমাজে ইহজাগতিক মূল্যবোধ প্রাধান্য পায়, এবং ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত তারাই সামাজিক কর্তৃত্ব লাভ করে। তখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের মধ্যযুগে সামন্তবাদী সমাজে যে কয়টি উচ্চস্তরের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেসবের মধ্যে সম্ভবত নবম শতকের 'Salerno' বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রাচীন। বস্তুত, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টির পাঠ্যসূচিতে মেডিসিনই প্রধানত অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটিকে আধুনিক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় না বলে মেডিকেল স্কুল বলাই বাঞ্ছনীয়। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইটালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের পাঠ্যসূচি অব্যাহত থাকে। ইউরোপের ইটালি ছাড়া অন্যান্য দেশেও গোড়ার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি মেডিসিন, ধর্মতত্ত্ব ও আইন–জ্ঞানের এই তিনটি শাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মোটামুটি উচ্চশিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে দ্বাদশ শতকের প্রথম দশকে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিমূলে ছিল আইনচর্চা। অর্থাৎ আইনের স্কুল থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ ঘটে। ঐ স্কুলটি William of Champeaux-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর Abelard প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। শুরুতে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অনুষদ ছিল, যথা–ধর্মতত্ত্ব, আইন, মেডিসিন ও কলা; অনুষদ প্রধানকে ডীন বলা হত। ডীন শব্দটি মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রচলিত হয়। ফ্যাকাল্টি মানে জ্ঞানের একটি শাখা বা আর্ট। পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ফ্যাকাল্টি প্রধান ডীন নামে অভিহিত। তখন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তথা এর অনুষদগুলোর নিয়ন্ত্রণ 'Oligarchy of teachers' এর হাতে ন্যস্ত ছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চল্লিশটি কলেজ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সমগ্র ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। দ্বাদশ–ত্রয়োদশ শতকে ফ্রান্সের পরে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্কুল থেকে উদ্ভূত হয়। তবে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

www.pathagar.com

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ একটু ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান। কেননা এগুলো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়; এদের অধীন হলগুলি কলেজের অনুরূপ এবং সকল অঙ্গ সংগঠন স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। মধ্যযুগে বিখশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হওয়া অনেকটা গিল্ড কিংবা আধুনিক কালের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হবার মতো ব্যাপার। চতুর্দশ শতকে ইউরোপে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। জন ক্যালভিন ও মার্টিন লুথার কিং প্রবর্তিত ইহজাগতিক মূল্যবোধ জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ওয়েবারের মতো যেমন পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করেছে, তেমনি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও সেটি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের, বিশেষ করে, ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো Estate System এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রফেসররা তাঁদের পদমর্যাদার বদৌলতে অনেকটা বংশানুক্রমিক ধরনের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। ঐ সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথম যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চরিত্র কিছুটা পরিবর্তিত হয়।

১৭৮৯ সালে অনুষ্ঠিত ফরাসি বিপ্লব শুধু ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসেই রূপান্তর ঘটল না, এটা ঐ সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করল। সামগ্রিকভাবে ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ফরাসি বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল। প্রকৃতপক্ষে, ফরাসি বিপ্লবের ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষে আধুনিক 'Civic University'-র সূত্রপাত ঘটে। এ কথার তাৎপর্য হল এই যে, ফরাসি বিপ্লব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে ইহজাগতিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) রূপ দান করল। ফ্রান্সে ১৭৯৩ সালে বিপ্লবী কনভেনশনের এক ডিক্রি জারির মাধ্যমে আগের যুগের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো বিলুপ্ত হয়। ১৮০৮ সালে নেপোলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক রূপ ঘোষণা করেন। ঐ সময় থেকে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণভাবে যাজকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। 'University Government'-এ চার্চের আধিপত্য আর রইল না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ধর্মতত্ত্ব একটি আলাদা বিষয় হিসেবে বিদ্যমান থাকল। তাই আধুনিক কালের ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা হিসেবে ফরাসি বিপ্লবকে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন কারণে ইংল্যান্ডে উনিশ শতকের আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দিকে ইউরোপের জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ধারা সুস্পষ্টভাবে বিকাশ লাভ করে। বস্তুত, বিভিন্ন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত। আর জার্মানি ও আমেরিকায় ফেডারেল ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো বিদ্যমান। বিশ্বের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের সাংগঠনিক কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত নীতিমালা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্যাটার্ন অনুকরণ করে। যেমন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইংল্যান্ডের 'Civic University'-এর প্যাটার্ন অনুসরণ করেছে।

এখানে ব্রিটিশ শাসনামলে কীভাবে ভারতে তথা বর্তমান বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। তার আগে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পর ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় ধরনের শিক্ষার উপাদান লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

বর্ণাশ্রমভিত্তিক ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ জাতিবর্ণের লোকেরা ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করত। আর ক্ষত্রিয়রা সামরিক ও প্রশাসনিক বিজ্ঞান পাঠ করত। শিক্ষকরা প্রায় সকলই ছিলেন ব্রাহ্মণ। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের এই একচেটিয়া অধিকার কিছুটা ক্ষুণ্ন হয় বৌদ্ধ যুগে। বুদ্ধ নিজে ক্ষত্রিয় সন্তান হলেও তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের জাতিবর্ণের লোকেরাই বেশি গ্রহণ করে। শহরের শ্রমিক-শিল্পী ও ব্যবসায়ী এবং গ্রামের কৃষকরাই জাতিবর্ণবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেজন্য বৌদ্ধ রাজাদের আমলে জনগণের কথ্য ভাষার বিকাশ সাধিত হয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার শ্রীবৃদ্ধি সাধন এ কথার যৌক্তিকতা নিরূপণ করে। বৌদ্ধবিহারগুলো বস্তুত শিক্ষাকেন্দ্র, এগুলোকে সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা যেতে পারে। বৌদ্ধধর্ম অন্তত গোড়ার দিকে জাতিবর্ণবিরোধী বিধায় হিন্দু সমাজের সকল জাতিবর্ণ থেকে সন্ন্যাসী বা শ্রমণ সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য যে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এক ধরনের ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তথা শিল্প-ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। এই পটভূমিতেই ভারতের বর্তমান বিহার রাজ্যে বৌদ্ধ শাসনামলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কথিত আছে, সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে আগত দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করত, আর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল পনের শত। তবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউরোপের মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে। বুদ্ধোত্তর ভারতে রাজধানী শহরগুলোতে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীর বাদশাহরা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। তারা আরবিকে ক্লাসিকেল শিক্ষার মাধ্যম ও পারসিকে রাজদরবারের ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করেন। ভারতের প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর মতে ফিরোজ তোগলকের ভারতীয় সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। এরই প্রেক্ষিতে ফিরোজ তোগলক 'কারখানা' প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে ভারতে আধুনিক ট্যাকনিক্যাল স্কুলের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। মোগল সম্রাট আকবর মাদ্রাসায় গণিত, জ্যামিতি, অর্থনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শন পাঠের প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগের ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী ও কৃষক জনগোষ্ঠীর কাছে উন্মুক্ত হল। তবে ভদ্রলোকেরা (Elite) জনসাধারণ থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার স্বার্থে সংস্কৃতি (Culture) ও রাজদরবারে চাকরির জন্য পারসি শিক্ষা করে। ব্রাহ্মণ জাতি-বর্ণভুক্ত রামমোহনের পরিবার এর ক্ল্যাসিক Example. পাশ্চাত্যের মতো কৃৎকৌশলের বিকাশ না ঘটায় ভারতের এক বিশেষ সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে পাশ্চাত্য ধরনের দাসত্বপ্রথা ও সামন্তবাদের বিকাশ সম্ভব হয় নি, আর এর ফলে পশ্চিমী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাথে ভারতের দেশীয় দুর্বল বণিকশ্রেণী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হল। সেজন্য এরা ভারতে প্রাক-ব্রিটিশ যুগে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রবর্তন করতে সমর্থ হয় নি। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যেকটি দেশে বর্তমানে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে ব্রিটিশ শাসনামলেই তার সূত্রপাত ঘটে। ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সুসংহত করার সাথে সাথে ভারতে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি মজবুত করতে ব্রতী হয়। আর এজন্য তারা ভারতে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে উদ্যোগী হয়। তবে ভারতে বৃটিশ শাসকবর্গের ভেতর শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন সম্পর্কে ঐকমত্য ছিল না। ভারতের শিক্ষানুরাগী ব্রিটিশ এলিটবর্গ বস্তুত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। Anglicist বা ভারতীয় সমাজে একটি নতুন শিক্ষিত এলিটগোষ্ঠী সৃজনের স্বার্থে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পাঠের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। আর oriental-

www.pathagar.com

ist রা ভারতীয়দের সনাতন শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন না করে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎসাহ প্রদানের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। অবশেষে উক্ত এলিট দ্বন্দ্ব পূর্বোক্তদের পক্ষে মীমাংসিত হয়। "The rivival and improvement of literature and encouragement for the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India." এর জন্য ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বার্ষিক দশ হাজার স্টার্লিং পাউন্ড ব্যয় করার অনুমতিদানের জন্য আবেদন জানায়। আর তার সূত্র ধরে টমাস মেকলে ১৯৩৫ সালে একটি বিখ্যাত Education Minute রচনা করেন, যেখানে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য হাজির করা হয়। তখনকার গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে, একটি আইন জারি করেন। এতে বলা হয়; "That the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and Science among the natives of India, and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education." ১৮৫৪ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে স্যার চার্লস উড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে গভর্নর জেনারেলের কাছে একটি Education Despatch পাঠান, যার সুপারিশ অনুসারে '১৮৫৭–'৫৮ শিক্ষাবর্ষে ভারতের তিনটি প্রধান Presidential Capital যথা–কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে বিলাতের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে তিনটি 'Civic University' প্রতিষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯০১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষা বাংলায় উচ্চশিক্ষাদানের জন্য শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। এর ঠিক দুই দশক পরে ১৯২১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে বিলেতের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। মোটামুটি এই হল বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

www.pathagar.com

বৈধ-অবৈধ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : অন্বেষা-অন্বয়

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

সম্প্রতি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) নিজস্ব অর্থ খরচ করে পত্রপত্রিকায় অবৈধভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে দেশী-বিদেশী ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা তাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রের একটি দীর্ঘ তালিকা ও ঠিকানা রয়েছে। এর বেশির ভাগের বাহারি নাম। এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা, প্রশাখা হিসেবে এখানে গত কয়েক বছর ধরে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত ও সম্প্রসারিত করে চলেছিল। ভাবতেই অবাক হতে হয়, একটি দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড লাগিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান কীভাবে ছাত্র ভর্তি করাচ্ছিল, এখন আবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতো এতো বড়ো মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেশবাসীকে জানাচ্ছে যে, ঐ সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকেই অবৈধভাবে স্থাপিত এবং পরিচালিত হচ্ছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এবং সংশোধিত আইন ১৯৯৮ থাকার পরও কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৫৬টি দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে গড়ে তোলা সম্ভব হলো- এই কথাটি যদি কোনো সভ্য দেশের নাগরিক শোনে তাহলে তারা এটিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বলেই সন্দেহ করবে, এ দেশে সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা, আইন-কানুন বলে কিছু আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলবে, সন্দেহ পোষণ করবে। অথচ প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের অতন্দ্র প্রহরী বলে দাবি করছি, বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি রক্ষা ও প্রচারে বেশ তৎপর থাকতে দেখি।

যেসব প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা প্রকাশিত হয়েছে তাদের বেশির ভাগই ঢাকার অভিজাত এলাকায়, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরের নামও তাতে রয়েছে। এ সব শহরে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে অভিযুক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করাচ্ছিল, পাঠদানও করাচ্ছিল। এ দেশের ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,সরকারের আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থা-এতোদিন মনে হয় কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুচ্ছিল, এখন তাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর দেখতে পেলো এই ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকাতে নানা বাহারি নামের সাইনবোর্ড ঝুলছে, সেখান থেকে ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আবিষ্কার করা গেলো- যাদের কোনো অনুমোদন নেই, সরকারি অনুমোদনের খাতায় এদের কোনো নাম নেই। অথচ প্রচারমাধ্যমে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যথেষ্ট বলা হচ্ছিল, লেখালেখি হচ্ছিল। যেহেতু ইউজিসি

www.pathagar.com

এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এতোদিন টু শব্দটি করা হয়নি, তাই দেশের বেশির ভাগ মানুষ মনে করেছিল যে, যে নামে যারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বসেছে তাদের নিশ্চয়ই সরকারি কোনো অনুমোদন আছে। এমনিতে সবাই জানতেন দেশে রাতারাতি ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং এতোগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড়ে কোনটার অনুমোদন আছে, কোনটার নেই–তা এ দেশের 'পবলিক' জানবে কী করে? মানুষ এতোদিন দেখছিল, এ দেশে যত্রতত্র কেজি স্কুল খোলা হচ্ছে, এটি খুলতে সরকারের কোনো অনুমোদন নিতে হয় কীনা তাও কেউ জানে না, একইভাবে নানা নামের কোচিং সেন্টার খোলা, পরিচালনা, প্রচার–প্রচারণার বিষয়টি যেভাবে অবাধে চলে আসছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বোধহয় একইভাবে হচ্ছে বা চলছে, অনেকের পক্ষেই অন্য কিছু ভাবা বা চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া 'মুক্তবাজার' অর্থনীতির দেশে সবকিছু উন্মুক্তভাবে চলবে, সেখানে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নিয়ম–কানুনের বালাই আছে বা থাকতে হয় তেমনটি এ দেশের উঠতি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং সার্টিফিকেট পিপাসু মানুষরা জানবে, বুঝবে বা শিখবে কোত্থেকে, কার কাছ থেকে? তাছাড়া এ দেশের মানুষের জানা ও বিশ্বাসের জগতে এখনো অন্যের বলা কথা, শোনা কথাই সবচাইতে নির্ভরযোগ্য, সরকারি আইনকানুন, বিধি–বিধান, দলিলপত্রের বিষয়টি খুবই গৌণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর থেকে মুক্ত নন আমাদের উঠতে মধ্য ও উচ্চবিত্তের মানুষরাও, এমনকি তথাকথিত শিক্ষিতরাও। এ ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছে। তাদের মধ্যে যাদের ছেলেমেয়েরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, কিংবা সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাদের কমবেশি অনীহা, তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বড়ো অংশকেই ঐ সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছে। তাদের ধারণা, একটি গ্র্যাজুয়েট সনদ হলেই তাদের যার যা মনোবাঞ্ছা আছে তা অনায়াসে পূরণ হয়ে যাবে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের উচ্চতর শাখায় প্রবেশ করা, গবেষণায় যুক্ত হওয়া, দক্ষ, আধুনিক মানুষে পরিণত হওয়ার মতো বিষয়গুলো অর্জিত হলো কী হলো না এটি আমাদের এই উঠতি শ্রেণীটি এখনো বুঝতে চায় না, বিবেচনায় খুব একটা নেয় না। প্রকৃত শিক্ষার মর্ম বোঝার ঘাটতির এমন পর্যায়ে আছে বলেই দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে না হতে এমন হুমড়ি খেয়ে সবাই পড়তে লাগলো। তথাকথিত বাঁধভাঙা চাহিদা তৈরি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নানা নামে দেশী–বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাতারাতি এখানে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করলো, যোগান দিতে আসলে যা কল্পনা করাই অসম্ভব ব্যাপার। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঐ সব প্রতিষ্ঠান ঢাকার আনাচে–কানাচে ছড়িয়ে গেলে, দেশের বিভিন্ন শহরে শাখা অফিস খুলতে শুরু করলো, ডিগ্রি সহজে দেওয়া ও পাওয়ার যতো ধরনের উপায় আছে তার ব্যবস্থা করতে লাগলো, এমনকি দূরশিক্ষণ, বিএড ইত্যাদি কোর্সও তারা হাতছাড়া করেনি। দেশের উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলেও ছাত্রছাত্রীদের প্রলুব্ধ করার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল, খরচের পরিমাণও মোবাইল কোম্পানিগুলোর মতো প্রতিযোগিতা দিয়ে কমিয়ে দিচ্ছিল। আসলে যেখানে ক্যাম্পাস থাকতে হয় না, বিল্ডিং থাকতে হয় না, যেখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক ছিল না, সেখানে ভাড়া বাড়ি এবং সদ্য পাস করা কয়েকজন তরুণ–তরুণীকে কম বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া গেলে, আবার এসব কিছুই যদি কেউ পরিবীক্ষণ করার না থাকে–তাহলে এ দেশে সবই করা সম্ভব, একজন আলু–তরকারির ফড়িয়ার পক্ষেও 'বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়' নামা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়, সমস্যাও নয়। বাস্তবে ঘটেছেও

www.pathagar.com

তেমন সব কিছু। বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব একটা পড়েনি, কিন্তু 'বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়' যুক্ত হয়েছেন এমন, তথ্যও অবিশ্বাস্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ এবং চেয়ার নিয়ে মালিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মারামারির খবরও পত্রপত্রিকায় ছবিসহ ছাপা হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর দুর্বলতার কারণে। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে ক্যাম্পাস, জায়গা, ভবন, ল্যাব, স্থায়ী শিক্ষক ছাড়া ভাড়া বাড়িতে, কম পুঁজিতে, পার্ট-টাইম শিক্ষক দিয়ে, শুধু বাজারে চাহিদা আছে এমন গোটা ৩/৪টি বিষয় নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যায়- এ ধরনের দুর্বল নিয়ম-কানুন দিয়ে এতো বড়ো একটি ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হলে তা যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং ঘুষ-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত শক্তির হাতে চলে যাবে- তা এ দেশের রাজনৈতিক সরকার, শিক্ষা-সংস্কৃতির মানুষরাও বুঝতে চায়নি। তারপরও ২০০১ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েনি। কিন্তু বিগত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও 'মহাবিস্ফোরণ' ঘটে গেলো। কে কার কথা শোনে,মানে, তোয়াক্কা করে। একই বিল্ডিঙে ২/৩টি গার্মেন্টসের পাশাপাশি ২/৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড ঝুলতে শুরু করে, পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। জনপ্রিয় পত্রপত্রিকাগুলোতে 'পাত্রপাত্রী'র বিজ্ঞপ্তির মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ঠাসা বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হতে দেখা গেছে। বিদেশী ক্যাম্পাস, ক্রেডিট, সেমিস্টার ইত্যাদি বাহারি শব্দের জাদুতে বুঁদ হয়ে গেলো আমাদের "ফাস্টফুড জেনারেশনের' একটি অংশ, তাদের অভিভাবকরাও। কেমন লেখাপড়া হচ্ছে, কী পড়াচ্ছে, কারা পড়াচ্ছে, কী শেখা হচ্ছে ইত্যাদি প্রশ্নের ধারে কাছেও কেউ যায়নি,যেতে চায়নি। হুজুগ উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩/৪টি সেমিস্টারে দ্রুত বছর শেষ, কোর্স শেষ এবং দ্রুত সার্টিফিকেট, নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে! ব্যস। আর কী চাই? পাসের নিশ্চয়তা আছে এই তো চাই। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিতে কোনো টেস্ট নেই, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, অথচ এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল-ফাজিল পরীক্ষায় পাস সার্টিফিকেট দেখিয়ে যে কেউ ইংরেজি, আইন,বিবিএ-র মতো বিষয়ে ভর্তি হতে পারছে এমন সুবর্ণ সুযোগ কে হারাতে চায়- এমন পরিস্থিতি মোটেও বাড়িয়ে বলা নয়, খোঁজ নিয়ে যে কেউ আমার এই দাবির সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। আমি যাচাই করেই কথাটি বলছি।

কথা উঠেছে যে, ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। তাতে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এরা এখন যাবে কোথায়? খুবই খাঁটি কথা, খুবই মানবিক প্রশ্ন। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে প্রক্রিয়ায় বেশির ভাগ (অনুমোদনপ্রাপ্ত, অনুমোদনহীন) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, পড়াশোনা করছে তাদেরকে এভাবে ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট প্রদান করে দেশে উচ্চশিক্ষার কোনো উন্নতি সাধিত হবে কী-এই প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর আমাদের আগে খুঁজতে হবে, গ্রহণের কথা ভাবতে হবে। আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে ইউজিসি অবৈধ বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, অপর যে ৫৪টি বৈধ বলে প্রচারিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটির মান অপেক্ষাকৃত ভালো হলেও বৈধ-অবৈধ বেশির ভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানই এখনো যা-তা পর্যায়ে রয়ে গেছে। সুতরাং যে ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধতা নেই, আবার যে কটির বৈধতা আছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাড়পত্র নিয়ে গেলে ভর্তি করিয়ে আমরা 'মানবিকতার' বিরাট স্বাক্ষর রাখতে পারি, কৃতিত্ব দাবি করতে পারি, কিন্তু

www.pathagar.com

বাকি ৫৪টির মধ্যে ৪/৫টি ছাড়া অন্যগুলোর লেখাপড়ার মানের কী হবে, তাদের সার্টিফিকেটের সঙ্গে জ্ঞানার্জনের কোনো উন্নতি বিধান হবে কিনা তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তা না করা হলে ৫৬টি ছাত্রছাত্রী ছাড়পত্র নিয়ে ৫৪টির মধ্যে বেশ কয়েকটির বাণিজ্যে সুবাতাস বইয়ে দেওয়া ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন খুব একটা আসবে না। কেননা, আমরা জানি যে, বেশ কিছুসংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দলীয় প্রভাব খাটিয়ে অথবা অন্যকোনো উপায়ে অনুমোদন বাগিয়ে নিলেও তাদেরও নেই কোনো স্থায়ী ক্যাম্পাস, ভবন, শিক্ষক, মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, তাদের অনেকগুলোর অবস্থা বাতিল হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই নড়বড়ে, নামকাওয়াস্তে।

আসলে বাংলাদেশে একশ্রেণীর মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানকে নিয়েও তামাশায় নেমেছে, এটিকে নিয়েও ব্যবসা-বাণিজ্যে মেতে উঠেছে। উচ্চশিক্ষার ধারণাকে ধারণ না করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আনন্দে মেতে উঠেছে কেউ কেউ। এখানে উচ্চতর শিক্ষার বিষয়গুলোকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়, ছাত্রছাত্রীদের সেভাবে, সেই পরিবেশে, সুযোগ-সুবিধা, বাধ্যবাধকতায় গড়ে তুলতে হয়, সার্টিফিকেট প্রাপ্তি নয় বরং জ্ঞানার্জন ও দক্ষ মানব সম্পদ, সৃজনশীল আধুনিক মানুষ ও বিশেষজ্ঞরূপে গড়ে ওঠার অপার ব্যবস্থার যজ্ঞটি সম্পাদন করতে হয়। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় নয়। এটি ভাড়া বাড়ির অপরিসর কক্ষে পাঠদান, নামমাত্র পরীক্ষা নেওয়ার মধ্যে আটকে রেখে অর্জন করা যায় না-এই বোধটি যেকোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা,কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, সরকার, ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানতে হবে, বুঝতে হবে। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পারছে না দাঁড়াতে অন্য কতোগুলো সমস্যার কারণে, বেসরকারিগুলো ১৫ বছরেই যে ধরনের ধাক্কা খেলো, আর দিলো-তা থেকে তাদের উত্তরণ কীভাবে হবে- এখন তাদেরকেই তা ঠিক করতে হবে। তবে পাবলিক এবং প্রাইভেট যে নামেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হোক না কেন তাদের শিক্ষাক্রম, পাঠদান, পরিবেশ ও গুণগত মানে খুব একটা পার্থক্যে চলা মোটেও ঠিক হবে না। কেননা, তাদের উভয়েরই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও কর্মের জগৎ বলতে গেলে এক ও অভিন্ন। সেখানে তাদেরকে টিকে থাকতে হলে মানে ও গুণাগুণে তাদের এক বা কাছাকাছি হতেই হবে-এর ব্যত্যয় ঘটতে দেওয়ার আর কোনো সুযোগ আমাদের নেই।

www.pathagar.com

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যা লয়প্রাপ্ত

রতনতনু ঘোষ

বিশ্ববিদ্যালয় হলো একটি দেশের জ্ঞান অর্জনের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। বিচিত্র বিষয়ে, বিচিত্র শৃঙ্খলার বৈশ্বিক জ্ঞান আদান-প্রদানের আদর্শ অঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয়। বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয় হলো বিশ্ব দেখার চোখ। পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই তা গঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করে সিভিল সার্ভিসের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ; আদর্শ মানুষ তৈরির ক্ষেত্র হলো বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী অবদান সর্বত্রই স্বীকৃত। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বদানে এবং জাতির বিবেক হিসেবেও তা নির্ভরযোগ্য। জাতীয় জীবনে সংস্কৃতির অনুশীলন, গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটানো, জাতীয় আন্দোলনের সচেতন প্লাটফর্ম হিসেবেও তা বিবেচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানমূলক প্রবাহ সচল রেখেই জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বসমাজ ও বিদ্যার্থী জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়।

ইউরোপ-আমেরিকার প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ফোরণ সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞানগতভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পাশ্চাত্যের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস, পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেই আমরা অগ্রসর হওয়ার জাতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে নিত্যনতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশের ফলে শিক্ষাঙ্গনে অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে, সশস্ত্র সংঘাতের ফলে সেশনজট লেগেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন কলুষিত হয়েছে ছাত্র-শিক্ষকের দলাদলি, নিয়োগ ও পদোন্নতির দুর্নীতি, লাগাতার ভাঙন আর হত্যার ধারাবাহিকতায়।

বাংলাদেশের ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান হচ্ছিল না বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের। ক্রমাগত সেশনজট, সুযোগবঞ্চিতদের অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ডিগ্রি অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণে এবং শিক্ষার আধুনিকায়ন ও বৈচিত্রায়ন ঘটানোর লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে সর্বমোট ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২ সালের আইন অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছিল। সারা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোকে অধিভুক্ত করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে লাখ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চ ডিগ্রি লাভের সুযোগ পায়। পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে ঢাকার গুলশান-বনানী, ধানমণ্ডি ও মোহাম্মদপুরসহ সারা দেশে। পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞানগত আধিপত্য ও পাঠ্যসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে ভুবনখ্যাত অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, ক্যামব্রিজ, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক গোলযোগ, নৈরাজ্য, সেশনজট ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের অঙ্গীকার নিয়েই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠেছে। এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অত্যাধুনিক ও বিচিত্র বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পায়। অতিমাত্রায় নষ্ট ছেলেরাও তারুণ্যদীপ্ত উদ্যম নিয়ে মেধা অর্জনের জন্য ব্যয়বহুল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয়। এভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গমনের প্রবণতা কিছুটা রোধ হয়। বাহ্যিকভাবে বহুতল ভবনের, সুসজ্জিত ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বেশ বিজ্ঞাপিত। শিক্ষাকে তারা বিশ্বায়নের যুগে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। শিক্ষায় বাণিজ্যায়ন ও বিনিয়োগের ফলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে লাভজনক ব্যবসা। এমনকি এগুলোতে উচ্চমূল্যে ডিগ্রি বিক্রির অভিযোগও উঠেছে। বিশ্ববাজারের চাকরির সুযোগ-সুবিধার প্রচারণাও এক্ষেত্রে আকর্ষণ করেছে অভিভাবকদের। অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব মেধাবী শিক্ষক ও জনবল কাঠামোর পাশাপাশি ভাড়াটে শিক্ষক, অশিক্ষক গবেষক ও প্রশাসক এবং বহিরাগত, খণ্ডকালীন ও অতিথি শিক্ষক দিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ ব্যাপারে শুরু করেছিল তদন্ত। তদন্তের ফলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি, ভর্তিকালীন অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থতা, শিক্ষক নিয়োগে ত্রুটিবিচ্যুতি।

তরুণ বিদ্যার্থীদের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষা উপকরণের অভাব আছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্জিত অর্থ একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়। ফলে লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে এ বি ও সি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছিল মঞ্জুরি কমিশন। সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে মাত্র ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যগুলোকে শর্ত পূরণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষিতও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অমান্য করে টিকে আছে এসব বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের জামানত ছিল প্রথমে ৩ কোটি পরে ৬ কোটি আর বর্তমানে করা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। কালো টাকাওয়ালা, পুঁজিপতি শ্রেণী এক্ষেত্রে বিনিয়োগে দ্বিধা করেনি। ১০ হাজার একর জমির ক্যাম্পাস প্রত্যাশিত হলেও তা মানা হয়নি অনেক ক্ষেত্রে। লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক ও জার্নাল নেই।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ার সুযোগ ব্যবহারের জন্য মোট ২৫টি কম্পিউটার থাকার কথা। কিন্তু কোচিং টাইপ টিচিং সেন্টারগুলোতে তা নেই। ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৪টি চলছে ভিসি ছাড়াই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে একাধিক ভিসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোটিতে দ্বৈতশাসন আর দলীয়করণের শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমের ব্যর্থতা শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির সৃষ্টি করে, আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা বিনষ্ট করে এবং অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ায়। প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছাড়াও একাডেমিক সমস্যা রয়েছে প্রচুর। ফলে দাবিমুখর ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা মাঠে নেমে এসেছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ভাঙন, ভিসির কার্যালয় ঘেরাও, অগ্নিসংযোগ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ পর্যন্ত হয়েছে সে জন্য।

দলীয়করণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষামানের অবনতিসহ সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগ তদন্তে বেরিয়েছে। ১৮ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের তদন্তকৃত সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। ইতিমধ্যে মঞ্জুরি

www.pathagar.com

কমিশন ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র হস্তান্তর করেছে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে। অ্যাক্রিডিয়েশন কাউন্সিল গঠনের খসড়া আইন অনুমোদিত হয়েছে উচ্চশিক্ষার ইউনিফর্মিটি রক্ষার লক্ষ্যে। কেবল সুপারিশ আর আইন নিয়ে হা-হুতাশ করছে মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা স্বীকার করেছে। মঞ্জুরি কমিশনের আইন না মেনেও একটি স্বার্থান্বেষী মহলের সহায়তায় রাজনৈতিক বিবেচনায় টিকে আছে কয়েকটি প্রতারক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি ছাড়াই এমফিল, পিএইচডি ডিগ্রি বিক্রি করছে উচ্চমূল্যে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে গোষ্ঠীগত লাভজনক ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। সরকার বার বার সুপারিশ বাস্তবায়নের আইনি দিক পরীক্ষা করেছে। প্রতারিত শিক্ষার্থীরা ক্রমশ মাঠে নেমে তার প্রতিকার চেয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২১ দফা সংবলিত দাবি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেছে আন্দোলন করে। কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নিয়েছে। শিক্ষার্থীরাও সেসব বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। বি ও সি ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হয়েছে যা প্রকাশিত হলে ব্যাপক বিস্ফোরণাকার ধারণ করতে পারে।

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসম্পন্ন শিক্ষা বজায় রাখা জরুরি। বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি অপরিহার্য। অতিবিজ্ঞাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মাল্টিমিডিয়ার সুযোগ-সুবিধার কথা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করলেও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা সেখানে হয় বঞ্চিত-প্রতারিত। এসব দেখার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আছে। সেই কর্তৃপক্ষ যখন তদন্ত করে সুপারিশের পরও তা বাস্তবায়িত হয় না এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সতর্ক হয়েও দ্রুত মানোন্নয়ন ও শর্তাদি পূরণ করে না তখন সরকারের আর কালক্ষেপণ করা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করলে শিক্ষার্থীরা বঞ্চনার শিকার হবেই আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্যও তাতে বিনষ্ট হবে। ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১০টি সন্তোষজনক। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কী হবে তাই ভাবনার বিষয়।

এসব বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যার জ্ঞান-প্রবাহকে ধারণ করতে পারেনি। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও ভবিষ্যতে রাখতে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যা ক্রমশ লয়প্রাপ্ত হচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, রেজিস্ট্রার, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ পান চ্যান্সেলর কর্তৃক। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় জীবনে অবদান রাখার জন্যই গড়ে ওঠে। প্রাইভেটাইজেশনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লাভজনক এন্টারপ্রাইজ বানালে তা মেনে নেওয়া যায় না। সরকারকেই এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত প্রমাণিত হলে সেগুলোর সনদপত্র বাতিল হওয়ার কথা। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যা লয়প্রাপ্ত হচ্ছে যেসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলো বিলুপ্ত করার দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় হোক গবেষণা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্র

মিল্টন বিশ্বাস

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ মাস থেকে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার তীব্র প্রতিযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নত মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রমাণ করে। তবে আমাদের সমাজে সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা প্রচলিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ থেকে এক ধাপ প্রগতির পথে এগিয়ে থাকে-এটা মেনে নিতে পারেন না। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেননি কিংবা অধ্যয়ন করলেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভুল তথ্য জেনে গেছেন এ রকম ব্যক্তি। শিক্ষক পরিচয় দিলে এ দেশের শিক্ষিত বা নিরক্ষর সাধারণ জনগণ তাদের দেখা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কথা স্মরণ করেন। অথবা, ব্যাংক-বীমা ও আমলা-ভবনের ব্যক্তিরা মনে করেন আমরা আয়াসের চাকরি করি। তারা ভাবেন না বা ভাবতে চান না যে, কেবল ক্যাম্পাসে যাওয়া-আসার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিচয় সীমিত থাকে না। বরং রাস্তায়, বাসায় ও মধ্যরাত অবধি, একজন শিক্ষককে মনোনিবেশ করতে হয় পাঠে, নতুন বক্তব্য প্রস্তুত করতে হয় পরের দিনের ক্লাসের জন্য, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে সময় ব্যয় করতে হয়। অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদেরও জটিল ও অগ্রগামী পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়।

মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানার্জন মুক্তবুদ্ধির বিষয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার পর একজন শিক্ষার্থী কেবল একটি সনদ উপার্জনের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না বরং সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিশীল মননের অধিকারী একজন ব্যক্তি হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের অন্যতম পুরোধাও সেই শিক্ষার্থী। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সেমিনার সিম্পোজিয়ামের সমান গুরুত্ব রয়েছে।

প্রাচীন গ্রিসে খ্রি. পূ. পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতাব্দীতে সক্রেটিস ও তার শিষ্যদের আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের ধারা ধরে বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সেমিনার তথা মুক্ত আলোচনার সূচনা। প্লেটোর একাডেমি ছিল তৎকালীন গ্রিসের জ্ঞান প্রসারণের অন্যতম পীঠস্থান। এমনকি তার একটি গ্রন্থের নাম 'সিম্পোজিয়াম'। স্মরণীয় অ্যারিস্টটলের লাইসিয়ামও ছিল মুক্তবুদ্ধি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। তত্ত্বালোচনা ও তর্কবিতর্কের যুক্তিবাদী ধারা থেকেই ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা ছিল জ্ঞানচর্চার বিশ্বখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগে ইউরোপে ১০৮৮ সালে প্রথম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় বোলোগনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। এর পরে পর্যায়ক্রমে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় (১১৫০), অক্সফোর্ড (১১৬৭), কেমব্রিজ (১২০৯) প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আঠার ও উনিশ শতকে ইউরোপ-আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন কেন্দ্রে পরিণত হয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী) প্রতিষ্ঠা করে মুক্তবুদ্ধির বিকাশে অসামান্য অবদান রাখেন। বিশ্বভারতী বিশ্বের জ্ঞান ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করে প্রসারিত হয় মানবজীবনের মর্মমূলে। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার নবজাগরণের একটি অন্যতম অণুঘটক ছিল বিভিন্ন সংগঠন বা সভা-সেমিনার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯২১) পর ১৯২৬ সালে কাজী আবদুল ওদুদদের 'শিখা' গোষ্ঠীর আন্দোলন ছিল সংস্কার ও মুক্তজীবনের অনুধ্যানে জ্ঞানকে ব্যবহার করার মহত্তম প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে 'শিখা' গোষ্ঠী মতাদর্শ নির্মাণে এবং যুক্তিশীল মনন সৃজনে আশ্রয় করেছিল বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার-সিম্পোজিয়ামকে। সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের মাঙ্গলিক ক্ষেত্রে আহ্বান করা এবং প্রগতিশীল ধারণা তৈরিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তবুদ্ধির চর্চার বিকল্প নেই।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত থাকে, আর সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে মুক্তবুদ্ধির চর্চা প্রসারিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আবার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। বিভাগীয় শিক্ষকদের উৎসাহে কিংবা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রচেষ্টায় আলোচনা সভা,তর্ক-বিতর্কের আয়োজন একটি সাধারণ ব্যাপার। বলাবাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল শিক্ষকতার জায়গা নয়,এটি জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞান প্রসার ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্রও।

আমরা জানলাম, বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং জ্ঞান সৃষ্টি ও প্রসারের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে এ দেশে কতজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হন? তুলনামূলক একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ভারত ও পাকিস্তানে যেখানে মোট জনসংখ্যার ১৩% বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম হয় সেখানে বাংলাদেশে গত ১৮-২৫ বছরের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৪%। অন্যদিকে থাইল্যান্ডে এ সংখ্যা ৪০%। (ডেইলি স্টার ক্যাম্পাস, ১ জুন, ২০০৮)। দেশের ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে সক্ষম কি না সে সংবাদ জনগণের কাছে পরিষ্কারভাবে পৌঁছানো দরকার। অন্যদিকে পঞ্চাশের অধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হচ্ছে তার তদারকিও প্রয়োজন। অর্থাৎ সেখানে মার্কেট ভ্যালুর চেয়ে সোশ্যাল ভ্যাল প্রাধান্য পাচ্ছে কি না এটাও যাচাই হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সোশ্যাল ভ্যালু তৈরি করা জরুরি। আর এজন্য মুক্ত আলোচনা তথা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। সেমিনারের মাধ্যমে সুস্থ চিন্তার বিকাশ সম্ভব। বলা হয়ে থাকে, ডায়ালগ ও ডিবেট মানুষের জন্য মঙ্গলকর ও যুক্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে অবদান রাখে। শিক্ষা নতুন ধারণা নির্মাণ করে এবং সমাজ নির্মিত হয় সেই ধারণা দিয়ে।

চীনের মহান বিপ্লবী মাও সে তুং বলেছেন 'যদি তুমি এক বছরের প্ল্যান কর তাহলে ধানের জন্য বীজ বপন কর। আর এক দশকের জন্য বৃক্ষরোপণ কর। আর সারা জীবনের জন্য শিক্ষিত মানুষ তৈরি কর। এই শিক্ষিত মানুষ তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক ক্লাসরুমের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব বিষয় সাধারণ জনগণের জানার কথা নয়। তারা জানেন না কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল রাজনীতি হয়, লেখাপড়া হয় না কিংবা এখানকার ছাত্ররা মাস্তান) পোষণ করে থাকেন।

মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সিলেবাসভিত্তিক এবং ক্লাসরুমকেন্দ্রিক অধ্যয়ন আলোচনার বাইরে ভিন্ন বিষয় ও অপরিচিত তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে সেমিনার সিম্পোজিয়াম। এর মাধ্যমে এক বিভাগের শিক্ষার্থী অন্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়। সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। নতুন তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগতে পারে। বিশ্বের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্যে আসার সুযোগ তৈরি হতে পারে। আর এর জন্য দরকার দেশের বর্তমান ছাত্ররাজনীতির গুণগত পরিবর্তন। শিক্ষার্থীদের উচিত দেশ-জাতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করা, উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষাজীবন শেষকরার জন্য নিবেদিতপ্রাণ থাকা। সুনাগরিক হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে গ্লোবাল ভিলেজের জন্য নিজেকে তৈরি করা ও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কল্যাণকর চিন্তায় নিজেকে প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরি। আর এসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সেমিনার সিম্পোজিয়াম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অবসানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে ছাত্রদের বর্ধিত বেতন ফি ইস্যুতে উপাচার্যকে সমর্থন দিয়ে আবার ছাত্রদের বিক্ষোভে উস্কানি দিতে তৎপর হলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সাধারণ জনগণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করবে এটাই স্বাভাবিক। এজন্য আমাদের মর্যাদা সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কনসেপ্ট সাধারণ্যে বোধগম্য হওয়ার জন্য প্রচার প্রচারণা ও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। সবাইকে বোঝানো দরকার, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে "community of teachers and scholars."

www.pathagar.com

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা

বিশ্বের সেরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়

1. Harvard University
   www.harvard.edu
2. Stanford University
   www.stanford.edu
3. Yale University
   www.yale.edu
4. California Institute of Technology
   www.caltech.edu
5. University of California at Berkeley
   www.berkeley.edu
6. University of Cambridge
   www.cam.ac.uk
7. Massachusetts Institutte Technology
   http://web.mit.edu
8. Oxford University
   www.ox.ac.uk
9. University of California at San Francisco
   www.ucsf.edu
10. Columbia University
    www.culumbia.edu
11. University of Michigan at Ann Arbor
    www.umich.edu
12. University of California at Los Angeles
    www.ucla.edu
13. University of Pennsylvania
    www.upenn.edu
14. Duke University
    www.duke.edu
15. Princeton University
    www.princeton.edu
16. Tokyo University
    www.u-tokyo.ac.jp
17. Imperial College London
    www3.imperial.ac.uk
18. University of Toronto
    www.utoronto.ca
19. Cornell University
    www.cornell.edu
20. University of Chicago
    www.uchicago.edu
21. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
    www.ethz.ch
22. University of Washington at Seattle
    www.washington.edu
23. University of California at San Diego
    www.ucsd.edu
24. Johns Hopkins University
    www.jhu.edu
25. University College London
    www.ucl.ac.uk
26. Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
    www.epfl.ch
27. University Texas at Austin
    www.utexas.edu
28. University of Wisconsin at Madison
    www.wisc.edu
29. Kyoto University
    www.kyoyo-u.ac.jp
30. University of Minnesota Twin Cities
    www.umn.edu

www.pathagar.com

31. University of British Columbia
www.ubc.ca
32. University of Geneva
www.unige.ch
33. Washington Uni. in St. Louis
www.wustl.edu
34. London School of Economics
www.lse.ac.uk
35. Northwestern University
www.northwestern.edu
36. National University of Singapore
www.nus.edu.sg
37. University of Pittsburgh
www.pitt.edu
38. Australian National University
www.anu.edu.au
39. New York University
www.nyu.edu
40. Pennsylvania State University
www.psu.edu
41. University of North Carolina at Chapel Hill
www.unc.edu
42. McGill University
www.mcgill.ca
43. Ecole Polytechnique
www.polytechnique.fr
44. University of Basel
www.unibas.ch
45. University of Maryland
www.umd.edu
46. University of Zurich
www.unizh.ch
47. University of Edinburgh
www.ed.ac.uk
48. University of Illinois at Urbana Champaign
www.uiuc.edu
49. University of Bristol
www.uiuc.edu
50. University of Sydney
www.usyd.edu.au
51. University of Colorado at Boulder
www.colorado.edu
52. Utrecht University
www.uu.nl
53. University of Melbourne
www.unimelb.edu.au
54. University of Southern California
www.usc.edu
55. University of Alberta
www.ualberta.ca
56. Brown University
www.brown.edu
57. Osaka University
www.usaka-u.ac.jp
58. University of Manchester
www.manchester.ac.uk
59. University of California at Santa Barbara
www.ucsb.edu
60. Hong Kong University of Science and Technology
www.ust.hk
61. Wageningen University
www.wau.nl
62. Michigan State University
www.msu.edu
63. University of Munich
www.uni-muenchen.de
64. University of New South Wales
www.unsw.edu.au
65. Boston University
www.bu.edu
66. Vanderbilt University
www.vanderbilt.edu
67. University of Rochester
www.vander-bilt.edu
68. Tohoku University
www.tohoku.ac.jp
69. University of Hong Kong
www.uku.hk
70. University of Sheffield
www.shef.ac.uk
71. Nanyang Technological University
www.ntu.edu.sg
72. University of Vienna
www.univie.ac.at
73. Monash University
www.monash.edu.au
74. University of Nottingham
www.nottingham.ac.uk
75. Carnegie Mellon University
www.cmu.edu
76. Lund University
www.lu.se
77. Texas A & M University
www.tamu.edu

www.pathagar.com

78. University of Western Australia
www.uwa.edu.au
79. Ecole Normale Super Paris
www.ens.fr
80. University of Virginia
www.virginia.edu
81. Technical University of Munich
www.tum.de
82. Herbrew University of Jerusalem
www.huji.ac.il
83. Leiden University
www.leiden.edu
84. University of Waterloo
www.uwaterloo.ca
85. King's College London
www.kcl.ac.uk
86. Purdue University
www.purdue.edu
87. University of Birmingham
www.bham.ac.uk
88. Uppsala University
www.uu.se
89. University of Amsterdam
www.uva.nl
90. University of Heidelberg
www.uni-heidelberg.de
91. University of Queensland
www.uq.edu.au
92. University of Leuven
www.kuleuven.ac.be
93. Emory University
www.emory.edu
94. Nagoya University
www.nagoya-u.ac.jp
95. Case Western Reserve University
www.case.edu
96. Chinese University of Hong Kong
www.cuhk.edu.hk
97. University of Newcastle
www.newcastle.edu.au
98. Innsbruck University
www.uibk.ac.at
99. University of Massachusetts at Amherst
www.umass.edu
100. Sussex University
www.sussex.ac.uk

বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
www.univdhaka. edu
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
www.buet.ac.bd
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
www.juniv.edu
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
www.sust. edu
রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়
www.ugc.org/rajshahi-uni.htm
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
www.ugc.org/agriculture-uni.htm
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
www.ctgu.edu
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি
www.ugc.org/islamic-uni.htm
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
www.ugc.org/khulna-uni.htm
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
www.ugc.org/national-uni7.htm
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
www.ugc.org/open-uni.htm
শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
www.ugc.org/sher-e-bangla-agri-uni.htm
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
www.ugc.org/patuakhali-sc-tech-uni.htm
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
www.org/haji-Md-Denesh-sc-tech-uni.htm
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
http://mbstu.ac.bd/index.html

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
www.ugc.org/bangabandu-agri-uni.htm
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
www.bsmmu.edu

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
www.northsouth.edu
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
www.iub-bd-edu
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি
www.bracuniversity.net
দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি
www.diu.edu
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি
www.stamforduniversity.net
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
www.queensuniversity.edu
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
www.diu-edu.net
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
www.subd.net
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
www.asianuniversity.edu
দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসেফিক
www.uap-bd.edu
দি পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
www.thepub.edu
মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
www.manarat.org
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি)
www.iubat.edu
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি
www.iiuc.ac.bd
ইন্টারন্যাশনাল অব ডিভালপমেন্ট অন্টারনেটিভ
www.manarat.org
ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
www.daffodilvarsity.edu.bd
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ
www.aiub.edu
নর্দান ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ
www.nubedu.net
সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি
www.sourhtern-bd.info
ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
www.wub.edu
ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি
www.easternuni.org
সিটি ইউনিভার্সিটি
www.cityuniversity.net
ইবাইস ইউনিভার্সিটি
www.ibais.edu
প্রাইম ইউনিভার্সিটি
www.primeu.net
আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
www.aust.edu

www.pathagar.com

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	87/1, কলেজ স্ট্রীট, সিনেট হাউস, কলকাতা- 700073
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	188, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড যাদবপুর, কলকাতা- 700032
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	56-A, বি. টি. রোড, কলকাতা-700050
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	রাজবাটি, বর্ধমান-713104
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	কল্যাণী, নদিয়া, পিন- 741235
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদিয়া-741252
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	রাজা রামমোহনপুর,পোঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, পিন-734430
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়,মেদিনীপুর, পিন-721102
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-731235
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়	1, উডবার্ণ পার্ক, কলকাতা- 700020
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ পুন্ডিবারি, জেলা-কুচবিহার
পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুডিসিয়াল সায়েন্সেস	এন ইউ জে এস ভবন 12, এল বি ব্লক সেক্টর III,সল্টলেক সিটি, কলকাতা- 700098
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়	37 এবং 38, ক্ষুদিরাম বোস সরণী, বেলগাছিয়া, কলকাতা-700037
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি	বোটানিকাল গার্ডেন শিবপুর, হাওড়া - 711103

ত্রিপুরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়	সূর্যমণি নগর, ত্রিপুরা - 799130

উত্তরপ্রদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়	আলিগড়, উত্তরপ্রদেশ - 202002
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়	এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ - 211002
গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়	গোরক্ষপুর, উত্তরপ্রদেশ - 273009
লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়	বাদশাবাদ, লখনৌ, উত্তরপ্রদেশ - 226007
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়	বানারসী, উত্তরপ্রদেশ - 221005
বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়	বিদ্যাবিহার, বারবেরিলী রোডস লখনৌ, উত্তরপ্রদেশ-226025

www.pathagar.com

দিল্লী

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়	দিল্লী – 110007
জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়	নিউ মেহেরানি রোড, নতুন দিল্লী – 110067
জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	মৌলানা মহম্মদ আলি জওহর মার্গ, জামিয়ানগর, নতুন দিল্লী – 110011
মহাত্মা গান্ধী অন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ধা	ক্যাম্প – C2/43, -শাহজাহান রোড, নিউ দিল্লি – 110011

তামিলনাড়ু

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ ট্রিপলিকেন, ইউনিভার্সিটি সেন্টেনারি বিল্ডিং, চাঁপক, চেন্নাই, তামিলনাড়ু – 600005
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়	আন্নামালাই নগর, তামিলনাড়ু – 608002
তামিল বিশ্ববিদ্যালয়	অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ট্রিচি রোড, তাঞ্জাভুর, তামিলনাড়ু – 613005
আলগাপ্পা বিশ্ববিদ্যালয়	আলগাপ্পানগর, কারাইকুডি, তামিলনাড়ু – 623003
আন্না বিশ্ববিদ্যালয়	সর্দার প্যাটেল রোড, চেন্নাই, তামিলনাড়ু – 600025
ভারাতিহার বিশ্ববিদ্যালয়	কোয়েম্বাটুর, তামিলনাড়ু – 641046

উড়িষ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ বাণীবিহার, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা – 751004
বেরহামপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ভঞ্জবিহার, জেলা– গঞ্জাম,বেরহামপুর, উড়িষ্যা – 760007

অন্ধ্রপ্রদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়	জ্যোতিবিহার, সম্বলপুর, উড়িষ্যা – 768019
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়	ওয়ালটেয়ার, বিশাখাপত্তনম,অন্ধ্রপ্রদেশ – 530003
হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ – 550046
আচার্য এন. জি. রঙ্গ এগ্রিকালচারাল বিশ্ববিদ্যালয়	অ্যাঙ্গারু, রাজেন্দ্রনগর, হায়দরাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ –500030
ন্যাশনাল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়	তিরুপতি, অন্ধ্রপ্রদেশ – 517507
মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়	বৃন্দাবন কলোনী,তোলিচোকী, হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ – 500008

কর্ণাটক

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়	পাভতিনগর, দারওয়াদ, কর্ণাটক – 580003
ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়	জ্ঞানভারতী, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক = 560056
মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়	কোর্কড হল, পোঃ বক্স নং – 406 মহীশূর, কর্ণাটক – 570005

www.pathagar.com

কেরালা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়	তিরুবন্তপুরম, কেরালা – 695034
কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ কালিকট, মালাপুরম, কোঝিকোডি, কেরালা = 673636

মহারাষ্ট্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়	রবীন্দ্রনাথ টেগোর মার্গ,নাগপুর, মহারাষ্ট্র – 440001
অমরাবতী বিশ্ববিদ্যালয়	অমরাবতী, মহারাষ্ট্র – 444602
মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়	ইউনিভার্সিটি রোড,কোর্ট, মুম্বাই – 400032

আসাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ বক্স – 63, শিলচর, আসাম – 788001
আসাম এগ্রিকালচারাল বিশ্ববিদ্যালয়	জোড়হাট, আসাম – 785013
তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়	নাপাম, তেজপুর, আসাম 784028

অরুণাচলপ্রদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
অরুণাচল বিশ্ববিদ্যালয়	রনো হিলস, দইমুখ, ইটানগর, অরুণাচলপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
আদেশ প্রতাপ সিং বিশ্ববিদ্যালয়	রেওয়া, মধ্যপ্রদেশ – 486003
বরকাতুন্না বিশ্ববিদ্যালয়	হোসানগাবাদ রোড, ভূপাল,মধ্যপ্রদেশ

গুজরাট

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়	নবরঙ্গপুরা, আমেদাবাদ, গুজরাট – 380009
ভাবনগর বিশ্ববিদ্যালয়	গৌরীশঙ্কর লেক রোড, ভাবনগর, গুজরাট–364002

রাজস্থান

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়	গান্ধীনগর, জয়পুর,রাজস্থান – 302004
রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (বিদ্যাপীঠ)	প্রতাপনগর, উদয়পুর, রাজস্থান – 313001

বিহার

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়	পাটনা, বিহার – 800005
মগধ বিশ্ববিদ্যালয়	বুদ্ধগয়া,বিহার – 824234

ঝাড়খণ্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়	রাঁচী, ঝাড়খণ্ড

www.pathagar.com

গোয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ গোয়া ইউনিভার্সিটি, গোয়া – 403206

হিমালচল প্রদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়	সমারহিল, সিমলা, হিমাচল প্রদেশ – 171005

পাঞ্জাব

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
গুরু নানকদেব বিশ্ববিদ্যালয়	অমৃতসর, পাঞ্জাব – 143005
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়	চণ্ডীগড়, ইউনিয়ন টেরিটরি, পিন – 160014

হরিয়ানা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়	কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা – 136119

মণিপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়	কাঞ্চীপুর, ইম্ফল, মণিপুর – 795003

পন্ডিচেরী

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
পন্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়	আর ভেঙ্কটরামণ নগর, কালাপেট, পণ্ডিচেরী – 605014

মেঘালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
নর্থ ইস্টার্ন হিল বিশ্ববিদ্যালয়	পোঃ নেহেরু ক্যাম্পাস, উমশিং মোকিনরচ, শিলং, মেঘালয় – 793022

নাগাল্যাণ্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
নাগাল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়	হেড কোয়াটার্স লুমানি, ক্যাম্প কোহিমা, নাগাল্যাণ্ড-797001

জম্মু ও কাশ্মীর

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়	বাবাসাহেব আম্বেদকর রোড, নতুন ক্যাম্পাস, জম্মু ও কাশ্মীর – 180004
কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়	ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, হজরতবাল, শ্রীনগর, জম্মু ও কাশ্মীর – 190006

উত্তরাঞ্চল

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ঠিকানা
গুরুকুল কাঙ্গলী বিশ্ববিদ্যালয়	হরিদ্বার, উত্তরাঞ্চল

www.pathagar.com

আরও কয়েকটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-ঠিকানা

দেশের নাম	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা
জার্মানি	● ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইন জার্মানি (ব্রেশেই)। পোস্ট বক্স - 155076605, ব্রেশেই ● ইউনিভার্সিটি অব্ হেগ, Feithestrasse - 15258085, হেগ। ● ফ্রি ইউনিভার্সিটি অব্ বার্লিন, Kaisereswertherstrasse, 16 - 18, 14195 বার্লিন। ● ইউনিভার্সিটি অব্, হামবার্গ, Edmund Leimers Alleel, 20146, হামবার্গ। ● ইউনিভার্সিটি অব্ লুনেনবার্গ, Scharnlarststrasse 1,21332, লুনেনবার্গ।
জাপান	● হিরোসিমা ইউনিভার্সিটি, হিরোসিমা, ডায়গাকু - 3 - 2 কাগাসিয়াগা - 1, চোমি, হিগাসি হিরোসিমা, হিরোসিমা - 7398511 ● নাগাসাকি ইউনিভার্সিটি, নাগাসাকি, ডায়গাকু - 1 - 14, বুনকিওমাচি, নাগাসাকি সাই, নাগাসাকি - 8528521 ● হিরোসাকি ইউনিভার্সিটি, হিরোসাকি, ডায়গাকু - 1, বুনকিও চো, হিরোসাকি সাই, আমোরি - 0368560 ● ওসাকা ইউনিভার্সিটি, ওসাকা, ডায়গাকু - 1-1, ইয়াসাডাকো, সুইতাসাই, ওকাসা - 5650871
চীন	● বেজিং ইউনিভার্সিটি অব্ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, 30, এক্সইউ অ্যানলু, বেজিং - 100083 ● সাংহাই ইউনিভার্সিটি, 149 ইয়ানচাংগলু, সাংহাই - 200072 ● নানজিং ইউনিভার্সিটি, 22, হনকউলু, নানজিং, জিগাসু, প্রভিন্স - 210093

www.pathagar.com

- চায়না মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি,
  92 বে এর মালু শেনায়াংলয়নিং,
  প্রভিন্স – 110001
- চায়না ইউনিভার্সিটি অব্ মাইনিং অ্যান্ড
  টেকনোলজি, নামজিও Xuzhon জিগাংসু,
  প্রভিন্স – 221008

রাশিয়া

- মস্কো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব্ বিজনেস্ অ্যান্ড ইনফরমেশন
  টেকনোলজি, UL Nezinskaja. j মস্কোভা – 119501
- রাশিয়ান স্টেট ইউনিভার্সিটি ফর দি হিউম্যানিটিজ,
  Mjusskaja P 16 মস্কোভা – 125267
- ভাল্‌দিমির স্টেট ইউনিভার্সিটি,
  UL Garkogo, 87 ভাল্‌দিমির – 600026

ফ্রান্স

- ইউনিভার্সিটি অব্ কেন,
  এসপ্লানেড ডি লা প্যাক্স – 14032,
  কেন সিডেক্স
- ইউনিভার্সিটি প্যারিস (ড্রপিন) প্যারিস নাইন,
  Place du Marechal de Taseigay - 75775,
  প্যারিস সিডেক্স – 6

ইতালি

- ইউনিভার্সিটি অব্ মিলান,
  Via Festa del 72122 M1 Milan.

সুইডেন

- গুটেনবার্গ ইউনিভার্সিটি
  Box - 100 Vasaparken SE - 40530
  গুটেনবার্গ।

সাউথ আফ্রিকা

- ইউনিভার্সিটি অব্ সাউথ আফ্রিকা,
  পোস্ট বক্স – 392,
  Preller Street Nica, Muckleneuk,
  Petoria, Transvaai 0003.

বাংলাদেশ

- ইউনিভার্সিটি অব্ ঢাকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), রমনা, ঢাকা–1000.
- ইউনিভার্সিটি অব্ রাজশাহী
  (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), মতিহার, রাজশাহী – 6205
- ইউনিভার্সিটি অব্ চট্টগ্রাম
  (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), হাটহাজারি, চট্টগ্রাম – 4000
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট,
  পোঃ বক্স – 3048, শাহবাগ, ঢাকা–1000.

সূত্র : ইন্টারনেট, ওয়েব ডিরেক্টরি ও দেশ–বিদেশে উচ্চশিক্ষা।

www.pathagar.com

লেখক–পরিচিতি ও রচনার তথ্যসূত্র

বার্ট্রান্ড রাসেল : মানবতাবাদী দার্শনিক। শিক্ষাপ্রসঙ্গ, বার্ট্রান্ড রাসেল; শব্দগুচ্ছ, ঢাকা, ২০০৬; ভাষান্তর : শামীম আহমেদ; পৃ. ১৯৭–২০৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নোবেলজয়ী বিশ্বকবি ও শিক্ষাদার্শনিক। শিক্ষা, কলকাতা; ১৩৮৯; অভিভাষণ : ডিসেম্বর, ১৯৩২।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : বিজ্ঞানী। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা; বৈশাখ, ১৪০৫।

হুমায়ুন কবির : সাহিত্যিক ও সমালোচক। নয়াভারতের শিক্ষা, ওরিয়েন্টাল বুক কোং, কলকাতা, ১৯৬২।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক। নতুন দিগন্ত, ঢাকা; ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; পৃ. ৫৭–৭৮।

মোজাফ্ফর আহমদ : অধ্যাপক ও সমাজচিন্তক। এডোয়ার্ড শিল্‌স-এর শিক্ষাভাবনা, মোজাফ্ফর আহমদ, একুশে, ঢাকা।

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত : ইতিহাসবিদ। নবযুগের ইতিহাস শিক্ষা, অশোক পুস্তকালয়, কলকাতা; ১৯৭৬।

অম্লান দত্ত : শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক। গণযুগ ও গণতন্ত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৮২।

সালাহউদ্দিন আহমদ : ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপক। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা; ২১ ফেব্রুয়ারি বিশেষ সংখ্যা; ১৯৯৮।

শামসুল হক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক। উচ্চশিক্ষা : বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

অনিল ভট্টাচার্য : অধ্যাপক ও গবেষক। অনীক, কলকাতা; এপ্রিল, ২০১৫; পৃ. ২৫–৩২।

নজরুল ইসলাম : অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ। দৈনিক যায়যায়দিন, ঢাকা; ২০ জুন, ২০০৯।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : অধ্যাপক ও কলামিস্ট। দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা; ১১ জানুয়ারি, ২০০৮।

মহীউদ্দীন খান আলমগীর : লেখক ও গবেষক। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা; ২৭ এপ্রিল, ২০০৩।

মোহাম্মদ কায়কোবাদ : অধ্যাপক ও প্রযুক্তিবিদ। দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা; ৬ জুলাই, ২০১০।

শহিদুল ইসলাম : অধ্যাপক ও কলামিস্ট। দৈনিক সমকাল, ঢাকা; ৩১ আগস্ট, ২০০৬।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : অধ্যাপক ও সমালোচক। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা; ১৫ মার্চ, ২০১০।

অনুপম সেন : অধ্যাপক ও সমাজবিজ্ঞানী। দৈনিক যুগান্তর, ২৩ নভেম্বর, ২০০৯।

আবদুল খালেক : অধ্যাপক ও গবেষক। দৈনিক জনকণ্ঠ; ঢাকা; ২৯ আগস্ট, ২০০৯।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ। দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা; ১১ আগস্ট, ২০০৩।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল : অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা; ২১ জুলাই, ২০০৩।

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : অধ্যাপক ও গবেষক। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা; ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০।

রংগলাল সেন : অধ্যাপক ও সমাজবিজ্ঞানী। বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংগলাল সেন; শিখা প্রকাশনী, ঢাকা–২০০৫; পৃ. ১৩২–১৩৭।

মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী : অধ্যাপক ও কলামিস্ট। দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যেপ্রাপ্ত।

রতনতনু ঘোষ : প্রাবন্ধিক ও সমাজচিন্তক। সুশাসন প্রত্যাশা, রতনতনু ঘোষ; রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০০৮; পৃ. ৮৯–৯২।

মিল্টন বিশ্বাস : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমালোচক। দৈনিক যায়যায়দিন, ঢাকা; ১৬ অক্টোবর, ২০১০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com